

ଅମଳ : ପାର୍ବତ୍ୟ ଚଟୁଗ୍ରାମ

ନିନ୍ଦାର୍ଥ ଚାକରା

❖- ପରିବେଶକ -❖

ନାଥ ବ୍ରାହ୍ମାଜୀ

୧, ଶ୍ରୀମାତୃତ୍ୱ ଦେ ଶ୍ରୀ
କଲକାତା ୧୦୦୦୧୩

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ ১৩৯২

প্রচ্ছদ : সমরেশ সাহা

প্রকাশক :
জয়ন্ত সাহা
পো : মল্লিকপুর, ২৪ পরগণা (দঃ)

মুদ্রক :
এম. এম. ট্রেডার্স
৩/২, কুদিরাম বোস রোড
কলকাতা-৬

উৎসর্গ

মানবতার গ্লানির শেকল ছেঁড়ার গান যাঁরা
বিশ্বের দুর্বলতম মানুষদের শিখিয়েছেন
নিজেদের জীবন দিয়ে

In the fabric of human events, one thing leads to another. Every mistake is, in a sense, the product of all the mistakes that have gone before it, from which it derives a sort of a cosmic forgiveness ; and, at the same time, every mistake is, in a sense a determinant of the mistakes of the future, from which it derives a sort of a cosmic unforgivableness.

—George F. Kennan

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পূর্বকথা	১
দেশ বিভাগ ও তারশর	৩
বাংলাদেশের অভ্যুদয়	৪১
পুনর্বাসন পরিকল্পনা	৬৪
শান্তিবাহিনী	৯৮
শেষ কোথায়	১২৫
শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবিতে জনসংহতি	
সমিতির আবেদন, ১৯৭২	১৩৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০	১৪০
সূত্র	১৬৯

ढुषिका

পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই বিভিন্ন কারণে লেখা হয়ে থাকে। কোন বিষয় সম্পর্কে কারো বিশেষ আকর্ষণ থেকে কেউ লেখেন, আবার কেউ বা লেখেন কারণ রাজনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে পেশাগত কারণেও লেখেন, প্রতিনিয়ত ছাপাতে না পারলে পেশায় পছন্দোন্নতি হয় না। “এসক পার্বত্য চট্টগ্রামে”র লেখক সিদ্ধার্থ চাকমা দ্বিতীয় কারণে বর্তমান বইটি লিখেছেন। বিষয়টি তাঁর নিকট আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। লেখক পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত ভাবে দূর জনগোষ্ঠীর চাকমা সম্প্রদায় ভুক্ত। বিষয়টিব উপর যদিও লেখক আগাশোড়া তথ্যভিত্তিক নিরূপেক আলোচনার চেষ্টা করেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতার সংকটের একটি “আত্মজরী” দৃষ্টি আমরা তাঁর নিকট থেকে পেয়েছি। স্বাধীনতা উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অচলা-বন্ধার ওপরে ইদানিং বিদেশী লেখকের বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সিদ্ধার্থ চাকমার বইটি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি উপজাতিদের একজন হিসেবে সমস্তাটি বিভিন্ন ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন তাঁর লেখায়। এই বইটির কৃমিকা লেখার জন্য লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতা দিয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের মূল কারণ কি ? এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ভাবে দেওয়া যায় । অনেকে মনে করেন, এ সমস্যা়ার কারণ অর্থ-নৈতিক । আবার কেউ কেউ ঐতিহাসিক উপজাতির সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থাকে একত্ব দাবী করতে চান । বাধীনতা উত্তর কালে-উপজাতি অসন্তোষকে আইন মূল্যবোধ অত্যাধ জনিত সমস্যা হিসেবেও বিভিন্ন সরকার দেখার চেষ্টা করেছেন । আইন মূল্যবোধ অবনতি ক্রমে যিরে মিলিটারি অপারেশনের বলে হাক্কার হাক্কার উপজাতি নিহত হয়েছেন ; অভ্যাস, কুঠন ও উপজাতি মহিলাদের বর্ণের অভিযোগ দেওয়ার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে । এরপরও মিলিটারি সমস্যা়ার সমাধান হইল কি । খেব পর্বত এ বছরের

এপ্রিল মাসে শান্তিবাহিনীর একটি অংশ (প্রীতিগ্রুপ) ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে অবহাকে বিপাকিকভাবে স্বাভাবিক করার জন্য। সুড়ঙ্গ সমস্যাটি আইন শৃঙ্খলার নয়, অসন্তোষের কারণ আরো ব্যাপক বা খুঁজে দেখার চেষ্টা এ বইতে করা হয়েছে।

উপজাতি অসন্তোষের একটি ঐতিহাসিক দিক লেখক আলোচনা করেছেন। তবে মূলত: অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল ১৯৭১সালে কাপ্তাই বাধ নির্মাণ, কর্ণফুলী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম শিল্পায়ন নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে। কাপ্তাই বাধ নির্মাণের ফলে প্রায় লক্ষাধিক উপজাতি গৃহহারা হন এবং তাঁদের ঐতিহ্যগত অর্থনীতি ব্যাপকভাবে সীমিত হয়ে যায়। নতুন শিল্পায়ন নীতির ফলে প্রমজীবী হিসেবে প্রচুর বহিরাগতদের সমাবেশ ঘটে পার্বত্য চট্টগ্রামে। অথচ শিল্পায়নের কোন সুফল উপজাতি কোনদিন ভোগ করতে পারেনি। শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে সব কর্মচারিরাই বহিরাগত ছিল। পাকিস্তান আমলে বটেই, বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পরও শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে স্য। মিলিটারী সরকার তুলের পর ফুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শেখ মুজিবের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সরকারী উৎসাহে ব্যাপকভাবে বহিরাগতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। বহিরাগত পুনর্বাসনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপজাতিরা সবসময় সচেতন ছিল। ফলে উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। উপজাতি সম্প্রদায় সরকারী উদ্যোগকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকি বলে মনে করে। ক্রমশঃ এর বিহিংস্রকাশ ঘটে সরকার বিরোধী গণদল সংগ্রামে। উপজাতি জনগণ ও সরকার উভয় পক্ষই অস্ত্রের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন এবং লেখকের ভাবায়, তাও ভুল পদক্ষেপ ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা এখন যে জটিল আকার ধারণ করেছে তাঁর জন্য লেখকের মতে, আংশিক ভাবে দায়ী উপজাতি নেতৃত্ব। নিজেদেরকে সব সময় আলাদা ভাবে দেখেছেন উপজাতি নেতারা। সারা দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজ-নৈতিক পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাতে দেখার চেষ্টা উপজাতি নেতারা কোনদিন করেনি। কেন তাঁরা নিজেকে আলাদা ভাবে দেখেছেন এক নিজেদের মতো করে সমস্যার সমাধান চেয়েছেন, তার কারণগুলো লেখক ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন বা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য কোমর বইতে আশ্রয় দেখতে পাই না। লেখক আশঙ্কায় দেখেন

জাতীয় রাজনৈতিক দল সমূহ ও নেতৃত্বকে বিশেষ ভাবে দাবী করেছেন। তাঁর মতে, জাতীয় চিন্তা চেতনার মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপজাতিরা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অল্পতম প্রধান কারণ জাতীয় নেতৃত্বের উপজাতিদের সমস্তর শেকড় খুঁজে তার গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধির ব্যর্থতা, কিংবা উপজাতি সমস্তর প্রতি কোন গুরুত্ব না দেওয়া।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এ সমস্তর সমাধান কিভাবে সম্ভব? উপজাতিদের ৪টি মূল দাবি রয়েছে : এক। বহিরাগত শরণার্থী পুনর্বাসন বন্ধ করা, দুই। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের কিরিয়ে নেওয়া, তিন। উপজাতিদের জমি কিরিয়ে দেওয়া, এবং চার। আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন। প্রীতিগ্রুপ ও সেনাবাহিনীর এগ্রিস চুক্তি মোতাবেক বহিরাগত পুনর্বাসন বন্ধ করা হবে এবং বেআইনী অত্যাচার বন্ধ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, উপজাতিদের বেদখলকৃত জমি জমা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে মালিকের কাছে হস্তান্তরের অঙ্গীকার করা হয়েছে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের কিরিয়ে নেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে কোন পরিচালনা ধারণা চুক্তিতে নেই। চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন পরামর্শের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে উপজাতি নেতৃবৃন্দের মধ্যে থেকে উপদেষ্টা নেওয়া হবে এবং উপজাতি জনগণের স্বার্থে “সংশোধিত” পার্বত্য চট্টগ্রাম রেকজেনশন ১৯০০ শীত্ব প্রকাশ করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন বলতে কি বুঝায়? এটা কি ধরনের স্বাধীকার? পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শাসিত রাষ্ট্রের কাঠামোতে আঞ্চলিক শাসনের রূপরেখা কি হবে, স্থানীয় প্রশাসন ও উন্নয়নে উপজাতিদের কি ভূমিকা হবে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রভাব ও শিক্ষানীতি উপজাতিদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষায় কতটুকু উপযোগী—এ সব বিষয় আলোচনা ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা স্বায়ত্বশাসনের পরিধি নির্ধারণে সহায়ক হবে। সম্পূর্ণ বিষয়টি রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই স্পর্শকাতর। বিষয়টি আমাদের দেশের রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব পাওয়া উচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাশাপাশি ভারতে মিজো বিদ্রোহ এবং বার্মার আগ্রাকান বিদ্রোহাবাদী আন্দোলন দীর্ঘদিন ধাবং চলছে। এই ঠিন এলাকার সমস্ত বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগের কথাও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। এছাড়া লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এ ধরনের ক্ষুদ্র জাতিভিত্তিক সমস্ত আন্দোলনকে রাজনৈতিক-

অবে কাজে লাগাতে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত সব সময় প্রচেষ্টারত। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট নিরসনে উপজাতি নেতৃত্ব, জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সরকারের সম্মিলিত কলপ্রসূ উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যিক প্রয়োজন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কার্তাব্যোতেই এই সংকটের মীমাংসা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু আন্তরিক প্রচেষ্টার এবং সমস্তকে জানার নিরলস প্রচেষ্টার। লেখক তাঁর “প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম বইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত বিস্তারিত এবং উপদলীয় যোদ্ধাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। এতে অনেক দিক থেকে বিতর্কিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ফলে সমস্তাটির ব্যাপকতা ও তাৎপর্য বুঝতে সুবিধা হয়েছে। লেখক নিজে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী হওয়ায় তথ্য সংগ্রহে তাঁর সুবিধা ছিল, এবং সাহস নিয়ে তা তিনি প্রকাশ করেছেন। অনেক পেশাগত গবেষক হয়ত বা এত সাহসী হতেন না।

কেন্দ্রিক, ঢাকা

কানাদা, এম. বিউ. জামান
১লা নভেম্বর, ১৯৮৫। বুবিজান বিভাগ, মেনিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়, কানাদা
এবং
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

কিছু কথা

যে দু'টো প্রশ্ন প্রথম থেকেই মনের মধ্যে আছে এ লেখা প্রকাশ করার ব্যাপারে সে দুটোই গোড়াতে বলে নেওয়া বরকার। প্রথমটা, অবধারিত ভাবেই হল—কেন এই লেখা। দ্বিতীয়টা হল, এই লেখা আবার বোঝা পাঠকের ওপর সেই প্রবাদবাক্যের বোঝার উপর শাকের আঁটি হয়ে যাবে না? কেন লিখলাম, তার উত্তর বোধহয় লেখার শিরোনামের মধ্যে আছে। কিন্তু যদি পাঠা। প্রশ্ন করা হয় আমার যোগ্যতা সম্পর্কে, তাহলে সবিনয়ে স্বীকার করতেই হয় আমার লেখার সীমিত যোগ্যতা। এমন কি, ছাপার হরকে কোনও বড় লেখাই লিখতে পারিনি এর আগে। তবু এ স্পর্ধার কারণ 'কণিকা'র রবীন্দ্রনাথের সম্মানবির কাজ যাটির প্রতীপের নেওয়ার ইচ্ছিত। নিরুত্তর ছবি জগতের যদি এতটুকুও চেতনার সন্ধান করা যায় এই ছোট্ট অঞ্চলের দিকে তাকাতো।

সত্যেন্দ্রনাথ হস্তের বামালীর এক হাত মগেরে কঁপেছিল, আর হাত মোগলকে। কিন্তু মোগলকে রোখার পর যে সত্যতা সংকল্পিত লীলাভূমির স্রীকৃষ্ণ হয়েছিল সেটা কিন্তু মগকে রোখার জায়গা পর্বত পৌছায়নি। তাই ত্রিপুরার দক্ষিণে, মিজোরামের পশ্চিমে আর ব্রহ্মদেশের পূর্ব-উত্তরে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের মূল ভূখণ্ডের জনজীবনের মূল বোত থেকে এক বিছিন্ন অস্তিত্বই থেকে গেছে চিরকাল। তিন রাজা, তার ভের সম্রাট, ভাষা আর রীতিনীতিও বিভিন্ন, নিজ নিজ সম্রাট নিয়েই ব্যাপৃত থেকে সেছেন আপাগোড়া। ব্রিটিশ শাসকেরা দেখেছিলেন রাজার রাজত্ব কেনে নিলেই নির্বাক্টাটে থাকে যায়। সুতরাং 'সাধা জনগণের বোকা' হওয়ার সৌভাগ্য থেকে রক্ষা পেয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্বের সব উল্লেকের সোহিত ছটা ভারতের পূর্ব দিকতে পার্বত্য চট্টগ্রামকেও রাষ্ট্রের

দিয়েছিল। বড় আশা নিয়েই এখানকার সংশ্লিষ্ট জনগণ তাঁদের নেতা পাঠিয়েছিলেন বোম্বাই ও দিল্লিতে আন্দোলনের প্রকৃতি ও রূপরেখার সঙ্গে পরিচিত হতে। আর তাতে তাঁদের সঠিক কৃমিকা খুঁজে পেতে। জাতীয় কংগ্রেসের সামনে তখন অনেক কাজ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সে কাজের নাগাল পেল না। আশা বেশী ছিল। বকনাটাও তাই বেশী করে বেজেছিল বৃকে। পরিচিত পরিবেশের খোলস ছেড়ে অচেনা দিগন্তে নতুন শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার প্রথম প্রচেষ্টার বার্ষ পরিণতি পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের আবার খুব বেশী করে তাঁদের নিজেদেরকেই অঁকড়ে ধরতে প্ররোচিত করল।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের স্বষ্টিলাগে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীরা হঠাৎই জানতে পারলেন, তাঁরা পাকিস্তানের নাগরিক। কেন হল, কি করে হল—এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? দেশ বিভাগের এই যে দায় তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল, যার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিরোধের ক্ষীণ প্রচেষ্টা তাঁদেরকে যেমন একদিকে করে তুলল সন্দেহের পাত্র পাকিস্তানের চোখে—অন্যদিকে এটাই তাঁদের করল আরও অন্তর্মুখী। বাইরের জগতের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি হল আরও গভীর। বাংলাদেশের স্বষ্টিলাগেও এর পরিবর্তন হল না। মুক্তি যুদ্ধের পরে কিছু নেতার কথাবার্তা তাঁদের কাজে পাণ্ডাবী জাত্যাভিমান থেকে বাঙালী-জাত্যাভিমানে উত্তরণ বলে মনে হল। আর তখন থেকেই শুরু হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি উত্থাপে ব্যাপক পুনর্বাসন পরিকল্পনা, যা আজ তাঁদের অস্তিত্বের গভীর পেকড় ধরে টান দিয়েছে।

ইতিহাসের এই পটপরিবর্তনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্ম ও জ.তিগতভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহের নিঃশব্দ আর্তি বড় গভীর ভাবে দেখেছি আমি বিগত দুই দশকের কিছু বেশী সময়। একের পর এক ধাক্কা খেতে খেতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে তাঁরা প্রায় উদ্ধাস্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছেন। যুগটা প্রস্তর যুগ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহ হিংস্র নরখাষক জাতি নয়। বাঘাবর বৃত্তিও তাঁদের এখন আর নেই। বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যে নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগত অস্তিত্ব নিয়ে তাঁরা মানুষের দরবারে উপস্থিত হতে চান। অথচ পারছেন না। এই তীব্র যন্ত্রণার জীবনবোধই এ লেখার শুরু।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ, মিজোরামের পশ্চিম, বর্ধার পূর্ব-উত্তরে ও বঙ্গ নগরী চট্টগ্রামের পূর্বে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব ২১°৩৫ এবং ২৩°৪৫ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯১°৪৫ এবং ৯২°১০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ৫°০১ বর্গমাইল এলাকা দ্বিধে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান। বর্তমানে বা তিনটি জেলার বিভক্ত ঝাংড়াছড়ি বান্দরবান ও রাঙামাটি (পার্বত্য চট্টগ্রাম)। তিনটি জেলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জাতিগত ভাবে মূল জনগোষ্ঠীর তেরটি সম্প্রদায়। প্রত্যেকটি সম্প্রদায় নিজের সমস্তার বিপর্কিত। তাই তিনটি জেলার নাম আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ না করে আলোচনার সুবিধার্থে পূর্বতন জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামকেই ভাষা, ধর্ম ও জাতিগতভাবে মূল জনগোষ্ঠীর বাসভূমি এবং আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে ধরা হয়েছে। এ লেখার উদ্দেশ্য সমস্তার সমাধান দেওয়া নয়, সমস্তার মূল খোঁজ। সমাধানের বাস্তবায়ন নীতি প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার দায়িত্ব সরকার এবং জাতীয় নেতাদের।

আমাদের ভাড়নার নিরপেক্ষতা বাতে হারিয়ে না কেলি, সেজন্য নির্ভর করেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থাঙ্ক গ্রন্থ, পবেষণামূলক গ্রন্থ ও দেশের এবং বিদেশের পত্র-পত্রিকার ও বিভিন্ন জনের সঙ্গে সাক্ষাতকারের ওপর। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের জন্য সতীর্থদের সঙ্গে বারবার আলোচনা করেছি। আর প্রেরণা পেয়েছি একাত্তরের কিংবদন্তী পুরুষ ও পঁচাত্তরের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যার বিবরণে প্রথম প্রতিবাদী বর্গ বঙ্গবীর বাবা কাদের সিদ্দিকীর কাছ থেকে, যিনিও আজ আমারই মত আরেক হত্যার ক্ষণাবোধে ক্ষতবিক্ষত। ৭৭ স্বীকার করলেই শেষ হবে না চরম দুঃসময়ের পরীক্ষিত বন্ধু গিয়াসউদ্দীন আহমেদের কথা, যে প্রতিদিনের নির্মম জীবনযুদ্ধে জড়িত থাকা সত্ত্বেও আমার লেখার মূল শিখাটিকে দিনের পর দিন আলিয়ে রেখেছিল। সাহিত্যিক বন্ধু-দাদা পরেশ সাহা সময় দিয়েছিলেন, বক্তৃতা সময় থেকে বেশ কিছু এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি বেধে দিতে ও নামকরণে সাহায্য করতে। লেখা তৈরির দিনগুলোতে সীমিত ইন্সপ্রেশন চাকরা মায়ের মমতা দিয়ে আমার সব অভাব মিটিয়েছেন। উৎসাহে করেছেন উজ্জীবিত। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা বা সাহস, কোনটাই আমার নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে

আমাকে সন্তুষ্ট করেছেন সুজ্ঞ হাঙ্গেরি যান্স জাখিল বৃগল, দীপক চাকরা, এম. এল. বেগরান, দেবানীষ বেগরান, কুনন চাকরা, সন্ন চাকরা ও সুতপা। সর্বোপরি নাম প্রকাশে অনিস্কৃত আমার এক প্রভেদ দ্বারা, লেখার ক্ষমতা থেকে শেষ অবধি সব ক্ষেত্রে সব রকমের সহযোগিতা না থাকলে লেখা আরো শেষ করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। আমার লেখা তৈরি হয়ে গিয়েছিল চুরাশিতে। কিন্তু আরক্তের বাইরে খটে যাওয়া নানা সমস্যার কারণে বইটি প্রকাশে বিলম্ব খটে। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির ওপর নতুনভাবে কিছু সংযোজন করতে গেলে লেখার অনেক কিছুরও বহল খটাতে হয়। আমি নতুন করে কিছু সংযোজন না করলেও অধ্যাপক এম. কিউ. জামান তাঁর লেখা সূত্রিকায় সেই পরিবর্তনের রূপ ও ইঙ্গিত দিয়ে লেখাটাতে সাম্প্রতিকতার ছাপ এনে দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। প্রকাশনা সংক্রান্ত সব দায়িত্ব নিয়ে আমার বোঝা হাড়া করে বেগরান মাধ্যমে জরুর সাহা বন্ধুদের চরম নিদর্শন রেখেছেন। নাথ ব্রাদার্স পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে অনেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এসব সত্ত্বেও কিছু ভুলত্রুটি ও অসুখতা থেকে গেছে। তার দায়িত্ব একান্তই লেখকের।

শুক্রতে দু'টো প্রবন্ধ রাখা হয়েছিল। প্রবন্ধটার উত্তর বেগরান চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়টার উত্তর পাঠকের কাছে।

—সিদ্ধার্থ চাকরা

পূর্ব কথা

সাম্প্রতিক কালের যে কোন দেশের সংবাদ পত্র ও সাময়িকী খুললে চোখে পড়ে উপজাতি অধ্যুষিত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র তৎপরতার খবর। নুসীর্ষ দিনের শোষণে, বঞ্চনায় ও অত্যাচারে উপজাতি জনগণ হতপ্রায়। তাদের সমস্তার উৎস, পতি প্রকৃতির বর্ষাৰ্ধ বিশ্লেষণ না করে বর্তমান বিশ্বের এখানে ওখানে সংঘটিত বিভিন্ন সশস্ত্র তৎপরতার একটি রূপে চিহ্নিত করে, ঐ সশস্ত্র প্রতিরোধের পিছনে বিদেশী শক্তির প্ররোচনা ও মদত খোঁজা যেন সরকারের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এই ধরনের সশস্ত্র তৎপরতার পেছনে বিদেশি শক্তির প্ররোচনা ও মদত নেই, এই কথা কেউ বলছে না। তবে, তার সঙ্গে এও সমান গত্য, প্ররোচিত করা বা মদত যোগানোর প্রয়োজনীয় কেন্দ্র চাই। সরকারের ভুলনীতির কলেই সেই কেন্দ্র তৈরি হয় কিন্তু শুধু বিদেশি চক্রান্তকে দায়ী করে নিজের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা, হাত বদল করে ক্রমতার আসা প্রতিটি সরকারের একটি অমোঘিত নীতিতে পরিণত হয়েছে। তাই, দেখা যায়, সরকার সমাধানের গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাস্তা না খুঁজে, অস্ত্রের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্তার সমাধান খুঁজছে। এতে সবুজা দিনে দিনে আরও

জটিল হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্য-জনপদগুলো তাই বিক্ষোভে কাঁপছে। এতদিনকার শান্ত নিরীহ উপজাতি জীবন অশান্ত হয়ে উঠেছে। উপজাতি জনগণের একটা অংশ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হত্যা হয়ে নিজেদের চরমতম অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর জন্য চরম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যের মোকাবিলায় তারাও পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। উপজাতিদের একটা অংশ এ লড়াইকে মনে করছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার লড়াই। রক্তক্ষয়ী এই সংঘর্ষ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমস্তার সঠিক রূপ, গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করে দীর্ঘদিনের অবেহেলায় উপজাতি জীবনে সৃষ্ট দুই ক্ষতগুলি নিরাময়ের সম্ভাবনা যেমন তিরোহিত হয়নি, তেমনি বন্ধ হয়নি গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা উপজাতিদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব রক্ষার গ্যারান্টি দিয়ে জাতীয় জীবনের মূলধারার সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দেবার পথ।

বিজ্ঞানের দৌলতে এককালের বিরাট পৃথিবী ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। সর্বপ্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে পৃথিবীর এতদিনের অন্ধকারতম অঞ্চলগুলোও আজ নিভৃত নয়। আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রায় হুমিয়ে থাকা বিভিন্ন জাতি-উপজাতি শিক্ষায়, চেতনায় নিজেদের আবিষ্কার করেছে। এমন একটি সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ভাষাভাষি ঙ্গোলীয় বংশসম্মত ভেদে উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবনে ও সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন অনিবার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নয়, বিক্ষোভের ভেতর দিয়ে। দৈবাৎ কোন ঘটনায় নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের ভুল নীতি ও ভুল পদক্ষেপে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়ে উপজাতি জনজীবন আজ বিপর্যস্ত। বিধ্বস্ত তাদের দীর্ঘদিনের মূল্যবোধ। পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন? কেন বাকদের বিবাক্ত ষোঁয়ায় দুর্কিসহ এবং নিত্যদিন আতঙ্কগ্রস্ত বর্তমান উপজাতি জনজীবন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে কিসে তাকাতে হয় বৃটিশ ভারতের বগুড়া চট্টগ্রামের দিকে। বুঝতে হয়, পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে এই জেলার উপজাতিদের ভাগ্য কি হয়েছে।

দেশ বিভাগ এবং তারপর

সতেরই আগষ্ট, উনিশ শ সাতচল্লিশ। সেই প্রথম ঘোষণা করা হয় যে, চট্টগ্রামের আশেপাশের পার্বত্য অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। বেঙ্গল বাউণ্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান স্তার সিরিল র্যাডক্লিফের রায় পাকিস্তান বেতার প্রচার করে বটে, তবে সে ঘোষণায় জোর ছিল না। ছিল না স্পষ্টতাও। ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত করে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান—সৃষ্টি করা হয়েছিল মূলতঃ যে সূত্র ধরে, সেই বিজ্ঞাতি তত্ত্ব অহুসারে জনসংখ্যার পচানকই শতাংশ অমুসলিম, ভাষা ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সত্ত্ব কারণেই ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই সূত্র বরবাদ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দেয়া হল। কেন করা হল, এই নিয়ে ভারত বিশারদ ও ইতিহাসবিদদের মতের জ্বিতা রয়েছে। কারো মতে, পূর্বাঞ্চলের খুলনা, সিলেট ও কলকাতা কার ভাগে থাকবে, এ প্রশ্ন নিয়ে পরস্পর বিরোধী দুটি বৃহৎ হল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ—ব্যস্ত থাকার কলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ‘ইস্ফাটি’ তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি। কেউ কেউ আবার মত প্রকাশ করেন, পাঞ্জাব প্রদেশের কিরোজপুর জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ভাগাও নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। কিরোজপুর জেলার জিরা ও কিরোজপুর মহকুমায় মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু মধ্যবর্তী স্থানে শিখদের ঘন বসতি ছিল। মূল পরিকল্পনায় এই দুই মহকুমাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে জোর গোলামগ, চরম বিশৃঙ্খলা ও মারাত্মক দাঙ্গা আশঙ্কা করে তৎকালীন পাঞ্জাবের সর্জন স্তার ইভান জেনকিন্স আগস্টের প্রথম সপ্তাহে র্যাডক্লিফকে (স্তার সিরিল র্যাডক্লিফ পাঞ্জাব বাউণ্ডারি কমিশনেরও চেয়ারম্যান ছিলেন) অহুরোধ করেন, তাঁকে সীমানা বিভক্তির একটি মানচিত্র যেন আগাম পাঠানো হয়, যাতে তিনি প্রয়োজনীয় স্থানে প্রয়োজনীয় সৈন্য ও পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারেন। র্যাডক্লিফের সচিব ক্রিটোকার বীকট সেই মানচিত্র পাঠিয়ে অহুরোধ রক্ষা করেন। তারিখটা ছিল আটই আগষ্ট, উনিশ শ সাতচল্লিশ।

সাতচল্লিশ সালের পনের আগষ্ট স্তার ইভান জেনকিন্স পাঞ্জাবের গভর্নর হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জায়গায় আসেন মুলিম লিগ নেতাদের প্রিয় পাত্র স্তার জাঙ্গিল মুদী। জেনকিন্স অবসর গ্রহণ করার সময় পাঞ্জাব বিভক্তির মূল পরিকল্পনার মানচিত্র ও নোট, উদ্বাসীনতার কারণেই হোক কিংবা উদ্বেগ-মূলক ভাবেই হোক, তাঁর অফিসে রেখে গিয়েছিলেন। মুদী এই নথিপত্র মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ও লিয়াকত আলি খানকে দেখাতে দেয় করেন নি। এই নিম্নে লর্ড হাউটব্যাটেনের সঙ্গে জিন্নাহর আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।^১ এই অচলাবস্থা ও মনকষাকষি দূর করার উদ্দেশ্যে হাউটব্যাটেন মত প্রকাশ করেন, পাকিস্তানের এক অংশ যদি সীমানা বিভক্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সেই ক্ষতি অন্য অংশ দিয়ে পূরণ করা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে।^২ এই ভারসাম্য নীতির সমর্থনে হাউটব্যাটেন তর্কিযুক্তি তার পার্থালেন বাংলার গভর্নর স্তার কেন্দ্রিক বারোসকে তথ্য পাঠাতে, বস্তুত, প্রমাণ বলতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তিই জায়সঙ্গত। যেমনটি ভাবা গিয়েছিল, পশ্চাদ্ধপ এলাকার ভৌগোলিক সীমানা সংক্রান্ত তথ্য বারোসের জানা ছিল না। বারোসের রিপোর্ট বখন হাউটব্যাটেনের দপ্তরে পৌঁছান, তখন র‍্যাডক্লিফ রায় গৃহীত হয়েছে এবং তা প্রকাশ করার জন্য দপ্তরমত সীলমোহর দিয়ে ভাইসরয়ের কাছে পাঠানো হয়েছে। যে অন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে র‍্যাডক্লিফ কোন কারণ দেখাতে পারেন নি।^৩ তবে এই সম্পর্কে লর্ড হাউটব্যাটেনের বক্তব্য ছিল,

“Burrows had explained to me that the whole economic life of the people of Hill Tracts depends upon East Bengal, that there are only one or two indifferent tracts through the jungle into Assam, and it would be disastrous for the people themselves to be cut off from East Bengal. The population consists of less than a quarter of million, nearly all are tribes men, who, if they have any religion at all are Buddhists (and so are technically

১) এইচ. এন. পিওন্ড, র‍্যাডক্লিফ সোড, চাকমাস রীপ, অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১মে, ১৯৪০

২) এইচ. ডি. হান্ডসন, দি গ্রেট ইন্ডাইড, পৃঃ—৩৫৪।

৩) এইচ. এন. পিওন্ড, র‍্যাডক্লিফ সোড, চাকমাস রীপ, অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১মে ১৯৪০

non-muslim, under the terms of Boundary Commission). In a sense Chittagong, the only Port of East Bengal also depends upon the Hill Tracts; for if the jungles of the later were subjected to unrestricted felling, I am told that Chittagong Port would be silt up”^১

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্যেও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার স্বপক্ষে দেওয়া যুক্তিতে যথেষ্ট দুর্বলতা ধরা পড়ে। এই সমস্ত জটিলতার কারণেই সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দ ও পনের আগস্ট উপমহাদেশ ভেঙে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল দু’ দিন পর, সতের আগস্টে।

দেশ বিভাগের আগে সারা ভারতবর্ষে বয়ে যাওয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্য—জনপদের আপাতঃ শান্ত ও সরল জীবন সৈকতে স্নেহনিভাবে আছড়ে পড়েনি, বাতে করে জাতীয় মূলশ্রোতের সঙ্গে এই অঞ্চলের নিবিড় ও অভিন্ন যোগসূত্র গড়ে উঠতে পারে। কারণটা বিবিধ, সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ। পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের প্রধান অন্তরায় ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং অশিক্ষা। এই কারণে এই জেলায় রাজনৈতিক সচেতনতা ব্যাপকভাবে বেড়ে উঠেনি। অভাব ছিল সারাদেশে সংঘটিত ঘটনা পরী সম্পর্কে সঠিক ধারণার। সমাজ ব্যবস্থা ছিল অল্পরত সামন্ততান্ত্রিক। সামন্ত সর্দার বা রাজাদের অবলম্বন করে যুরত তাদের জীবন প্রবাহ। রাজারা ছিলেন এই অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব। রাজাদের নিজস্ব স্বার্থে তৈরি কাঠামো ছাড়া সেখানে সুসংগঠিত দল বা সংগঠন ছিল না। সংগঠন গড়ার বাধা ছিল, প্রথমত রাজারা নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষার ভয় করতেন, দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক প্রশাসন, তৃতীয়ত, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অভাব, চতুর্থত, দল বা সংগঠন সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের জ্ঞান।

ব্যাপক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দু’একজন এগিয়ে আসেন এবং বিশ দশকে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি’ নামে একটি গণ-সংগঠন গড়ে উঠে। যদিও এর আগে উনিশ শ পনের সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে ‘চাকমা লুক সমিতি,’

১। ল্যারি কলিন্স এ্যান্ড ডার্মিনক লী প্যারারে, মাউন্টব্যাটেন এ্যান্ড দি পার্টিশন, বিকাশ পার্বাণিসং, দিল্লী, ১৯৬২, পৃঃ ১৭৮

আরও পরে উনিশ শ আটাত্তে বনভ্রাম বেঙ্গলার (বেঙ্গল বিভাগের পর তিনি ভারতে চলে যান এবং বাট দশকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হন) নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'চাকমা যুবক সংঘ'। সংগঠন দুটির কার্যক্রম ও কর্মবিস্তৃতি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত। সংগঠন দুটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতি সম্প্রদায় ভিত্তিক, এমনকি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তম উপজাতি সম্প্রদায়, চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণেরও সংগঠন ছিল না। সংগঠনের সদস্যপদ নির্দিষ্ট ছিল চাকমা যুবকদের জন্য। তাই বলা যেতে পারে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি'ই সব সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রথম গণ-সংগঠন। এই সমিতির কর্মকর্মিটির সভাপতি হন কামিনী মোহন দেওয়ান (পরবর্তীতে এই এলাকার প্রথম নির্বাচিত এম. এল. এ-স্বয়ের একজন। অপর জন হলেন বীরেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা)। জনসমিতির মূল কর্মকাণ্ড সীমিত ছিল, স্থানীয় অভাব অভিযোগ দেখানো এবং তা দূর করার চেষ্টায়। প্রথমদিকে জন সমিতির রাজনৈতিক প্রেরণা তেমন তীব্র ছিল না। তাই দেখা যায়, জন সমিতি জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি বা যোগাযোগে তেমন আগ্রহী ছিল না। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপ পার্বত্য চট্টগ্রামে সঞ্চারিত করার প্রয়াস খুব একটা নেয়নি। অল্পশীলন সমিতি এবং উগ্রপন্থী দলের কিছু কিছু সদস্য বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে অটুট আত্মগোপন করে থাকার জন্য মাঝে মাঝে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতেন। তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের সংকীর্ণ যোগাযোগ বা সড়ক, তা ছিল দৈবাৎ। ছিল ভাব আদান প্রদানের সুযোগ এবং সময়ের অভাব। তাঁদের সংস্পর্শের ফলে যদিও বা নামে মাত্র যে যোগাযোগ স্থাপিত হত, তাতে আন্দোলনের সামগ্রিকতা ছিল না। ছিল বিভিন্ন ক্ষুদ্র দলের

১) এইচ. ডি. হাডসন, দি গ্রেট ডিভাইড, পৃ: ৩৫৪।

২) এইচ. এন. পান্ডিত, র‍্যার্ডার্লিপ সোড, চাকমাম র‍্যাপ, অমৃত বাজার পত্রিকা, ১১মে, ১৯৮০।

৩) ল্যারি কলিন্স এ্যান্ড ডার্মানিক লাপেরারে, ম্যাডুটব্যাটেন এ্যান্ড দি পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া, ১৯৮২, পৃ: ১৭৮।

৪) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান রাবার্স এন্ড কোং, রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃ: ১৭৭।

চিন্তা চেতনার ঋণাত্মকতা ও বিস্তারিততা, যা মুন্সিবেগের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার একপ্রকার অন্তরায়। পরবর্তীতে মুসলিম লিগের জয় হলেও দলের নামে ধর্মীয় রঙ থাকায় তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যাবিষ্টারের চেষ্টা করে নি। জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেয়ার পথে স্থানীয়ভাবে জাত অন্তরায় এক জাতীয় দলগুলোর উদ্বাসীনতায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থনৈতিক ত বটেই, চিন্তা-চেতনার দিক থেকেও বিচ্ছিন্ন ও পশ্চাৎপদ থেকে যায়।

নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগে প্রয়াসী হন। নামের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক লেবেল আঁটা ছিল বলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল কংগ্রেসের প্রতি। এবং ভারতে অন্তর্ভুক্ত হবার প্রবল ইচ্ছাও। কিন্তু কংগ্রেস উপজাতিদের স্বার্থ দেখবে কিনা, তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ লাভ করতে পারবে কিনা, এই ব্যাপারে উপজাতি নেতৃবৃন্দ স্বস্তি বা নিশ্চয়তা তখনও পান নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন নেতাদের অগ্রতম কামিনী মোহন দেওয়ানের চিন্তা-চেতনায় এই আশঙ্কা পরিকার পরিফুট, 'এই সময় সারা ভারতব্যাপী কংগ্রেসের পতাকা তলে স্বরাজ্য আন্দোলন তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। ভদ্র ও শিক্ষিত লোকেরা অনেকে খন্দর ভিন্ন বিলাতি কাপড় পরিধান করিয়া বেড়াইতে লজ্জা ও আশঙ্কা বোধ করিতে লাগিল। সভাসমিতি সকল সময় সর্বক্ষেত্রে হইতে লাগিল। বহু কংগ্রেস চরমপন্থী আমাদের সঙ্ঘবলে ঐ শাখাতে যোগদানের জ্ঞতা চাপিয়া ধরিল। কংগ্রেসের বহু চরমপন্থী সময় সময় আমার বাড়ীতেও পড়াপড় করিতেছিল। আমি বলিতে লাগিলাম, আমার স্বতে এইরূপ আন্দোলন ও গুপ্তহত্যা, ধর্ম ও স্ত্রায়বিরুদ্ধ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতরণে বরং প্রস্তুত হইতে পারি। বিশেষতঃ এই অশিক্ষিত নিরীহ পার্বত্যবাসীর পক্ষে ইহা কুল্লপ্রস্থ হইবে। স্থান, কাল, পাত্রভেদে এইখানে ইহার এখনও সময় আসে নাই। পরিশেষে আমি তাহাদিগকে এই কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, তোমরা যদি আমাকে যুক্তিতে পরাস্ত করিতে পার, তবে আমি স্বাধীনতার জন্য তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি বটে যদি তোমরা আমাকে আরও একটি প্রশ্নের নিতুল উত্তর দিতে পার। তাহা হইল এই— ভারত স্বাধীন হইল অর্থে ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু ও মুসলমানরাই স্বাধীন হইল নুহিতে হইবে, কিন্তু সংখ্যালঘু অজ্ঞাত উপজাতি ও বাঙালী বড়ুয়া প্রভৃতি

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ আমাদের চাকরা জাতির বেলার কি নীতি অবলম্বিত হইবে বলিয়া তোমরা মনে কর ? তাহারা বলিল, স্বাধীনতা অর্থে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সমান অধিকার লাভে সমর্থ হইবে। ইহাতে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু বলিয়া থাকিবে না। আমি বলিলাম, ইহা শুনিতে এবং বইতে লিখিত বর্ণনা শ্রবণ করিতে প্রতিমধুর বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে কতদূর কার্যকরী হয়, ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

‘আমি ইহাও বলিলাম, মনে কর তোমার পরিবারে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ বিভিন্ন বয়সের লোকই আছে। বাড়ীর কর্তা যদি শিশু ও যুবাকে সমান অবস্থায় থাকিবার ব্যবস্থা করেন, তবে পক্ষপাত দোষ হইল না বটে, তবে তখন শিশুদের অবস্থা কি হইবে বলিয়া মনে হয় ? মনে কর ঘোঁড় প্রতিযোগিতায় বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলকে একসঙ্গে অংশ গ্রহণে বাধা করিলে ইহার পরিস্থিতি কি দাঁড়াইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমরা হিন্দু-মুসলমান সভ্যতা গর্বে প্ৰবৃত্ত জাতির তুলনায় নাবালক শিশুসমূহ। আরও একটা বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হয় যে, একদিন আমরা স্বাধীন ছিলাম। এখনও প্রায় অর্ধেক স্বাধীন-শাসনের সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছি। জাতীয় মোকদ্দমাধি আমরা নিজেরা নিষ্পত্তি করিয়া থাকি। স্বাধীনভাবে যে কোন স্থানে স্থানান্তরক্রমে বসবাস করিতে পারি। এইজন্য কোন জায়গা খরিদ বা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে হয় না। পারিবারিক ব্যবহারের জন্য যে কোন বনজ সম্পদ বিনা বাধায় ব্যবহার করিতে পারি—ইত্যাদি বহুবিধ সুবিধা, একই আইন বা নিয়মের অধীন থাকিতে হইলে ঐ সব সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া পাহাড়ীরা কদাপি আশ্রয়লাভ করিয়া বাচিয়া থাকিতে পারিবে না। যেমন সভ্যজাতির সঙ্গে সংমিশ্রণে পৃথিবীর বহু উপজাতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।তাহারা বলিল, নেতৃস্থানীয় লোক ভিন্ন ইহার বিষয়ে সঠিক উত্তর প্রদান সম্ভব নহে।

‘বহু নেতৃস্থানীয় লোকের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে মহাত্মা গান্ধীকে স্বীকার করিয়া লইতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি থাকিবে না। অতএব, তোমরা যদি আমার সঙ্গে একজন লোক হাও আমি এই অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুতর প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য বোধে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারি। তিনি ও সি. আর. রায় মহোদয় এখন বোধে অবস্থান করিতেছেন। যদি একজন আমার সহিত বাগ্ম্যর জন্য উপযুক্ত লোক পাই তবে আমি তাহার রাজস্বভার সম্পূর্ণ স্বয়ংভার গ্রহণ করিব। বোধে আসা—

বাণ্যার ব্যতীত বহন আধাকে সমস্ত যেখান তখনই এক সন্ত এম. এ. ডিগ্রি প্রাপ্ত যুবক এই উদ্দেশ্যে আমার সহিত বোম্বে যাইতে রাজী হইল। চট্টগ্রাম হইতে তৎপরদিন আমি তাহাকে লইয়া রওনা হইলাম। বোম্বে পৌছিয়া গান্ধেবী রোড্‌ নামক রাস্তায় এক প্রকাণ্ড অট্টালিকায় তাঁহার সহিত দেখা করতঃ উক্ত প্রহসন্যুহ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি একটি উত্তরেই তৎক্ষণাৎ সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, ‘গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়মে জনগণ যেই প্রকার শাসন পদ্ধতি চাহে, তাহাই পাইবে।’ সেইবার কামিনী মোহন দেওয়ান সরোজিনী নাইডু ও সি. আর. দ্বাশের সঙ্গেও বোম্বাইতে দেখা করেছিলেন। এরপর তিনি কখনও একা, কখনও বা শ্বেহকুমার চাকমাকে সঙ্গে নিয়ে, আবার কখনও শ্বেহকুমার চাকমা একা দিল্লী গিয়েছিলেন। রাজা ভুবন মোহন রায় ও পরে রাজা নলিনাক্ষ রায়ও তাঁদের প্রতিনিধি অবনী রত্ন দেওয়ানকে দিল্লী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় নেতারা পার্বত্য চট্টগ্রাম কার ভাগে পড়বে, এই জেলার অগ্রহ বা কি ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে, জেলার অধিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য বা কতটুকু এবং কি ভাবে রক্ষিত হবে, তার কোন নিশ্চিত কাঠামো বা বক্তব্য দেওয়া দূরের কথা, প্রচুর যুক্তির আড়ালে এই এলাকার প্রতি তাঁদের অনাগ্রহ লুকানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলে তিন রাজা—মং, বোমাং ও চাকমা। ভাল বোগাযোগ ব্যবস্থা, সার্কেলে বেশী জনসংখ্যা, শিক্ষিতের অপেক্ষাকৃত উচ্চ হার, তাঁর সার্কেলে জেলা সদর অবস্থিতি, তদুপরি নিজেও অপর দুই রাজার চাইতে শিক্ষিত হওয়ায় কারণে চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায়ের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও বোগাযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। স্বাভাবিক কারণে চাকমা রাজা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যত, বিশেষ করে চাকমা সার্কেল এবং তাঁর নিজের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তিন সার্কেলের তিন রাজাই নিজের নিজের সার্কেল নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কোন সময় তা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। এক সার্কেলে আঘাত এলে অন্য সার্কেলও বে অক্ষত থাকবে না, এই ভাবনার অভাব ছিল প্রকট। অথও পার্বত্য চট্টগ্রামের বার্ষ আট

-
- ১। কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রামের এক বীন সেনকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান প্রাচীন ও কোং. রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃ:- ১৪৮-৪৮।

সাকলে তিন সার্কেলের রাজার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা অস্বীকার থাকবে, এ বোঝের অভাবে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে একাবন্ধ কোন প্রয়াস পড়ে উঠেনি। শুটকিয়ের নেতা, স্বাধীন মনে করতেন তাঁরা জনগণের, তাঁদের মধ্যেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সম্প্রদায় নিয়ে একাবন্ধ প্রাটেক্সম না গড়ার দুর্বলতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। ফলে, আশংকিত সংকট পার্বত্য চট্টগ্রামের গোটা অমূল্য জনসোজ্জ্বল হওয়া সঙ্গেও সংকটমোচনের কম বেশী প্রচেষ্টা হয়েছিল রাজমাটি কেন্দ্রিক, নয়ত বাল্লবনকেন্দ্রিক, অথবা মানিকছড়িকেন্দ্রিক। সারা পার্বত্য চট্টগ্রামের তত্ত্বীতে অথও ছুর বাজেনি কখনও। জাতীয় নেতাদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইন্ডার উপর আলোচনা-আলোচনার জন্য যে পার্বত্য নেতারা দিল্লী কিংবা ভারতের অন্যান্য শহরে গিয়েছিলেন, তাঁরা সমষ্টির চেয়ে ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতারা এক হয়ে দিল্লী বা অন্য কোথাও যান নি কখনও। পৃথক পৃথক ভাবে যাওয়ার দরুন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উপর তাঁদের বক্তব্যে ভিন্নতা ছিল। ছিল সমাধানের রূপরেখার উপর ভিন্ন মত। দলগত কিংবা সকল সম্প্রদায়ের সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বের অভাবে তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় শক্তি ছিল অল্পশক্তি।

চাকমা সার্কেলে শিক্ষিতের হার বেশী হওয়ায় চিন্তা-চেতনার দিক থেকে অন্য দুটির চাইতে এই সার্কেল বেশ মানিকটা এগিয়ে ছিল। স্বভাবতই রাজনৈতিক গুরুত্ব ও উদ্বুদ্ধতা এই এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ছিল বেশী। রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলও প্রথম এই সার্কেল থেকে। দেশ ভাগের আগে চাকমা সার্কেলে ছিলেন তিন ব্যক্তিত্ব। এক, রাজা ভূবন মোহন রায়, দুই, জনসমিতির সভাপতি কামিনী মোহন দেওয়ান, তিন, জনসমিতির তরুণ সাধারণ সম্পাদক স্নেহ কুমার চাকমা। তিন জনের চিন্তার কারাক ছিল বিস্তার। সেই সময়ের পরিস্থিতি ও পরিবেশ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কামিনী মোহন দেওয়ান লিখেছেন, 'দ্বিতীয় জার্মান যুদ্ধ অবসানের পর, স্বাধীনতাকামী ভারতীয়গণ বহুকাল পূর্ব হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য অব্যবহিত কষ্ট, অপরিণীত ত্যাগ ও অকাতরে জীবন উৎসর্গের পরে ও যুদ্ধ অবসানেও আশাবিহীন প্রতিক্রিয়া ফল লাভের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, তখন সমগ্র ভারতের বিদ্রোহ জনতা নবউত্থাপে তাজ্জ্বলিত প্রবাহতুল্য বিপুল প্রেরণার জীবন পথে পুনঃ উজ্জ্বলিত ও সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় স্থির সংকল্প লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম করিতেছিল। তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট জনতার অনমনীয় প্রেরণা অন্ত্রবলে গতিরোধ করার সত্যাবনা

না দেখিয়া, তাহার চিত্তাচরিত নীতি ও স্বভাব মতে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির অঙ্গে পরস্পরের মধ্যে সন্ধেহ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের কথা ভাবনা করিল। এই ঘোষণার বাণী শুনিয়া, এই পার্বত্য জাতিদের মনেও এক নতুন চিন্তা ও নতুন প্রেরণার ভাব জাগিয়া উঠিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে আমরা হিন্দু-মুসলমান দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির শাসনাধীনে থাকিয়া, স্বীয় জাতির স্বাভাবিক রক্ষা করার সম্ভাবনা আছে কিনা ভাবিয়া চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করার সময় উপস্থিত হইল। কাল প্রভাবে বর্তমানে আমরা নগণ্য সংখ্যায় পৰ্যবসিত হইলেও এক সময় আমরাও স্বাধীন ছিলাম।.....অতএব এই সুযোগে আমাদের পূর্ব গৌরব ও সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে কিছুটা স্বায়ত্বশাসন লাভে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কি প্রকারের স্বায়ত্বশাসন আমাদের উপযোগী হইবে—ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে তিন শ্রেণী লোকের আবির্ভাব দেখা দিল।

‘চীকেরা চাহেন রাজতন্ত্র প্রথামূরূপ শাসন পদ্ধতি। জন সমিতির একপক্ষের নোক (স্নেহ কুমার চাকমার পক্ষীয়) চাহেন জনগণ কর্তৃক শাসন ক্ষমতার অধিকার লাভ। আমি এবং আমার দলীয় লোকেরা চাই, সমাজের নেতা কিংবা রাজা হিসেবে এই পদকে নির্বিশ্রাম ও স্থায়ী করার জন্য এমন এক শাসন নীতি প্রবর্তন আবশ্যক, যাহাতে চীফ বা রাজারূপে যিনি থাকিবেন, তিনি সকলের শিরোমণি গণ্য হইয়াও স্বীয় খেয়ালের বশে কিংবা স্বার্থসুবিধার ব্যতিরে ইচ্ছা করিলেও যেন প্রজার ক্ষতি ও উন্নতির বিষয় স্থগিত করিবার উপায় না থাকে।’

অবস্থা এমন জটিল আকার ধারণ করেছিল যে, কেউ কারও মত থেকে একচুল নড়তে রাজি হন নি। মতানৈক্যের চরম অচলাবস্থার দরুণ দাবি আদায়ের মোটামুটি যে ভিতটুকু ছিল, তা নড়বড়ে হয়ে যায়। অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা বালা বাধে নেতা ও জনগণের মনে। ফলে, রাজা ভুবন মোহন রায় আরও বেশী রক্ষণশীল হয়ে যান এবং নিজের স্বার্থ যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কি ভাবে আগলান যায়, তাই নিয়ে চিন্তিত থাকেন। স্নেহ কুমার চাকমা আরও বেশি উগ্রপন্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কামিনী মোহন দেওয়ান মধ্যপন্থা নিয়ে রাজা ভুবন মোহন রায় ও স্নেহ কুমার চাকমার মাঝে গড়ে ওঠা ফেরাল ভেঙে দিতে

-
- ১) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীনসেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান রাবার্স এন্ড কোং, রাডামারিট, ১৯৭০, পৃঃ ২৪২-৫০।

চেষ্টেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। তারপর চেটী করেন মেহ কুমার চাকমাকে সঙ্গে নিয়ে চলার। এই প্রচেষ্টায়ও তিনি অসফল হন। তিন ব্যক্তিত্ব বা শক্তি বহি হ্রাসতম ভিত্তিতে এক থাকতেন, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সমস্তার রূপরেখা হয়ত ভিন্ন হত। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন রাজা নিজেদের স্বার্থ অটুট রাখতে উপমহাদেশ বিভক্তির আসে স্ব স্ব সার্কেলের জন্য দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা দাবি করেছিলেন ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের কাছে। ভারতের ভাগ্য নির্ধারণের তিন শক্তি তাঁদের দাবির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না। পরবর্তীতে তাঁরা প্রত্যাব রেখেছিলেন, তিন সার্কেল, ত্রিপুরা, কুচবিহার ও খাসিয়া রাজ্যকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠন করতে। যা থাকবে কেন্দ্র শাসনাবধীনে।^১ এক্ষেত্রেও রাজারা ব্যর্থ হন। রণকৌশলও তাঁরা বদলান। ২২ রাজা ও চাকমা রাজা, বিশেষত চাকমা রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় উনিশ শ ছেচল্লিশ সালে 'হিলম্যান এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত ভূক্তির জন্য তহবির করা ও রাজাদের আধিপত্য রক্ষার চেষ্টা।^২

উনিশ শ ছেচল্লিশের শেষে কিংবা সাতচল্লিশের গোড়ার দিকে কংগ্রেসি এক কমিটি রাজ্যমাটি আসেন। কমিটির রাজ্যমাটি আসার উদ্দেশ্য ছিল, পার্বত্য উপজাতিদের জন্য কি ধরনের শাসন প্রণালী উপযোগী, তা খতিয়ে দেখা এবং হাইকমান্ডের কাছে রিপোর্ট করা। সর্বভারতীয় এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এ. ভি. ঠাকুর। কমিটির সদস্যরা ছিলেন, ডাঃ প্রমুদ ঘোষ, অরুণাল সিংহ, রাজকৃষ্ণ বোস, ফুলবান সাহা ও জয়প্রকাশ নারায়ণ। কমিটিতে কো-অপ্ট মেম্বর ছিলেন মেহকুমার চাকমা। সর্বভারতীয় কমিটিকে উপজাতি প্রথায় প্রাণঢালা সমর্থন জানানো হয়েছিল। রাজ্যমাটি খেলার মাঠে জনসভা হয়েছিল। সেই সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন কামিনী মোহন দেওয়ান।^৩

- ১) অঙ্গবশে মহাধের, স্টপ জেনসাইড ইন চিটোগাং হিল ট্র্যাকটস, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮১, পৃ: ৩।
- ২) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীনসেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান রাদার্স এন্ড কোং, রাজ্যমাটি, ১৯৭০, পৃ: ২৯২।
- ৩) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীনসেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান রাদার্স এন্ড কোং, রাজ্যমাটি, ১৯৭০, পৃ: ২৫৪-৫৮

স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহ ও সাহস অত্যাধিকার উচ্চতা পেয়ে কমিটির নেতাদের অভিস্কৃত মন্তব্য, ‘অনেকদিন যাবত বাতাস বন্ধুত্বের হিপি খুলিয়া গেলে যেমন জোরের সহিত উহার বাতাস নির্গত হইয়া যায়, ইহাদের সেই অবস্থা হইয়াছে।’

আলাপ আলোচনার জন্ত স্থান নির্বাচিত হয়েছিল রাঙামাটি সার্কিট হাউস। কমিটির সদস্যগণ রাজা এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন কামিনী মোহন দেওয়ান, নীরোধ রঞ্জন দেওয়ান, তুবন চন্দ্র চাকমা ও দনজাম দেওয়ান।^১ কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের দাবি-দাওয়ার অনেকাংশ মেনে নিয়েছিলেন। সেইভাবে হাইকমান্ডের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। রিপোর্টের কার্যকারিতা কতটুকু ছিল, তা জানা গিয়েছিল ভারত বিভক্তির পর যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।^২ ভারতের বিশেষ করে কংগ্রেসের কিছু নেতার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের প্রতি আগ্রহ ও সহানুভূতি ছিল। কিন্তু ভাগাভাগি রাজনীতির অন্ধ গলিতে সব সন্ধিচা হারিয়ে গিয়েছিল।

ভারত বিভক্তিতে পূর্বাঞ্চলের কোন অংশ কার ভাগে বাবে, এমন সব বিতর্কিত বিষয়ের উপর তখন বেলবেড়িয়া হাউসে সুনানি চলছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অন্তর্ভুক্তিতে কংগ্রেসের দাবির চাইতে, পাকিস্তানে এই জেলা অন্তর্ভুক্তির জন্ত মুসলিম লিগের দাবি এবং জিৎ ছিল বেশি। মুসলিম লিগের পক্ষে ঝাঁরা ওকালতি করছিলেন, তাঁরা পার্বত্য উপজাতির বিশেষ করে সেই স্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, চাকমাদের মুসলিম নাম ও পদবী ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করেন।^৩ মোগল শাসনের সময় মোগলদের প্রতি শুভেচ্ছা ও আহুগতা প্রদর্শনের জন্ত চাকমা রাজারা, কোন ক্ষেত্রে সম্রাট প্রজারা মুসলিম নাম ও পদবী ব্যবহার করতেন। যদিও তাঁরা কোনদিন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন নি। চাকমা জাতির ইতিহাসে চন্দন খান, জালাল খান, শেরমত খান, শের দৌলত পাগলা,

১) এ, পৃ: ২৫৩-৫৪।

২) এ, পৃ: ২৫৬।

৩) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী পৃ: ২৫৬।

৪) সূর্যকান্ত চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকথন, কলকাতা, ১৯৮৩।

টব্বর খান, জব্বর খান, খরম বক্স খান প্রমুখ রাজাদের নাম ও কর্মবিবরণী পাওয়া যায়। মুসলিম নাম গ্রহণ করলেও তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।^১ তা সত্ত্বেও নাম ও পদবী ব্যবহারের অজুহাত দেখিয়ে মুসলিম লিগের উকিলরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় চাকমাদের মুসলিম বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।^২ রাডক্লিফ এওয়ার্ড বোধিত হবার আগে পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতারা ভারত ভূক্তির জন্য কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা ধোঁড়াধোঁড়ি করে সামান্য সহায়ত্ব ছাড়া আর কিছু আদায় করতে পারেন নি। দায়ী প্রধানত কংগ্রেসী উলসীনতা, অনেকের মতে কংগ্রেসী বেইমানি। দ্বিতীয়তঃ পার্বত্য নেতাদের অস্বার্থ।

ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ আয়গাওলি ভাগ্যভাগির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন ভাগে যাবে, সেই সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ভুবন মোহন রায় নিজেকে গুটিয়ে নেন। এবং যা হয়, তাই মেনে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। কামিনী মোহন দেওয়ান যদিও হাল ছাড়েন নি, তবু অনেকটা নিকটসাহ হন। কেউ কিছু করবে না যখন, নিজেকে ভাগ্য নিজেদের নির্ধারণ করতে হবে, এমন একটা পরিকল্পনা নেন জনসমিতির সাধারণ সম্পাদক স্নেহ কুমার চাকমা। তিনি গোপন সভা করলেন গ্রামে গ্রামে। পুলিশদের নিয়ে বিজ্রোহ করতে সচেষ্ট হলেন তিনি। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে দু' একজন অফিসার ছাড়া সব পুলিশ ছিল উপজাতি। সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েও ফেলেছিলেন, ভারত ও পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বলবল নিয়ে ভারতীয় পতাকা তুলবেন। কামিনীমোহন দেওয়ান এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি যুক্তি দেন, হঠকারিতা করাটা অবिवেচকের কাজ হবে। উপজাতিদের ভাগ্য যদি নির্ধারণের ব্যাপার হয়ে থাকে, তবে তা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের ভাগে পড়লে, তা মেনে নিতে হবে। বর্তমান অবস্থার সত্ত্ব গঠিত কোন রাষ্ট্র ক্ষুদ্র জাতিকে 'জোর প্রকাশ পূর্বক' কোন প্রকার সাহায্য প্রদানে সম্মত হতে পারে না। তিনি এই রকম হঠকারিতামূলক পদক্ষেপে মারাত্মক ফল ফলবে বলে প্রকাশ

১) বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য—বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, কালিগঞ্জ দেওয়ান, রাঙামাটি, ১৯৬৯।

২) স্দরক্ক চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, কলকাতা, ১৯৮০।

করেন। মেহ কুমার চাকমার 'একশ'রুমী ও ভাবাবেগ প্রাপ্ত উদ্ভাষনা' রোক্ত করতে পারবেন না জেনে তিনি জনসমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।^১

পূর্ব পরিবর্তন মত, উনিশ শ সাতচল্লিশের পনের আগষ্ট মেহ কুমার চাকমা তাঁর দলবল নিয়ে প্রকাশ্যে রাঙামাটিতে জেলা প্রশাসকের অধিসের সামনে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উদ্ভূতী থাকে বিশেষ আগষ্ট অবধি। জনসমিতি প্রতিরোধ বাহিনীও গঠন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান বাহিনীর তুলনায় সেই প্রতিরোধ ব্যর্থ ছিল খুবই দুর্বল। এক্ষেপে আগষ্ট পাকিস্তানের বালুচ-রেজিমেন্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা তোলে।^২

অন্তর্দিকে বোমাং সার্কেলের জনসংখ্যার অধিকাংশ মারমা। মারমারা বৃহত্তম বর্মী জনগোষ্ঠীর অংশ। তারা বার্মার সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিল। পাকিস্তানে অস্তত্বুক্তিতে বোমাং সার্কেল, বিশেষ করে রাজ পরিবারের নেতৃস্থানীয় কয়েক ব্যক্তি ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। প্রতিবাদ ও বার্মার সঙ্গে একাত্ম ঘোষণার প্রতীক হিসেবে তাঁরা বান্দরবনে বার্মার পতাকা তোলেন। রাঙামাটির মত বান্দরবনেও পাকিস্তানী সৈন্যরা বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা তুলেছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকাপাকিভাবে পাকিস্তানের অস্তত্বুক্ত হয়। মেহ কুমার চাকমা তাঁর দলবল নিয়ে দেশত্যাগী হন। বোমাং রাজপরিবারের কিছু সদস্য বার্মাতে আশ্রয় নেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অস্তত্বুক্তিতে ক্ষুব্ধ হন সর্দার বজ্র ভাই প্যাটেল।^৩ রাজনৈতিক চাপে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্ত অসুতপ্ত হন আর সিরিল র্যাডক্লিফ। হিন্দু-মুসলমান এলাকা চিহ্নিত করার জন্ত তাঁকে দেয়া হয়েছিল দু'হাজার পাউণ্ড। সেই টাকা তিনি নেন নি। জানিয়েছিলেন নীরব প্রতিবাদ।^৪ আর খানের নিয়ে এতকাণ্ড, খানের অধিকাংশ

- ১) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রামের এক ধীন সেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এন্ড কোং, রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃ: ২৫৬-৫৭।
- ২) মেহকুমার চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, আগরতলা, ১৯৮২ ও অন এ্যাকাউন্ট অফ চিটাগাং হিল ট্রাঙ্কস, জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৪ জুলাই, ১৯৮২, পৃ: ৩-৪।
- ৩) এ্যালান ক্যাম্বেল জনসন, মিশন উইথ রাউন্টব্যাটেন, পৃ: ১৩৯।
- ৪) এইচ. এম. পাণ্ডিত, র্যাডক্লিফ সোভ চাকমার রাঁপ, জম্মত বাজার পাবিকা. ১১মে, ১৯৮০।

জামে না, কেন এই দেশ বিভাগ, কেনই বা ভারত ও পাকিস্তান, পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই উপজাতি জনগণ পড়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে। বাড়ে শংকা। সতর্কতা আর-দুরূহবোধ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে আটটা শ'ষাট সালে। চট্টগ্রামের পূর্বে পার্বত্য অরণ্যকলকে চট্টগ্রাম থেকে আলাদা করে এই জেলা গঠন করা হয়।^১ এই জেলা বিভিন্ন ভাষাভাষি বিভিন্ন ধর্মালম্বী সংখ্যালঘু তেরটি সম্প্রদায়ের বাসভূমি। ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চাকমা, তঙচকা, চাক, খেয়াং, খুমি, ত্রিপুরা, মুন্স শ্রো, লুসাই, বোম, বনবোসী ও পানকো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের এই অঞ্চলে আগমন ঘটেছিল। নিজস্ব স্বাভাব্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গঠন ও প্রকৃতিতে অখণ্ডতা ও অভিন্নতা বজায় রেখে প্রাকৃতিক ও বিকশিত হয়ে উঠেছিল প্রতিটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও জীবনধারা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎস অর্থাৎ তারা কোন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, কখন কিভাবে তাদের চট্টগ্রাম ও পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে পদার্পণ ঘটেছিল, এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেণী সঙ্ঘানের উদ্দেশ্য বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য নয়। বিভিন্ন ভাষাগত ক্ষুদ্রজাতি সমূহের উৎস ভূমি, জনগোষ্ঠী ও বিবর্তন ধারা নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত ও ঐতিহাসবেত্তাদের মতানৈক্য থাকলেও এটা সত্য যে, মঙ্গোলীয় বংশসম্ভূত সম্প্রদায়ের যুগে যুগে অনেকটা এবং অংশত নিসিবিদ্ধভাবে যে কালিক ঘটনাপঞ্জী বিবৃত রয়েছে, তা ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে মূল্যবান। উপাখ্যানগুলো রোমাঞ্চিক এবং বিভিন্ন সময়ে রাজা, রাজকুমার কিংবা যোদ্ধার বীরত্বপূর্ণ গাথার পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। বুদ্ধগুলো ঐতিহাসিক এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের, কোনটি মূল ও জলদস্যুদের তাড়াতে, কোনটি মগ, মে'গল, পর্দু'মৌজ ও ব্রটিশদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের পোড়োপত্তন ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও জাতিগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সমূহ ক্রমে ক্রমে কোন্ঠাগা হয়ে পড়ে। মোগলদের আসার আগে চট্টগ্রাম এক আশেপাশের অঞ্চলে একক শক্তিশালী ও স্বায়ী কোন শক্তি ছিল না। সেই কারণে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের

১) রায়মোহন চন্দ্রবর্তী বাহাদুর, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৯১৮, পৃ. ২৭ ও হাসিনুল অর. এইচ. সিনড, এ্যান্ড গ্র্যান্ডস্ট্রিট অফ চিটাগাং হিল স্ট্রাটস, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক শিটশা, ১৯০৬, পৃ. ৪।

প্রশাসন নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করত। বৃহৎ বহিঃশক্তি সমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মত তাদের হাতে সময় ছিল না বা তারা তা করত না। সতের শ সাতাত্তর সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই পার্বত্য অরণ্যাকুল দখল করে। সতের শ সাতাশি সালে এক চুক্তি বলে এই অঞ্চল ব্রিটিশ ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।^১ আঠার শ ষাট সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ ভারতের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে। অধিকন্তু ব্রিটিশ ভারত সরকার ৫,০২৫ বর্গমাইল নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে—চাকমা, বোমাং ও মং—ভাগ করে প্রতিটি সার্কেল একজন প্রধান বা রাজার নিয়ন্ত্রণে দেয়। তিনটি সার্কেল ৩৬৫ টি মৌজা নিয়ে গঠিত। প্রতিটি মৌজা দেখাশোনার করার জন্য একজন হেডম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি মৌজা গঠিত। প্রতিটি গ্রাম আবার একজন কার্ভারীর প্রশাসনাধীনে দেওয়া হয়। প্রশাসনের সার্বিক দায়দায়িত্ব পালনের জন্য একজন সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসন ব্রিটিশদের হাতে ঘাবার আগে অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিচার ও শাসন ব্যবস্থার সার্বভৌম ক্ষমতা রাজাদের হাতে ছিল।^২ শাসনভার নিজেদের হাতে নিলেও ব্রিটিশরা রাজাদের কাছে বিশেষ একটা নাক গলাতো না। রাজাদের পদ মর্যাদাও অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। যদিও ক্যাপ্টেন টমাস, এইচ, লুইন সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সুপারিশ মানা হয়নি। বরং বাংলার গভর্নর কোন প্রকার তড়িঘড়ি পরিবর্তন না করার নির্দেশ দেন।^৩

- ১) এ্যান একাউন্ট অফ্ চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, জনসংহতি সমিতি, ১৪ই জুলাই, ১৯৮২, পৃ: ২, অঙ্গবংশ মহাশয়ের নটপ জেনসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, কলিকাতা, অক্টোবর, ১৯৮১, পৃ: ২।
- ২) লে: কর্নেল টমাস এইচ লুইন, এ. ক্লাই অন দি হুইল, কনস্টেবল এন্ড কোং লিঃ লন্ডন, ১৯১২, পৃ: ২০৬-৭।
- ৩) সুগত চাকমা, চাকমা পরিচিতি, বরগাও পাবলিকেশন্স, অক্টোবর, ১৯৭০, রাঙামাটি, পৃ: ১৪-১৫।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজাদের না চটানোর প্রধান কারণ ছিল তুলা।^১ বৃটেনের বস্ত্র কারখানাগুলো চাচু রাখতে প্রয়োজন ছিল কাঁচা মালের। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলার উৎপাদন ছিল সম্ভাব্যজনক।

উপজাতিদের সামাজিক বিকাশে যাতে স্বকীয়তা বজায় থাকে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাপে উপজাতিরা হারিয়ে না যায়, তার রক্ষাকবচ হিসেবে বৃটিশ—ইণ্ডিয়া সরকার উনিশ শ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নন-রেগুলেটেড জেলার মর্যাদা দেয়।^২ এই রেগুলেসন বলে রাজাদের প্রভাব, মর্যাদা ও ক্ষমতা স্বীকার করে নেয়া হয়। এই রেগুলেসন জারী হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বহিষ্কৃত এলাকা (Excluded area) হিসেবে চিহ্নিত হয়। আঠার শ ষাট সাল থেকে শুরু করে উনিশ শ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসন সম্পর্কিত যে সব নিয়মবিধি জারী হয়েছিল, তারই অসংহত কাঠামো ও নীতিনির্ধারক হল উনিশ শ সালের রেগুলেসন। উনিশ শ সালের রেগুলেসন জারী হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ও প্রজাদের স্বত্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বেড়ে গিয়েছিল অনেক। উনিশ শ সালের রেগুলেসন প্রথম সংশোধন করা হয় উনিশ শ বিশ সালে এবং পরে উনিশ শ পঁচিশ সালে। উভয় সংশোধনীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনে নতুন নীতি সংযোজিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৃটিশ আমলে বাংলা কিংবা ভারতের আইন পরিষদে পাশ করা আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসিত হয় নি। হয়েছিল বাংলার গভর্নরের প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে প্রণীত রেগুলেসন অফিসারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দই আগষ্ট পর্যন্ত উনিশ শ সালের রেগুলেসন অফিসারে শাসিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের ভাগে পড়ার পর সেই সংকটগুলোর একটি হল, বা ভারত উপমহাদেশ হাতছাড়া হবার সময়ে বৃটিশরা সমাধান করে নি বা সমাধানের রূপ রেখা দিয়ে যায় নি। সঁপে দিয়ে গিয়েছিল লুপ্ত জন্ম নেয়া ভারত ও পাকিস্তানের কাঁধে। স্বাভাবিকভাবে দুটি দেশের স্থিতিশীলতা,

১) এল. এস. এস. ও মেলেরী, ইন্টার্ন বেসাল ডিস্ট্রিক্ট গেজোর্টার্স—
চিটোগাং, দ্বি বেসাল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ১৯০৮, পৃ:৩৮।

২। বেসাল গভর্নমেন্ট নোর্টিফিকেশন নং ১২০ পি. পি. ১লা মে, ১৯০০।

সামাজিক- আর্থ- রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও প্রগতির উন্নয়ন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সেই সমস্তাঙ্গুলোর সমাধান। কারণ, স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান যাতে কমনওয়েলথে যোগ দেয়, এই অহুরোধ ছাড়া ব্রিটিশ সরকার দেশ ভাগের সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকে সম্ভবত অল্প কোন অহুরোধ করেনি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ধর্ম, ভাষা ও জাতিগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের আসন্ন ভাগ্যবিড়ম্বনা নিয়ে আশঙ্কিত ছিল। ভারত ও পাকিস্তান, দুটি রাষ্ট্রই নিজেদের স্বার্থে এবং প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকারের আইন-কাহুন বহাল রেখেছিল। ব্রিটিশ পেনাল কোড ভারতীয় পেনাল কোড ও পাকিস্তান পেনাল কোডের নাম নিয়েছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসন ও এলাকার বিশেষ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে, ব্রিটিশ সরকার যে সব নিয়মবিধি ও নীতি জারী করেছিল, সেগুলি পাকিস্তান সরকার কতটুকু রক্ষা করবে, তা নিয়ে উদ্বেগ ও সন্দেহের সীমা ছিল না। বিশেষ করে স্বাধীনতা লগ্নে এই জেলার দুইস্থানে বার্মা ও ভারতের পতাকা উড়ান হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান কি ধরনের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে, তা অহুমান করে শঙ্কিত ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিম জনগোষ্ঠী। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের মুসলিম সমাজের মধ্যে যে শংকা, সতর্কতা ও দূরত্ববোধ জন্ম নিয়েছিল, অনেকটা অহুরূপ মানসিকতা সঞ্চারিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ধর্ম, ভাষা ও জাতিগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহের মনে। জনগোষ্ঠীর একটা অংশ এই মানসিকতার মারাত্মক শিকার হয়। তারা দেশ ভাগ করে আশ্রয় নেয় বার্মা ও ভারতে। পাকিস্তানকে ঘারা মেনে নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতায় হাত সম্প্রসারণ করে, তারাও সম্পূর্ণ আশঙ্কামুক্ত হতে পারেনি। পারেনি জনসাধারণের সামনে ভবিষ্যতের ছবি পরিস্কার করে তুলে ধরতে। জাগাতে পারেনি জনসাধারণের মনে স্বস্তি, নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাবোধ। ফলে উপজাতি জনগণের অধিকাংশ নিজেদের গুটিয়ে নেয়।

স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তানের রাজনীতি অস্থির হয়ে ওঠে। উনিশ শ চল্লিশ সালের লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত-‘রাজ্যগুলো’ (স্টেটস) শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে স্তব্ধ হয় কেন্দ্র বনাম প্রদেশগুলির লড়াই। পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন দেয়ার জোর দাবি ওঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামো কি ধরনের হবে, কোনটি হবে রাষ্ট্রভাষা, তা নিয়ে চলে আলোচনা। বস্তত দাবি পাণ্টা-দাবির লড়াই অব্যাহত থাকে বহুদিন।

দেশের পূর্ব অংশকে বন্ডিত ও শোষণ করার প্রবণতা পাকিস্তান সরকারের

প্রথম থেকেই ছিল। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রকমতায় বসে পশ্চিম অংশের নেতারা। তাঁরা এমন ভাব শুরু করেন যাতে মনে হয়, পাকিস্তান হাসিলের সংগ্রামে পূর্ব অংশের কোন অবদান নেই। তাঁরাই একক ভাষে লড়াই করে পাকিস্তান কায়েম করেছেন। পাকিস্তান হাসিলে পূর্ব বঙ্গের ত্যাগ ও অবদান ইতিহাস বিহিত। অথচ পাকিস্তান কায়েম হবার পর থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস উদ্বেগজনকভাবে বিকৃত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। পশ্চিম অংশ, বিশেষ করে পাক্সাবী গোষ্ঠী তাদের শাসন শোষণ বহাল রাখতে পাকিস্তানের জনগরিষ্ঠ অংশ পূর্ব-বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। বাংলা ভাষা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা, পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ছান্নার শতাংশের মুখের ভাষা। কিন্তু তাদের মতামতের কোন মূল্য না দিয়েই রাষ্ট্রভাষা করা হয় উদ্ভূকে। প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তীব্র। পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর মুখের উপর পূর্ব বাংলার জনগণ ছুঁড়ে দিয়েছিল তীব্র প্রতিবাদ, বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ : 'না'।

ভাষা আন্দোলনকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের লড়াই। উনিশ শ আটচল্লিশ সালের 'না' পরবর্তীতে জন্ম দিয়েছিল অনেক রাজ-নৈতিক আন্দোলন। যার চেউয়ের পর চেউ পাকিস্তানের বৈষম্য ও শোষণনীতির মূলে কঠোর আঘাত ছেনেছিল। বাহার সালে ভাষা আন্দোলন তীব্রতর হয়। শহীদ হন ছাত্র জনতা। গণ্ডীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন। শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে চলছিল তখন ষড়যন্ত্র। কে কাকে তাড়িয়ে গম্বিতে বসবেন, তাই নিয়ে নেতারা মত্ত ছিলেন। আটচল্লিশের এগারই সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ অনুখে মারা যান। দুই বছর পর আততায়ীর গুলিতে নিহত হন প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলি খান। পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রতম দুই স্বপ্নতির আকস্মিক মৃত্যুতে পাকিস্তানে স্বাধীনতার রাজনীতি বিগুন প্রেরণায় জন্মে উঠে।

উনিশ শ চুয়ান সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার মানুষ আওয়ামী লিগ ও কৃষক প্রজা পাটির নেতৃত্বে গঠিত যুক্ত ফ্রন্টকে নির্বাচিত করে। মুসলিম লিগের হয় ভয়ানক। আইন পরিষদের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন কৃষক প্রজা পাটির প্রধান শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। পশ্চিমী শাসক গোষ্ঠী নির্বাচনে নির্ধারিত পরাজয় সহজ ভাষে নিতে পারেনি। যে কোন অজুহাতে পূর্ব বাংলার জনগণের সরকারকে বাতিল করার যৌক্তিক সময়ের

অপেক্ষার থাকে তারা। সুযোগ এসেও গিয়েছিল। শেষে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর শুভেচ্ছা সত্বে পশ্চিমবঙ্গে যান। কর্মজীবনের সোনালী দিনগুলো তাঁর কেটেছিল কলকাতায়। কলকাতায় এসে বহু পরিচিত ও বনিষ্ট বন্ধুদের সাহচর্য পেয়ে তিনি ভীষণ অতিভূত হয়ে পড়েন। তেঁসরা মে নেতাজী ভবনে ভাষন দান কালে নেতাজী ও শরণ বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি একজন পাকিস্তানী, এবং আমি একজন পাকিস্তানী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে কোন রাজনৈতিক বিচ্ছেদ হয়নি, এমন ভেবে তাঁদের সম্পর্ক উন্নত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ করার চেষ্টায় কোন দোষ দেখতে পাইনা।’^১ ষোল আনা বাঙালী শেরে বাংলার এই মন্তব্যটি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর হাতিয়ার হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় এ মন্তব্য নিয়ে বিস্তার লেখা-লেখি হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্ততম পুরোধা, লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক বাংলার নির্বাচিত নেতাকে সরকারি মহল ‘ভারতের পোস্ট দালাল’ আখ্যা দিতে বিন্দুমাত্র কার্পন্য করেনি। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গুরার মোহাম্মদ আলি শেরে বাংলাকে বলেছিলেন, আত্মস্বীকৃত বিশ্বাসঘাতক।^২

সেই শুরু। এরপর থেকে পূর্ব বাংলার জনগন যখনই তাদের বাঁচার দাবি আদায়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলন করেছে, তখনই তাদের বলা হয়েছে, হিন্দুস্থানের লেলিয়ে দেয়া কুকুর। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিম উপজাতিদের বার্ষাপন্থী বা ভারতপন্থী হিসেবে পাকিস্তান সরকার চিহ্নিত করবে, এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ববাংলার একটি জেলা। পূর্ব-বাংলার ভাস্যের সঙ্গে তাই এই জেলার ভাগ্য জড়িত। তা সত্ত্বেও পার্বত্য

১। মাহহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ: ১৪৩-৪৪, অমিতাভ গুপ্ত, গতিবেগ চম্পল বাংলাদেশ মুক্তি সৈনিক শেখ মুজিব, শব্দ প্রকাশনী, ১৯৭০, কলকাতা, পৃ: ৭৭-৭৮, মিলন দত্ত, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু মুজিবর ও ভারতের ইন্দিরা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৭০, পৃ: ৩৩-৩৪।

২। আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ: ৩৪০।

চট্টগ্রামের সঙ্গে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত জেলার গুণগত কিছু পার্থক্য ছিল। পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত অংশের জনগণের সমষ্টিগত না হোক, ব্যক্তিগত ভাষা গড়ার যে স্থানতম সুযোগ ছিল, তা পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে একেবারেই ছিল না। এটি সত্য সারা পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পরিবেশ ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অংশ যে সামান্য পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত, তা থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা ছিল বঞ্চিত।

নন-রেগুলেটেড জেলা হওয়ার দরুন পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল খুবই সীমিত এবং বিধিনিষেধের জালে আবদ্ধ। ধর্মীয় সত্য করতেও পূর্ব অহুমতির প্রয়োজন হত। সম্ভবতঃ তিন রাজ্যও চাইতেন না, জনগণ রাজনীতি সচেতন হোক। তাঁরা হয়ত শঙ্কিত ছিলেন, জনগণ রাজনীতি সচেতন হলে, তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে না। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক দলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আগ্রহ দেখায় নি। আগ্রহ দেখালে পূর্ববাংলার স্বাধিকার অর্জন আন্দোলনে উপজাতিদের শরীক করা যেত। উপজাতিদের দেওয়া যেত নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর আবার সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেন কামিনীমোহন দেওয়ান। উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের উনিশে ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের অহুমতি নিয়ে গঠিত হয় 'হিল ট্র্যাকটস সিপলস, অর্গানাইজেশন'।^১ এটা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠন গড়ার তৃতীয় প্রচেষ্টা। 'জন-সমিতি' এবং 'হিলম্যান এলোসিয়েসন' পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। তৃতীয় প্রচেষ্টাও বেশীদূর এগুতে পারেনি। বলা বাহুল্য, এই সমিতিও টেকেনি।

উনিশ শ' সালের রেগুলেশন পাকিস্তান সরকার বলবৎ রাখে। সেই অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসন ব্যবস্থা বহাল থাকে। উনিশ শ' সালের রেগুলেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্ত কিছুটা স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল। বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্ত উপজাতিদের থেকে রিজুট করে একটি আলাদা পুলিশ বাহিনী গঠন করেছিল। এই পুলিশ বাহিনীর আলাদা নিয়ম

১। কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এন্ড কোং, রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃ: ৩৬৬।

কাহ্নন ছিল।^১ এতে জেলার শান্তি স্থালা রক্ষার কাজে উপজাতিদের অংশ-গ্রহণের একটা সুযোগ ছিল। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া সরকার পার্বত্যবাসীর মনে নিরাপত্তার ও সহযোগিতার মনোভাব জাগানোর উদ্দেশ্যে এই বিশেষ পুলিশ বাহিনী গঠন করেছিল। তা স্বফলও দিয়েছিল। আটচল্লিশ সালে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন উঠিয়ে দেয়। বিলুপ্ত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্ত বিশেষ বাহিনী। উপজাতি জনগন ধরে নেয়, তাদের অধিকার ধ্বংস হল।

ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন চালানোর সুবিধার্থে মাঝে মধ্যে রাজাদের পরামর্শের চাইত। রাজাদের পরামর্শের ঋণেই মর্বাদাও দেয়া হত। রাজাদের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী ও জেল ছিল। উপজাতিদের গুরুতর অপরাধ, যেমন ধর্ষন, খুন, ডাকাতি ছাড়া লম্বু অপরাধের সাজা রাজারা নির্ধারণ করতেন। রাজারা গুরুতর অপরাধের সাজা সুপারিশ করে অপরাধীকে জেলা সুপারিনটেন্ডেন্টের আদালতে পাঠাতেন। জেলা সুপার সাধারণত রাজাদের সুপারিশের সম্মান রাখার চেষ্টা করতেন। গ্রাম ও মৌজার বিচার করতেন কার্বারী ও হেডম্যান। উপজাতি প্রথা অনুসারে বিচার বসত। সাজা হত উপজাতি কাহ্ননে। রাজা প্রথার মত কার্বারী ও হেডম্যান প্রথা বঙ্গোপকূলিক নয়। রাজার ছেলে রাজা হয়। কিন্তু হেডম্যান বা কার্বারীর ছেলে হেডম্যান বা কার্বারী হবে, তার কোন নিশ্চিত ব্যবস্থা নেই। রাজা এক জেলা সুপার ঐক্যমতের ভিত্তিতে যে কাউকে হেডম্যান কিংবা কার্বারী মনোনীত করতে পারতেন। তবে বয়সজনিত কারণে বা দুরাচারের অভিযোগে সরে দাঁড়ানো হেডম্যান বা কার্বারীর ঐ পদের বোধ্য, কোন সম্মান থাকলে, সে মনোনয়নের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পেত।

উপজাতি জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল জুমচাষ (শিকটিং কালটিভেশন)। জুম অঞ্চলগুলো ব্যক্তি মালিকাবীন নয়, সম্প্রদায়গত। কার্বারী এবং হেডম্যানের অনুমতি নিয়ে যে কোন ব্যক্তি যে কোন অঞ্চলে জুম চাষ করতে পারে। বিনিময়ে প্রতিটি জুমচাষীকে রাজনা হিসাবে প্রতিবছর হেডম্যানকে—যিনি জুমকর সংগ্রহকারী—ছয় টাকা দিতে হয়। হেডম্যান ছয় টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা ধেন তাঁর সার্কেলের রাজাকে। সোয়া এক টাকা সরকারকে। বাকীটা তাঁর প্রাপ্য।

১। চিটাগাং হিল ট্র্যাকস ফ্রন্টিয়ার পলিশ রেগুলেশন III ১৮৮১, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সারকুলেশন, এই ডিসেম্বর, ১৮৮১।

বছরের একটা দিনে হেডম্যানরা জুন্ কর খ খ রাজার কাছে পেশ করেন। জুন্ থেকে ফসল পাওয়ার সঙ্গে মিল রেখে দিনটি নির্ধারিত হয়। দিনটিকে বলা হয় রাজার অধিষ্ঠান দিবস বা পুজাহ, উৎসব। সঙ্গে মেলারও আয়োজন করা হয়। মেলা চলে দু'তিন দিন ধরে। পাকিস্তান সরকার হংকিং আর্থিক লাভের স্বার্থে পুজাহ, অল্পটানের পৃষ্ঠপোষকতা করত। কিন্তু রাজাদের পরামর্শ বা মতামতের আমল না দেওয়ার নীতি অনুসরণ করে। উপরন্তু রাজাদের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করা শুরু করে। এই ব্যাপারে বৃটিশদের ডিভাইড এণ্ড রুল নীতি পাকিস্তান সরকার প্রয়োগ করে। এক রাজাকে অন্য রাজার বিরুদ্ধে, এক সম্প্রদায়কে আরেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উন্মিয়ে দিতে শুরু করে। এক রাজার আর এক রাজার প্রতি সন্দেহ এবং সংগঠিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবে পাকিস্তান সরকারের কারসাজি কথতে ঐক্যবদ্ধ কোন প্রচেষ্টা দানা বেঁধে ওঠেনি।

পাকিস্তানের প্রথম শাসনভঙ্গ রচিত হয় ছাপ্পান সালে। এই শাসনভঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ জেলার মধ্যস্থ অক্ষুন্ন রাখা হয়। সারা পাকিস্তানে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হচ্ছিল। কেন্দ্রে এবং প্রদেশে পর পর কয়েকটি সরকার গঠন ও পতন নিয়ে আসে অস্থির অবস্থা, ধোঁয়াটে ভবিষ্যত। সারাদেশে ক্রমবর্ধমান ছিল রাজনৈতিক উত্তেজনা আর অবিশ্বাস। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ দেশের দুর্বলতম শ্রেণীভুক্ত। তাই দেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক আবহাওয়া তাদের জন্য ছিল আরও সংকটের ইঙ্গিত। আটারর তথাকথিত রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটলে কমতায় এলেন মেজর জেনারেল ইস্‌কান্দার মির্জা। পরে তাঁকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের গদ্বিতে বসলেন। ছাপ্পান সালের শাসনভঙ্গ ব্যতীল হয়। নিষিদ্ধ হয় সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। রাজনৈতিক দলগুলো হয় বেআইনি। সারাদেশে বয়ে যায় রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তারের বজ্র। হাজার হাজার ছাত্র যুবক গ্রেপ্তার হয়। কেড়ে নেওয়া হয় জনগনের মৌলিক অধিকার। অশুভ ঘটনার মিছিল ছায়া কেলে পাকিস্তানের আকাশে।

পাকিস্তানের অন্ততম জাতীয় নীতি ছিল শিল্প বিপ্লব সুরাধিত করা। শিল্প বিপ্লবে শক্তি বোগাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ দেয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আইয়ুব খান কমতায় আসার পর সেই কাজে জোর দেওয়া হয়। কান্ডাই বাঁধ নির্মাণ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে, এটা ছিল

পূর্ব পরিকল্পিত। এটাও জানা ছিল, কাপ্তাই বাধ নির্মিত হলে রাজ্যমাটি মহকুমার বিস্তীর্ণ আবাদী সমতল জমি জলময় হবে। তা সত্ত্বেও পুনর্বাসন ব্যবস্থা বথাসময়ে শুরু করা হয়নি। যেমন উপজাতি জনগনকে বুঝানো হয়নি, কাপ্তাই জল বিহীন প্রকল্প দেশের অর্থনীতিতে কী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মূল পেশা কৃষি। কৃষকেরা ছুই শ্রেণীর। জুম চাষী ও সমতল ভূমির চাষী। বাট সালে কাপ্তাই জলবিহীন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। জলময় হয় শত শত একর আবাদী জমি। জুম চাষীরা জুম চাষ করলেও তাদের বসত বাড়ি ছিল সমতল ভূমিতে। ফলে হাজার হাজার লোক চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়। সরকার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু পূর্ণবাসনের স্মৃষ্টি কোন ব্যবস্থা নেয়নি। শুধু সমতল ভূমির চাষীদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার তালিকার রাখা হয়েছিল। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাম মাত্র। 'ফার ইষ্টার্ট ইকনমিক রিভিউ'-এর এক প্রতিবেদনেও এই সত্যতার প্রমাণ মিলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকার ক্ষতিপূরণের মাত্রা ধার্য করেছিল ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হয় মাত্র ২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুম চাষীরাও ছিল সমপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তাদেরকে তালিকা বহির্ভূত রাখা হয়েছিল। ক্ষতিপূরণের প্রকল্প নিয়ে দেখা হল :...

এক, প্রকল্প এলাকা.....২৫৩ বর্গমাইল

দুই, প্রকল্প সমাপ্তি.....১৯৬০ সাল

তিন, পরিবার.....১৭, ৩৮৬ টি

চার, জনসংখ্যা.....৯২, ৯৭৭ জন

পাঁচ ক) ক্ষতিপূরণ প্রকল্প শুরু করার সাল—১৯৫৬

খ) শেষ করার তারিখ—৩১ মে, ১৯৬৮

গ) রাজস্ব বিভাগ আবাদী জমির ক্ষতিপূরণ বেধে দিয়েছিল

নিম্নলিখিত হারে :...

এক, প্রথম শ্রেণীর জমি একর প্রতি-৬০০০ টাকা

দুই, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি একর প্রতি-৪০০০ টাকা

তিন, তৃতীয় শ্রেণীর জমি একর প্রতি-২০০০ টাকা

(৭) অর্থবহু

এক, মূল প্রকল্প—

ক্ষতিপূরণ বাবদ—	৩, ৪৪, ০০, ০০০'০০ টাকা
প্রাতিষ্ঠানিক খরচ বাবদ—	১১, ০০, ০০০'০০ টাকা
<hr/>	
	৩, ৬৫, ০০, ০০০'০০ টাকা
অতিরিক্ত প্রকল্প—	
ক্ষতিপূরণ বাবদ—	৬২, ৮৭, ০০০'০০ টাকা
প্রাতিষ্ঠানিক খরচ বাবদ—	৩, ০২, ০০০'০০ টাকা
<hr/>	
	৭২, ৮৯, ০০০'০০ টাকা
<hr/>	
সর্বমোট—	৪, ৩৭, ২৬, ০০০'০০ টাকা
(৬) খরচ.....	
ক্ষতিপূরণ বাবদ.....	৩, ২৭, ১৮, ০০০'০০ টাকা
প্রাতিষ্ঠানিক বাবদ.....	১৮, ১৫, ৬০০'০০ টাকা
<hr/>	
	৪, ৪৫, ৩৩, ৬০০'০০ টাকা
(৮) উদ্ভূত.....	
অর্থমঞ্জুর.....	৪, ৩৭, ২৬, ০০০'০০ টাকা
খরচ.....	৪, ১৫, ৩৩, ৬০০'০০ টাকা
<hr/>	
	২২, ১৮, ৩২৪'০০ টাকা*

ক্ষতিপূরণ প্রকল্প থেকে এটা স্পষ্ট যে, ক্ষতিপূরণের হার ছিল নিতান্তই কম। জনসাধারণের পুরো হিসাবাটাও এতে ধরা হয়নি। অধিকন্তু, অভাব ছিল বাস্তব পরিকল্পনার। ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়া টাকা উপজাতিরা যাতে উৎপাদক মূলক খাতে ব্যয় করতে পারে, তার কোন সুযোগ বা ব্যবস্থা সরকার করেনি। খুজল উপজাতি শ্রেণীর জমি ছিল। কিন্তু কাঁচা টাকার সঞ্চয় ছিল না। সঞ্চয় করার অভ্যাসও নেই উপজাতিদের। শস্ত, ধান এবং ফল বিক্রি করে সংসারের প্রয়োজনীয় খরচ তারা মেটাতে। কাজেই ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়া টাকা প্রকৃত ক্ষতির চাইতে অনেক কম হলেও উপজাতিদের ক্ষেত্রে তা হঠাৎ অনেক টাকা পাওয়ার

* জনসংহতি সমিতি, এ্যান একাউন্ট অফ চিটাগাং হিল ট্রাস্টিস, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১১ই জুলাই, ১৯৮০, পৃ. ৬-৭।

মত হয়। অল্পপাঙ্গক মূলক কাজে ও ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে তাদের টাকা হ্রাসভে সময় লাগে নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু টাউন্ট, কড়িয়া শ্রেণীর লোক। তারা ইঞ্জিওয়েল, সঙ্কর প্রকল্প, ব্যবসা, হঠাৎ বেশি টাকা পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে সরল উপজাতিদের টাকা লুটে নেয়। গোম্বের উপর বিষ ফোড়ার মত ছিল ক্ষতিপূরণ প্রকল্পে জড়িত অফিসারদের দুর্নীতি। তারা কলমের খোঁচায় তৃতীয় শ্রেণীর জমিকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করতে পারত। এবং উন্নীতভাবে প্রথম শ্রেণীর জমিকে তৃতীয় শ্রেণীতে এবং খাস অনাবাদী জমি প্রথম শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত করে যে কাউকে তারা পাইয়ে দিত মোটা ক্ষতিপূরণ। বলা বাহুল্য এই সব খাস জমির পরিমাণ বেশি করে দেখানোর ক্ষমতা এদের গোপন কলমে ছিল। করিয়ে নেয়ার দাঁওয়াই ছিল এদের খুশী করা, ঘুষ দেয়া। কাসালাং, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা উপত্যকা ভূমিতে পূর্ণবাসন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জমির বিনিময়ে জমি নেয়ারও একটি প্রকল্প ছিল। এখানেও ছিল অফিসারদের কারচুপি। একই জমি কয়েকজনকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর, শেষ পর্যন্ত, যে অফিসারদের সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে পেরেছে, জমি সেই-ই পেয়েছে। পাহাড়ি জনসাধারণের মধ্যে ধারা ধূর্ত তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। প্রকৃত পাওনার চাইতে বেশি টাকা ও বেশি জমি তারা পায়। সৌভাগ্যক্রমে ধূর্তলোকের সংখ্যা যে কোন সমাজে খুব কম। স্বাভাবিক কারণে, দুর্দশাগ্রস্ত হয় সং সংখ্যা গরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় উপজাতি ও অল্পজাতির মধ্যে বৈষম্য টানা হয়েছিল বলে বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লেখ দেখা যায়।^১ তত্পরি বাধ নির্মাণের কালে কয়েক শ একর আবাদী জমি জলময় হলে এই এলাকার উপজাতিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন কতখানি বিপর্যস্ত হবে, তার প্রতিক্রিয়াই বা কি হবে, এই সম্পর্কে কোন প্রকার জরীপও চালানো হয়নি বাধ নির্মাণ শুরু করার আগে।

১। ডেভিড শোফার, পপুলেসন ডিজলোকেশন ইন দি চিটাগাং হিলস, দি জিওগ্রাফিকাল রিভিউ, ভলুম এল III, ১৯৬০, পৃ: ৩৩৭-৩৬২, বিমল কে. পাল, দি কান্সাই হাইড্রো ইলেকট্রিক ড্যাম: ইটস ইম্প্যাক্ট অন দি ট্রাইবেল পিপল অফ দি চিটাগাং হিল, মানিটোবা বিশ্ব বিদ্যালয়, কানাডা, ১৯৮০।

কিন্তু যা করা উচিত ছিল আসে, তা করা হয়েছিল ঘটনার পর। বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার তিন বছর পর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কি উপায়ে সম্ভব, তার সমীক্ষা তৈরী করতে ৬ বাঁধ নির্মাণের কলাকল উপজাতি সমাজ জীবনে কতখানি পড়েছে, তা খুঁজে বের করার জন্য পাবিত্তান সরকার কানাদার 'ফরেস্টাল ইনকরপোরেশন'কে দায়িত্ব দেয়। ব্যাপারটা হয়েছিল ষোড়শ আশে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মত। তাসদেও ফরেস্টাল ইনকরপোরেশনের 'রিপোর্ট' প্রাধান্যযোগ্য। 'রিপোর্ট'র এক জায়গায় বলা হয়েছে,

'The tribal people had attained a reasonably satisfactory way of life adequately adjusted to the limitation imposed by the physical environment before the dam was built. After the dislocation a disastrous cycle of over cultivation had led to depletion of soil fertility, loss of forest corp. serious erosion and further pressure on the remaining land'.

একই পাহাড়ে ঘন ঘন জুঁ চাষ করার ফলে জুমের উৎপাদনী শক্তি হয়ে পড়েছিল নিম্নমুখী। (সাধারণত এক পাহাড় জুঁ চাষ করলে, পরের বছর কিংবা তার পরের বছরও সেই পাহাড় আবার চাষের উপযোগী হয়না)। তদুপরি সমতল ভূমির চাষীরাও পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয়। গাড়া উপজাতিদের অর্থনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করে। বাঁচার উপায় কি, তার কোন তাত্ক্ষনিক উত্তর কারও জানা ছিল না। ক্ষতিপূরণের হিসেবে পাওয়া টাকা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সংকটের মোকাবিলায় হতাশ হয়ে এই সময় উপজাতি জনগণের একটা অংশ ভাগ্যের সন্ধানে অন্ত দেশে আশ্রয় নেয়।

উপজাতিদের ঘাঘবর চরিত্র বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। দেখা গেছে. সংকটের মুখোমুখি হলেই তারা স্থান বদল করেছে। বদল করেছে দেশ। বর্গভুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পূর্ণপাবিত্তানের অর্থনীতিতে আনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিছু কল কারখানা গড়ে ওঠে। কুটির শিল্প অনেকটা তেজি হয়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে নিজেদের সঁপে দেয়া উপজাতি জনগণের বিরাট অংশ তখন সুস্থার দিন গুনছে। চেষ্টা করছে অন্তত আরও একটা দিন বাঁচার। নিজেরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে দেশকে তারা কতদূর এগিয়ে ছিল, তা ভাববার অবকাশ তখন তাদের কোথায়? বা ভাবা স্বাভাবিক, তাই ভাবল উপজাতি জনগণের এই অংশ। সরকার তাদের ধ্বংস করার জন্য কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করেছে, এই ধারণা থেকে তারা কখনও মুক্তি পাইনি। ক্রমাগত করতে পারেনি পাবিত্তান সরকারকে।

১৯৭২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যাপক আর. আই. চৌধুরীর নেতৃত্বে উপজাতিদের সমস্যা সম্পর্কে জানতে একটি জনমত বাচাই কমিটি জরীপ কার্যে চালান পার্বত্য চট্টগ্রামে। কমিটির রিপোর্ট দেখা যায় যে, ৬০ শতাংশ চাকমাদের ধারণা কাপ্তাই বাঁধ তাদের স্বাভাবিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ৮০ শতাংশ বলেছে তারা স্থানচ্যুত হয়েছে কলময় হবার কারণে। ৮৭ শতাংশ বলেছে নতুন বসতি বাটি তৈরি করতে তারা ভীষণ সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। ৬০ শতাংশ অভিযোগ করেছে যথাগন্তব্য ক্ষতিপূরণ প্রদান না করার ও সরকারি কর্মচারীদের কারচুপির। ৭৮ শতাংশের অভিযোগ, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে তাদের জন্ত কোন চাকরীর সুযোগ ছিল না। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের আগে তারা অর্থনৈতিকভাবে ভাল ছিল, এই সমস্যা ২০ শতাংশের।^১ যে সমস্যা ও অবস্থান তখন জন্ম নিয়েছিল তা দিনে দিনে বেড়েছে। তা দূর করতে সরকার কোন প্রকার গঠনমূলক পদক্ষেপ নেয়নি। কলে জন্ম নিয়েছিল আরও জটিল সমস্যা। অধ্যাপক এম. কিউ. জামান এমন একটি সমস্যা বিশ্লেষণ করতে চেয়ে বলেছেন,

‘Considering the tremendous disruption of tribal life resulting from the Kaptai Dam and great influx of plains Bengalee people into Chittagong Hill Tracts as settlers to work on the new projects and establish new business and industry, it is not surprising that the tribal people began to put up some resistance. The Govt. response to these resistance was increasingly repressive, instead of regarding the action of the tribal as a natural reaction to the invasion of their territory, the tendency seemed most often to be to see the resistance as a Communist inspired guerilla activity spilling over the border from neighbouring Burma and India.....However, it must be pointed out that Govt. policy or perhaps lack of a restraining Govt. policy created conditions under which tribals would

১। চৌধুরী, আর. আই, ট্রাইবাল লাইভারশীপ এন্ড পলিটিক্যাল ইলিটিয়েন্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২।

be susceptible to leadership from any one who might seem to take the plight seriously'.^১

পাকিস্তানের জনগণ গণতন্ত্রের ঘোষা নয়, এই অভূতাব্য আইয়ুব খান উনবাট সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। মৌলিক গণতন্ত্র কার্যে হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে যে নিজস্ব ঢঙে সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামো ছিল, তা ভেঙ্গে পড়ে। আইয়ুবের নতুন পদ্ধতি দখল করে সেই স্থান। আইয়ুবের 'ওয়ান ম্যান সো ডেমক্রাসি' তথা বুনিয়াদি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় দেশের সচেতন জনসোচ্চ। চাপা উজ্জ্বলনা থাকলেও বুনিয়াদি গণতন্ত্র দেশে চালু হয়। পাকিস্তান আমোলনের অন্ততম স্তম্ভ ছিল গণতন্ত্র। অথচ গণতন্ত্রের মূল আদর্শ কবর দিতে বিন্দুমাত্র বিধা করেননি আইয়ুব খান। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের শত বৎসরের সামাজিক প্রথা ও প্রশাসনিক কাঠামো থাকল কি থাকল না, তা নিয়ে ভাববার সময় আইয়ুবের ছিল না। শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট তখন সারা দেশে।

বাষট্টিতে আইয়ুবের দরজীখানায় পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এই শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যদিও 'বহিষ্কৃত এলাকা' শব্দটি তুলে দিয়ে সেখানে বসান হয় 'উপজাতীয় এলাকা'। মূলধারা ও নিয়মবিধি অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তাবোধ ছিল ক্ষণস্থায়ী। ছেষট্টিতে শাসনতন্ত্রের কয়েকটি ধারা সংশোধন করা হয়। তন্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সংশোধনীও ছিল। শাসনতন্ত্রে পরিষ্কার উল্লেখ করা ছিল, পুরো কিংবা আংশিকভাবে কোন উপজাতি এলাকার বিশেষ ব্যবস্থা যদি বিলোপের প্রয়োজন হয়, তাহলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারে উক্ত এলাকার জনসাধারণের মতামত নেবেন।^২ কিন্তু পবিত্র শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত বিধি মানার কোন প্রচেষ্টাই প্রেসিডেন্টের মধ্যে দেখা যায় নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সঙ্গে কোন প্রকার মতামত বিনিময় না

১। এম, কিউ, জামান, ট্রাইবাল ইন্ডাস এ্যান্ড ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন: দ্বি চিটাগাং হিল ট্রাইবস কেস, এম, এস, কোরাইসী সম্পাদিত, ট্রাইবাল কালচারস ইন বাংলাদেশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পুস্তকের একটি প্রবন্ধ, পৃ: ৩১৪-৩১৫।

২। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, ১৯৬২।

করে উপজাতি এলাকা হিসেবে জেলার বিশেষ ব্যবস্থা তুলে দেবার বিল জাতীয় পরিষদে পাশ হয়ে যায়। উপজাতি জনগণ তাদের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবিত হয় আরেকবার। আবার পড়ে দেশ ত্যাগের হিড়িক। কয়েক হাজার উপজাতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বার্মা ও ভারতে আশ্রয় নেয়। উদ্ভাস্তদের কিরিয়ে নিতে বার্মা ও ভারত পাকিস্তানের কাছে অহরোধ রাখে। আন্তর্জাতিক চাপ এড়ানোর জন্য পাকিস্তান সরকার উনিশ শ সালের রেগুলেশন বলবৎ রাখে। কিন্তু বিশেষ জেলার মর্যাদা তুলে দেবার পর এই রেগুলেশন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

অত্যাধিক, পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যনীতি দুই প্রদেশ, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জন্ম দেয় মানসিক দূরত্বের। দুটি প্রদেশের ভৌগোলিক দূরত্বের চেয়ে বেশি ছিল সেই মানসিক দূরত্ব। পাকিস্তানের নয়া উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ যত তীব্রতর হয়, তত পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম ও জনপ্রিয়তম সংগঠন আওয়ামি লিগ এক ইউনিট কার্টামো ভেদে দিয়ে প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দেবার দাবি জানায়। স্বায়ত্বশাসনের কার্টামো কি ভিত্তিতে হবে, তার একটি ফর্মুলা দেয় আওয়ামি লিগ। যা ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি হিসেবে খ্যাতি পায়। ছয় দফা দাবির প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়। সারা প্রদেশ বিক্ষোভে কেটে পড়ে। উপ-মহাদেশ বিভক্তির প্রাক্কালে কংগ্রেস যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের টানার চেষ্টা করেনি, তেমনি আওয়ামি লিগ পার্বত্য চট্টগ্রামের শ্রমিক এলাকা চন্দ্রঘোনা ছাড়া কোথাও সংগঠনের কর্মতৎপরতা ছড়িয়ে দিতে মনযোগী হয়নি। ধর্মীয় লেবাস নিয়ে জন্ম হয়েছিল পাকিস্তানের। সেই ধর্মীয় রাজনীতির কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছিল আওয়ামি লিগ। প্রতিষ্ঠা করেছিল অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনীতি। ঘোষণা করেছিল প্রত্যেক ভাষাভাষি নিপীড়িত মানুষের জয়গান। অথচ দেশের একটা জেলার উপজাতিদের স্ত্রি ধরনের সংকট আওয়ামি লিগও সম্ভবত বুঝতে ব্যর্থ হয়। অত্যান্ত রাজনৈতিক দল-গুলোও উপজাতিদের জাতীয় মূল আন্দোলনে টানার প্রচেষ্টা নেয়নি। তাই সারা প্রদেশ আন্দোলনে আন্দোলনে টপকা করলেও চট্টগ্রাম থেকে রাজ্য পরভাগিন্স মাইল দূরে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামে সফলিত হয়নি আন্দোলনের উত্তাপ।

কাত্তাই বাঘ নির্ধানের কলে পঞ্চাশ হাজার একর আবাদী অগ্নি জলবদ্ধ

হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অর্থনীতিতে এটা ছিল বিরাট আঘাত। জমি হারানোর পর দেখা দেয় নতুনভাবে বাঁচার তাগিদ। উপজাতি জনগণের একটা অংশকে খুঁজতে হয় জীবীকার নতুন অবলম্বন। অরণ্যবৃত্ত পাছাড়ে গড়ে উঠে জনপদ। জনপদগুলো ঘিরে গড়ে উঠে কলের বাগান। অল্পদিকে, স্থলে কলেজে ছেলে পাঠানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পায় কয়েক গুণ। শিক্ষার প্রসার বাড়ে। বাড়ে চেতনা। উন্মেষ ঘটে নতুন ভাবনার। কাপ্তাই বাঁধের ফলে একটি অঞ্চলের উপজাতিদের ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়। এক এটাও সমান সত্য; কাপ্তাই বাঁধ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মালম্বী চাকম সন্তানদের জীবনে এনেছে আমূল পরিবর্তন। বস্তুত, খুঁচনা করেছিল নবযুগের। ষাট থেকে সত্তর, এই এক দশক পার্বত্য চট্টগ্রামে রেনেসার হাওয়া বইয়ে দিচ্ছেছিল। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পার্বত্য চট্টগ্রামের রেনেসার হাওয়াকে করে আরও সজীব ও সতেজ। উনসত্তরে আইয়ুব খান পালন করেন উন্নয়নের দশক বা ক্ষমতার থাকার দশবছর পূর্তি উৎসব। আইয়ুবের উন্নয়ন দশককে ছাত্র সমাজ অভিহিত করেন অবক্ষয়ের দশক হিসেবে। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন সুসংহত ও সমন্বয় সাধনের উদ্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যবী ছাত্র সমাজ একটি কর্মসূচী বা এগার দফা দাবি প্রণয়ন করেন।

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানেই প্রথম দানা বেঁধে উঠেছিল। উনসত্তরে এই আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়ে। গণতন্ত্র ও প্রদেশ-সমূহের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সারা পাকিস্তানে এক অভিন্ন সুর বেজে উঠে। প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের স্রোত পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রবেশ করে। উপজাতি ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগার দফা আন্দোলনের শরিক হয়। এই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেয়। সুযোগ এসেছিল এতদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা উপজাতিদের জাতীয় মূলস্রোতের সঙ্গে মেলানোর। সুযোগ পরেও এসেছিল। কিন্তু জাতীয় নেতারা সম্ভবতঃ উপজাতি সমস্যা সঠিক ভাবে বুঝতে পারেন নি। তাই পারেন নি উপজাতিদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করে তাদের জাতীয় জীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে মেলাতে।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের তোড়ে আইয়ুব গদি ছাড়তে বাধ্য হলে জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইয়াহিয়া সত্তরে সাধারণ নির্বাচন ঘোষনা করেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সারা দেশ মেতে উঠে। নির্বাচন শেষে দ্বুর্ভে আদৌ হবে কিনা, এ আশংকা থাকলেও শেষ অবধি নির্বাচন হয়।

যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লিগ দুটি ছাড়া জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সব আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলদিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপলস পার্টি অধিকাংশ আসন দখল করে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের আসন নির্ধারিত করা হয়েছিল। তাই জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা ছিল বেশী। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে খতাবভই আওয়ামী লিগের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার কথা। পাকিস্তানে তখন তিন শক্তি। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লিগ। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি। আর পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী।^১ নির্বাচনের কলাকল ঘাই হোক, সামরিক বাহিনী সহজে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না, এটা জানা ছিল। আওয়ামী লিগকে সরকার গঠনে আহ্বান জানাতে ইয়াহিয়া চাইতে বেশি আপত্তি ছিল ভুট্টোর। ভুট্টোব ইচ্ছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় ইয়াহিয়া প্রথম টালবাহানা, পরে বৈকি বসেন। জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হল না। জনগণের ব্যালটের রায়কে বুস্টেটে প্রতিহত করতে ইয়াহিয়া রাস্তায় নামায় সেনাবাহিনী। জনগণ ক্ষমতা নয়, উহারা পায় গৃহযুদ্ধ। বন্ধুকের নলে পাকিস্তানের অধঃতাপ কণ্ঠে গিয়ে পাকিস্তান ভাঙার পথ পরিষ্কার করে ইয়াহিয়া। বি-জাতি তত্ত্বের আনুষ্ঠানিক বৃত্তা ঘটে পশ্চিম মার্চ, উনিশ শ একাত্তর সাল।

একাত্তরের তেলরা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল। ষোলরা মার্চ ইয়াহিয়া সেই অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত বলে ঘোষণা করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ইয়াহিয়া আলোচনাসভা আহ্বান করেন। তারিখও ঠিক করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানো হয় আওয়ামী লিগ, পিপলস পার্টি ও অন্তান্ত দলনেতাদের। বাংলার তখন পলহবোপ আমোলন। একদিকে বৈঠক, অত্রদিকে চলছিল লড়াইয়ের প্রস্তুতি। আওয়ামী লিগের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে সংগ্রাম কমিটি। অন্তদিকে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সারা দেশে ‘জয় বাংলা বাহিনী’ গঠনের প্রস্তুতি চলছিল। পার্বত্য-চট্টগ্রামও এই প্রস্তুতির বাইরে ছিল না।

দেশের অন্তান্ত অংশে আওয়ামী লিগের, বিশেষ করে এম, এন, এ, একু

১। জুলদিকার আলি ভুট্টো, ইক আই এ্যাম এ্যাসোসিয়েটেড, বিকাশ
পার্বত্যচট্টগ্রাম, বঙ্গ, ১৯৭৯, পৃঃ ১১৬।

এম, পি, এ.-দের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লিগ সংগঠন ছিল দুর্বল। কিন্তু সেই দুর্বলতা পূরণ করেছিল জেলার সরকারি প্রশাসন। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লিগের নির্দেশে জেলা প্রশাসন উজ্জ্বলীকৃত কৃষিকা নিয়েছিল। অনেক উপজাতি ছাত্র-যুবক অন্তর্ভুক্ত করে প্রাথমিক কোর্সে যোগ দেয়। দেশের অন্যান্য জেলার মত পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রাথমিক ট্রেনিং স্কুল ছয় কার্টের রাইকেল দিয়ে। সার্ভের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর কয়েকটি সত্যিকারের রাইকেল যোগাড় করা হয় প্রশিক্ষণের জন্য। কিন্তু উপজাতি ছাত্রদের অভিযোগ একমাত্র কার্টের রাইকেলই ছিল তাদের ভরসা। যে কোন কারণেই হোক তাদের হাতে সত্যিকারের রাইকেল তুলে দেওয়া হয়নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন জাতীয় রাজনৈতিক দল কিংবা দলেব ছাত্র সংগঠন অথবা কৃষক শ্রমিক ফ্রন্টের (চন্দ্রাবানী শ্রমিক এলাকা ছাড়া) ভিত্তি বলতে কিছু ছিল না। সংগঠন ছিল নামে মাত্র। এই সব সংগঠন শুভ্রাভাতে উপজাতি সম্ভ্রম ছিল না বলে চলত। পার্টি ভিত্তিতে যদি এই প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়, উপজাতিদের চোখে ব্যাপারটা দাঁড়ায় সেই একই, সচেতনভাবে তাদের দূরে সরিয়ে রাখার এটা একটা কৌশল মাত্র। অথচ আসন্ন লড়াইটা ছিল গোটা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর। উপজাতি যুবকদের অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে জাতীয় সংকট মুহূর্তে জেদাভেদ রেখা কেমন টানা হয়েছিল, তার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল অস্থির। কলে, এই জেলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ক্ষয় তুলনামূলকভাবে অস্বস্তি ছিল। উপজাতিরা সরল এবং ভীষণ স্পর্ধাকাতর। একেবারেই তাদের অন্ততম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাদের অভিযোগ, প্রশিক্ষণে বৈষম্যনীতি তাদের ভীষণ আহত করে। যুক্তি যুক্তি যে আগ্রহ তাদের ছিল, তা প্রতিফল পরিদৃষ্টি ও পরিবেশে উবে যায় এবং নিরপেক্ষ থাকে। তারা প্রের মনে করে।

সমস্তের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লিগ প্রার্থীরা যে দুটি জাতীয় পরিষদ আসনে জিততে পারেননি, তার একটি হল ময়মনসিংহ, অন্যটি পার্বত্য চট্টগ্রাম। ময়মনসিংহ জেলার একটি আসনে মুসলিম লিগ প্রার্থী নরুল আমিন বিজয়ী হন। পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতীয় পরিষদের একমাত্র আসনে নির্মল প্রার্থী হিসেবে চাকমা শার্কেলের রাজা জিদিয় রায় নির্বাচিত হন। দুটি আসনে পরাজয় আওয়ামী লিগের এককেন্দ্রীয় নেতা সহস্রভাবে নিতে পেরেছেন বলে স্বীকৃতি হয় না।

ভার্য্য রাজা ত্রিদিব রায় ও নরুপ আহিরের বিজয় একই চোখে দেখেন। রাজা ত্রিদিব রায় বরাবর নির্বাচনে লড়েছেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে। তিনি কখনও কোন পার্টির টিকিটে নির্বাচনে লড়েন নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য দুই রাজার তুলনায় রাজা ত্রিদিব রায়ের আলাদা একটা ভাবমূর্ত্তি ছিল। অনেককয়ে দেখা গেছে, অন্য দুই রাজা, রাজা ত্রিদিব রায়কে তাঁদের হয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলার জন্য মনোনীত করেছেন। রাজা ত্রিদিব রায়ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ করে রাজাদের স্বার্থ সহজে দূর হতে দেন নি কখনও। পূর্বস্থরীঘের তুলনায় তিনি ছিলেন কিছুটা প্রগতিশীল। এক সময় উপজাতি রাজার অধিকারের প্রশ্নে পাবিষ্টান সরকারের সঙ্গে তিনি মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। মামলার রাজা ত্রিদিব রায় জয়ী হন। এই ঘটনার পর পাবিষ্টান সরকার তাঁকে ক্যান্টন উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। পরে তাঁকে মেজর উপাধিও দেওয়া হয়। এর পরিশ্রমিতে রাজা ত্রিদিব রায়ের ভাবমূর্ত্তি বেড়ে যায় আরও কয়েকগুণ। রাজাদের বহুগুণের ভৈরী একটা কাঠামো ছিল। নির্বাচনের সময় এই কাঠামো রাজারা কাজে লাগাতেন।

ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে তিন সার্কেলের তিন রাজাকে সময়ে সময়ে বেকায়দায় বেলা হত। পাবিষ্টানেও এই রেওয়াজ চালু থাকে। স্বাভাবিক কারণে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের সঙ্গে তিন রাজার কোন না কোন ব্যাপারে মন বসাকি ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাজাদের প্রভাব কমে। বাড়তে প্রশাসকের ক্ষমতা। কাজেই বাড়তে বন্দ। এই বন্দ চরমে পৌঁছে সত্তর-একাত্তর সালে। তৎকালীন জেলা প্রশাসকের সঙ্গে রাজা ত্রিদিব রায়ের মিল ছিল না। ছিল অনেকটা রেবারেবি। ব্যক্তিত্বের সংঘাত তাই আসন্ন মুক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের কোন কর্মকাণ্ডে রাজা ত্রিদিব রায়কে পাওয়া যায়নি। একেত সব তৎপরতা নেওয়া হয়েছিল জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে। উপরন্তু, আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে সারা দেশে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিল। আওয়ামি লিগ রাজা ত্রিদিব রায়কে মনোনয়ন দিতে চেয়েছিল। তিনি তা গ্রহণ করেন নি। আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে গড়া বিভিন্ন কমিটিতে জড়িয়ে পড়লে, তাঁর দল-নিরপেক্ষ ভাবমূর্ত্তি কতখানি বজায় থাকবে কিংবা আওয়ামি লিগ তাঁকে চোখে দেখবে, সে সম্পর্কে তাঁর আশঙ্কা ছিল। তাছাড়া কারণ নেতৃত্বে কাজ না করার মানসিকতা, যে কোন রাজার বত তাঁর সহোও ছিল। জেলা প্রশাসকের আচরণও তাঁকে নিমিষ্ট ও নিরুৎসাহ করে থাকতে পারে।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ত্রৈকানোর উদ্দেশ্যে রাজমাটির প্রবেশ পথ ঘাঘরা ও শিয়ালবুন্ডাতে ডিকেল নেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানী নৌ-সেনার চট্টগ্রামের উপর গোলা বর্ষণ করছিল। রাজমাটিতে তখন বন্যমবে অবস্থা। চট্টগ্রামের পতন হলে এবং ঘাঘরা ও শিয়ালবুন্ডাতে নেওয়া ডিকেল ভেঙে গেলে খেন নিরাপদ কোন স্থানে চলে যেতে পারেন, তার জন্য রাজা ত্রিদিব রায় জেলা প্রশাসককে একটি লীপ ও স্পীড বোট পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন। জেলা প্রশাসক তাঁর এই অনুরোধ রাখেন নি। বরং তাঁকে কোন ধরন না দিয়ে জেলা প্রশাসক নিজেই নাকি রাজমাটি ছেড়ে যান, এই অভিযোগ রাজ-পরিবারের।

এই সময় রাজা ত্রিদিব রায় আর একটি দুঃসংবাদ পান। তার কাকা কুমার কোকনাথক রায় ভারতের সীমান্ত পার হওয়ার সময় রামগড়ের ডবল-ছড়িতে মুক্তি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। কুমার কোকনাথক রায় আওয়ামি লিগের মনোনয়ন নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে লড়েছিলেন। কিন্তু জিততে পারেন নি। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য অন্তান্ত অনেকের মত তিনিও ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। গ্রেপ্তার করার পর মুক্তি বাহিনী তাঁকে ভারতের জেলে পাঠিয়ে দেয়। পরে অবশ্য তিনি মুক্তি পান। গ্রেপ্তার হওয়ার কারণ, তাঁর হাতে একটি সিভিল বন্দুক ছিল। রাজা ত্রিদিব রায় সন্দেহ করেন, তাঁর কাকার গ্রেপ্তারের পেছনে পার্বতা চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ও জেলা আওয়ামি লিগের কারসাজি রয়েছে। এরপর বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে তিনি যোগাযোগের আর কোন চেষ্টা করেন নি।

চট্টগ্রামের পতনের পর হানাদার বাহিনী রাজমাটির দিকে এগোয়। চট্টগ্রাম থেকে রাজমাটি অসেতে হয় আঁকাবাকা পাহাড়ি পথে। রাস্তার দুপাশে স্থানে স্থানে অজল। চোর-গোষ্ঠা আঘাত হানার উপযুক্ত পরিবেশ। হানাদার বাহিনী তাই ভীত ছিল। তারা রাজমাটিতে দূত পাঠায়। তারা নিশ্চিত হতে চায় যে রাজমাটির পথে কোন হুমুসকারী নেই এবং শহর পাকিস্তান সমর্থকদের দখলে। রাজমাটির কোন সম্মানিত ব্যক্তি যদি এই নিশ্চয়তার ধরন নিয়ে তাদের কাছে না যায়, তাহলে তারা বোমা মেরে রাজমাটি শহর নিশ্চিৎ করে দেবে। রাজমাটির মুসলিম লিগের পাণ্ডা তোকাবুল হোসেন এক ঘটনাক্রমে রাজমাটির দারিদ্রে খাকা ডেপুটি মেজিস্ট্রেট জনাব মোনায়েম উদ্দীন শহরের বেশ কয়েকজনকে নিয়ে রাজা ত্রিদিব রায়ের সঙ্গে দেখা করেন।

ভীকে অহরোধ করেন, তিনি যেন কিছু একটা করেন। রাজা জিহিব রায় আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে হানাহার বাহিনী আনতে রাজ্যান্তর দূরপ্রান্তে বান। সেই থেকে রাজা জিহিব রায় হানাহার বাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

জাতীয় নেতারা রাজা জিহিব রায়কে ধর্ষণ ও সম্মান দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে নিতে পারতেন। পারেননি অত্যাচার ছিল দুর্দর্শিতার। বিচক্ষণতার। রাজা জিহিব রায়ও পারেন নি বাংলাদেশের অনিবার্য অত্যাচারের কথা ভাবতে। পারেন নি উপজাতি জনগণের স্বাধীনতার আত্মবর্ধনাবোধের উদ্দেশ্যে স্থান দিতে। তিনি যদি তা পারতেন, তাহলে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে একটি সোনালী অধ্যায় সংযোজিত হত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাদেশিক পরিষদের ছুটি আসন ছিল। সত্তরের নির্বাচনে ছুটি আসনেই নির্দল প্রার্থী জয় লাভ করেন। একটিতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, অপরটিতে অংশু চৌধুরী।

ষাট সালে আইয়ুব বিরোধী একটি লিকলেটের খসড়া তৈরী করার অভিযোগে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা গ্রেপ্তার হন। তখন তিনি ছাত্র। তখনও রাজনীতিতে তাঁর অভিষেক হয়নি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিনি পূর্নঃমাত্রায় রাজনীতিতে নেমে পড়েন। তিনিই প্রথম উপজাতি ছাত্র, যিনি রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এতে তাঁর ভাবমূর্তি তৈরি হতে শুরু করে। সাধারণ উপজাতিদের বন্ধু ও প্রতিনিধি হিসেবে তিনি পরিচিত হতে থাকেন। জেলের ভেতরে থেকে তিনি বি.এ. পাশ করেন। আইন পরীক্ষারও উত্তীর্ণ হন জেল থেকে। উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের তোড়ে সব রাজবন্দীই মুক্তি পেয়েছিলেন। মুক্তিলাভ করেই লারমা পেয়ে যান তৈরী জরি। শিক্ষকতা করেন কয়েকদিন। উদ্বেগ হাতে পাওয়া জরি ভালভাবে চাব করা। ষাট দশকেই গঠিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি লারমার পাশে এসে দাঁড়ায়। এই সমিতি তখন লারমার রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম স্তম্ভ। তিনি এই সমিতিকে চাঞ্চা ও আরও সুসংগঠিত করেন। সত্তরের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে তিনি নির্দল প্রার্থী হন। (তাঁর নির্বাচনি প্রতীক ছিল পিলপুল। পরবর্তীতে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংগঠিত সমিতির সংগঠনের প্রতীক হিসেবে নেওয়া হয়েছিল)। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর এলাকার রাজা জিহিব রায়ের প্রভাব ছিল নিরঙ্কুশ। মানবেন্দ্র

নারায়ণ নারায়ণ রাজসভা বিরোধী। তা সত্ত্বেও নির্বাচনি কৌশল হিসেবে রাজা জিহিব রায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নারায়ণ তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে রাজা জিহিব রায়ের সঙ্গে প্রচারে নাগেন বিভিন্নরে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে নারায়ণকে সমর্থন করতে রাজা জিহিব রায় তাঁর লোকজনদের নির্দেশ দেন। এই নির্বাচনি আঁতাতের ফলে রাজা জিহিব রায় এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ, উভয়েই বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। একাত্তর সালে সারা দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও রক্তক্ষরা দিনগুলোতে মানবেন্দ্র নারায়ণ নারায়ণ উপজাতি জনগণের সামনে পরিষ্কার বক্তব্য রাখতে ব্যর্থ হন। আসন্ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উপজাতিদের ভূমিকা কি হওয়া বাহ্যিক, তার কোন সঠিক উত্তর তিনি দিতে পারেন নি। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলার সময়ে তিনি হানাদকার অধিকৃত এলাকায় ঘোরাফেরা করেছিলেন, কিন্তু হানাদকারদের সঙ্গে তিনি কোন সহযোগিতা করেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ বা অভিযোগ যেমন নেই, তেমনি মুক্তিযুদ্ধে তিনি সহায়তা করেছেন, তারও কোন প্রমাণ ছিল না।

অংশৈ প্র চৌধুরী ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। তাঁর এলাকায় রাজা জিহিব রায়ের প্রভাব ভেদন ছিল না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একা নির্বাচনে জেতা ছিল কষ্টকর। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ নির্বাচনি এলাকায় বোমার রাজা মং শৈ প্র চৌধুরীর প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষরূপে। অংশৈ প্র চৌধুরীর সঙ্গে বোমার রাজা মং শৈ প্র চৌধুরীর ছিল সাপে নেউলে সম্পর্ক। তাই তিনিও নির্বাচনি আঁতাত গড়েন রাজা জিহিব রায়ের সঙ্গে। নির্বাচনি প্রতীক, রাজা জিহিব রায়ের মত তিনিও নিয়েছিলেন হাতি।

অংশৈ প্র চৌধুরী নিজেও বোমার রাজ পরিবারের লোক। কিশোর কাল থেকে সমাজ কল্যাণমূলক নামা কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। জন-প্রিয়তার দিক থেকে তিনি বোমার রাজার বড় চ্যালেঞ্জ। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তিনি হতে পারতেন অত্যন্ত প্রযোজন। পাকিস্তানের অনিবার্য জড়ন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অবস্ফুর্তিকা সত্ত্বেও তিনি কলতার সোভ সংরক্ষণ করতে পারেন নি। একজন স্ত্রী হিসেবে তিনি যে গ বিজ্ঞ অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তান সরকারে।

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে রাজা জিহিব রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আবদুল্লাহ

মিসের প্রার্থী চাক বিকাশ চাকমা। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার আগে তিনি আশুহাসি মিসের সম্বন্ধ ছিলেন না। ব্যক্তি জীবনে তাসী, কিশোরী এক প্রমত্তশীল। রাজনীতিতে দীক্ষা তাঁর ছাত্রজীবনে। বামপন্থী রাজনীতিতে নিমজ্জিত। হৃদয় বন্ধু কিংবা সুসংগঠক তিনি নন। তবে ভবিষ্যত রাজনীতিতে ছবি আঁকতে পারেন ভাল। তিনি প্রথম উপজাতি নেতা, যিনি বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশ নামে একটি দেশের জন্য অনিবার্ণ। উপজাতি ছাত্র যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে তিনি বহুবার ব্রিটিশে ছিলেন। দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে উপজাতি সমস্যার সমাধান চান তিনি। উপজাতিদের কি করণীয়, তা তিনি বারবার বলেছেন, নিজেকে কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করেন নি। স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো নয়টা মাস অরণ্যাবৃত পার্বত্য অঞ্চলের এক কোণে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন।

বোম্বাং সার্কলের রাজা মং শৈ প্র চৌধুরী পরবর্ত্তে মুসলিম লিগের টিকিট নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদে সম্বন্ধ নির্বাচিত হয়েছিলেন। মন্ত্রীও হয়েছিলেন সেইবার। তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তিনি পাকিস্তানীদের অন্ততম বন্ধু হবেন। কিন্তু যতটা ভাবা গিয়েছিল, ততটা সক্রিয় তিনি হন নি।

রাজাদের মধ্যে একমাত্র মানিকছড়ির রাজা মং প্র চাই চৌধুরী মুক্তি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু দুই রাজার তুলনায় উপজাতি জনগণের উপর তাঁর প্রভাব তেমন ছিল না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি নেতাদের মধ্যে মং রাজা মং প্র চাই চৌধুরী ও চাক বিকাশ চাকমা ছাড়া অন্য কেউ ইতিহাসের গতি প্রকৃতির অনিবার্ণতা উপলব্ধি করতে পারেন নি। উপলব্ধি করতে পারলে তাঁরা সম্মিলিতভাবে অবদান রাখতে পারতেন নতুন একটি দেশ সৃষ্টিতে। গড়তে পারতেন উপজাতিদের জন্য সুস্থ, সুন্দর ও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যত।

সাতচল্লিশ আর একাত্তরের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। চল্লিশ বছরের ব্যবধানে নীর উপজাতি নেতাদের শিক্ষার, চেতনার, অভিজ্ঞতার আগা উচিত ছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। উনিশ শ সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তানে অভ্যুত্থানের বিরোধিতা আর একাত্তরের স্বতন্ত্র পাকিস্তানের হাত শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা কিংবা পাকিস্তানের যে অংশের সঙ্গে তাঁদের ভাষা অভিন্ন, সেই অংশকে নিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রের অনিবার্ণ অধ্যক্ষ বেবেও নির্দিষ্ট থাকার মধ্যে কারাক

যেই। প্রথমটা ভাগ্যান্ধারি রাজনীতির বাধ্যবাধকতা, দ্বিতীয়টা ইতিহাসের পাঠ পড়তে না পারার ব্যর্থতা।

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! উপজাতি নেতাদের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁদেরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আর সেই ঘটনার চব্বিশ বছর পর কয়েকজন শীর্ষ উপজাতি নেতার চেষ্টার পরও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধণ্ড অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। তার ফেতর থেকেই জন্ম নেয় একটি নতুন দেশ, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে, এক নদী রক্ত পেরিয়ে উনিশ শ একাত্তর সালের বোলই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন—সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল পাকিস্তানের শোড় মাটি নীতি ও বর্বরতার বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল জনসাধারণের পুনর্বাসন, আহত মুক্তি যোদ্ধাদের চিকিৎসা, পাটাকা দেওয়া হানাদার দালালদের খুঁজে বার করা, বুছাপরাধীদের বিচার, চড়িয়ে থাকা অস্ত্র উদ্ধার ও শাসক হল আগুয়ামি লিগের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা বিরোধী চক্র নিশ্চিহ্ন করা, বা স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে প্রকাশ পেয়েছিল।^১ সত্ত্ব স্বাধীন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র সমস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিদেশী শক্তির বড়ছত্র। স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শত্রুরা তাদের বশবদ্দের দ্বিধে দেশের সর্বত্র এবং সর্বক্ষেত্রে ন্যাসকতায়ুলক-তৎপরতা শুরু করে। জাতীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়নে গৃহীত সব কর্মসূচী প্রতি পদে পদে বাধা পাচ্ছিল। বেশ কিছু কর্মসূচী রূপায়িত হতে পারেনি। শত্রু ছিল আগুয়ামি লিগের ভেতর এবং বাইরে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি জেলা। জেলার অধিবাসীদের সমস্তার প্রতিটি ভিন্ন হলও বিচ্ছিন্ন নয় বাংলা-দেশের সার্বিক সমস্তা থেকে। বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতিদের সমস্তা ও সমাধানের রূপরেখা বিচার্য।

ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চল নিয়ন্ত্রণে আনার আগে এই এলাকার অধিবাসীরা বহিবিধ সম্পর্কে ছিল অন্ধকারে, যেমন অন্ধ ছিল বহিবিধ তাদের সম্পর্কে। ইংরেজরা এই এলাকায় জেলা সদর শহর প্রথমে চন্দ্রাবানী ও পরে রাজমাটিতে প্রতিষ্ঠা করে। নিয়ে আসে আধুনিক সভ্যতার উপকরণ ফুল, রক্তাঘাট, খানবাবাহন, টেলিকোন, হাসপাতাল এবং সংগঠিত প্রশাসন।

১। সূত্রজন হাসগুপ্ত, মিড নাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা, কলকাতা, এ. এল. খাতির, হু. কিলড মজিব, বিকাশ পাবলিশিং, দিল্লী, জ্যোতি সেনগুপ্ত, বাংলাদেশ ইম ব্লাড এ্যান্ড টিয়ারস, নয়া প্রকাশ, পরেশ নহা, মজিব ইত্যাদি তলস্ত, কলকাতা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের চেতনার প্রণায়ে বৃটিশদের অবদান অনস্বীকার্য। তা সত্ত্বেও, এটা সত্য, উপজাতিদের মনে বিচ্ছিন্নভাবে থাকার বা রাখার বীজ বুনেনি বৃটিশরাই। যেমন স্বাভাবিক রক্ষার নামে বৃটিশ শাসকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। বৃটিশ শাসনামলে এই জেলার অধিবাসীদের ভোটাধিকার ছিল না। বাংলার আইন পরিষদে গৃহীত কোন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসন সংক্রান্ত যে কোন নিয়মবিধি জারী ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হত বাংলার গভর্নরের অফিস থেকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে গভর্নরের আইন পরিষদের কাছে জবাবদিগি দিতে হত না। ফলে এই জেলার প্রশাসক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হতেন। জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে এই বিশেষ ক্ষমতা জমা দিয়েছিল একজনের প্রশাসন ব্যবস্থা, পরবর্তীতে যা পাকিস্তান আন্তরিকভাবে অহুসরণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে আলাদা নিয়মবিধির যে প্রয়োজন, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই নিয়ম বিধিগুলো বৃটিশ শাসকের খেয়ালখুশিতে আইন পরিষদে পাশ করা আইনে রূপান্তরিত হতে পারতনা। তেমনি, এই এলাকার জনগণের ভোটাধিকার দিলে এক আইন পরিষদে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হত কিভাবে, তা বোধগম্য নয়। এই প্রশ্নে উত্তর করা যেতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা প্রথমবারের মত ভোটাধিকার ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে লাভ করে। এই এলাকার পাহাড়ী জনগণের মনে বৃহৎ জনসম্মেলী বাঙালীদের সম্পর্কে ভীতি ও সন্দেহ, যা হয়ত এক সময় মূগু ছিল, জাপিয়ে দেওয়ার জন্য বৃটিশ শাসকেরাই সিংহভাগ দায়ী।

উপজাতিদের, বিশেষতঃ বৃহৎ চার সম্ভ্রমায়ের—চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও তঙচঙা—লেখার অক্ষর আছে। আছে লিখিত অনেক লোকগাঁথা ও লোক কাহিনী। সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে যেগুলো বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। স্বাধীনতার পর বাংলা একাডেমী এই লুপ্তপ্রায় লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেয়। কিছু বই বাংলা একাডেমী ছেপে বের করে। কিন্তু প্রত্যাশিত গতি ও গুরুত্ব নিয়ে পরবর্তীতে কাজ এগোয় নি।

নিজেষ্টের অবসরের জন্য উপজাতিরাও সমভাবে দায়ী। নিজেষ্টের বর্ণালার শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষা দেওয়ার মত কোন চৌল তারা প্রতিষ্ঠা করেনি। বর্ণালার রচনাও তারা চালু রাখেনি। বাংলা ভাষার উন্নতিতে উইলিয়াম কেরির

অমূল্য অবদান রয়েছে। তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টা না মিলে, বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন আরও বিলম্বিত হত। তেমনি আর এক ইংরেজ, রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মাস্টার এইচ. এম. মিলার চেষ্টা করেছিলেন উপজাতিদের বাংলা বর্ণমালায় উপজাতি ভাষায় শিক্ষা দিতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাথমিকভাবে চাকমা শাস্ত্রদ্বয়ের জন্য ‘চাকমা গ্রাইমার’ নামে বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষায় একটি শিষ্টপাঠ্য রচনা করে তা বিভিন্ন স্কুলে পড়ানোর জন্য চেষ্টা চালান। কামিনী মোহন দেওয়ান এই পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। তাঁর মূল্য ছিল, বাংলা ও ইংবাজী ভাষা শেখা থেকে উপজাতিরা বঞ্চিত হলে বৃহত্তর সন্ন্যাসী জীবনের প্রতিবন্ধিতা থেকে পিছিয়ে পড়বে। মিলারের চেষ্টা সফল হয়নি। কামিনী মোহন দেওয়ান সর্বজন প্রিয় ব্যক্তি।^১ প্রশংসনীয় তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টি। তিনি যদি মিলারের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ না করে সংশোধন করে দিতেন, তাহলে উপজাতিরা বাংলা ও ইংরেজীর সঙ্গে মিলেমিশে বর্ণমালা ও ভাষায় লেখা পড়া করার সুযোগ সরকারী বিদ্যালয়েই পেত। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুলে উপজাতিদের জন্য চালু হয়ে যেত বাধ্যতামূলক উপজাতি ভাষা ও সাহিত্য কোর্স। উন্নতি হত উপজাতি সাহিত্যের।

পাকিস্তান ইসলামি করণের নামে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা ভাষায় কঠোর করে চেয়েছিল। চেয়েছিল লিঙ্গরাজ্যের হিঁসাবে উর্দুর প্রাধান্য রেখে, উর্দু বাংলার মিশ্রণে একটা ভাষা চালু করতে। সে ক্ষেত্রে পাকিস্তান উপজাতি ভাষা ও সাহিত্য বিকাশ সাধনে আগ্রহী হবে, ভাষাও ছিল অব্যাহত। বর্ণবিদ্বেষ ও জাতিগত নিপীড়নের বিরোধিতা করা ছিল পাকিস্তানের অঙ্গতম মূল আদর্শ। অথচ দেশের পূর্বাংশ স্বাধীন না হওয়া অবধি ছিল বঞ্চিত, শোষিত। জনগণ ছিল নিপীড়িত। কাজেই এটা স্বাভাবিক ছিল যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কার্যাব্যয়ের আয়তন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের বর্ষাও পাবে না। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কার্যাব্যয়ের পরিবর্তন হলে বা পাকিস্তানের ভেতর থেকেই আর একটি রাষ্ট্রের জন্ম হলেও রাষ্ট্রটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন না হলে উপজাতিদের জন্যে যে জুড়ে বালি ছাড়া আর কিছুই জুটেবে না, তা প্রমাণিত হয় আরও পরে।

১। কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দীন লোকের জীবন কাহিনী, পৃঃ ২০৪-০৫।

জনগণের মানসিকতা ও প্রকৃতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের বিচার করলে ভুল হবে। সম্ভবতঃ অন্তান্ত অঞ্চলের রিক্রুটের আগের কঠিন পরীক্ষা এই জেলায় প্রয়োগ করাকে উপজাতিরা ব্যাখ্যা করেছিল যুক্তিবোদ্ধা না করার স্বভাব হিলেবে। দীর্ঘদিনের নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা ও জাতিগত বৈষম্যনীতির কারণে গড়ে ওঠা মানসিকতা এর জন্ত হায়ী। তাদের আপন করার প্রক্রিয়াও হওয়া উচিত ছিল আলাদা। যেমনভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধে নাং, থো এবং মান্ জনগোষ্ঠীকে জড়ানো হয়েছিল। চীন-ভিয়েতনাম সীমান্ত সলর পার্বত্য এলাকা ছিল নাং, থো এবং মান্ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। এই তিনটি সম্প্রদায় জাতিগত ভাবে ভিয়েতনামী ছিল না। ভৌগোলিক কারণে তারা সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসনও ভোগ করত। সম্প্রদায় তিনটি ভিয়েতনামীদের বরাবর সন্ধেহ ও স্থগার চোখে দেখত। ভিয়েতনামী ভাষা তারা জানত না। জানলেও বলত না। অথচ নাং, থো এবং মান্ অধ্যুষিত পার্বত্য অরণ্যাকুল গেরিলা যুদ্ধের জন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে গিরাপ ও তাঁর সাথীরা নাং, থো এবং মান্ ভাষা শিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। সমরধারার ভিত্তিতে মিললেন তাদের সঙ্গে। সব অসুবিধা একদিনে দূর হয়নি। অনবরত আন্তরিক চেষ্টার পর দেখা গেল স্থগা ও বিদ্রোহের স্বান স্বল করে নিয়েছে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস ও ভালবাসা। ভিয়েতনামীদের প্রথম পর্যায়ের দিনগুলোতে নাং, থো এবং মান্ সম্প্রদায়কৃত জনগোষ্ঠীর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।^১

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় নেতাদের এই ধরনের অসুবিধা ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামের তেরটি সম্প্রদায়ের অধিকাংশই বাংলা বোঝে। বাংলার কথা বলতেও পারে। তেরটি সম্প্রদায়ের ভাষা ভিন্ন। বাংলা ভাষা ছাড়া সব সম্প্রদায় বোঝে এবং বলতে পারে, এমন একটি সাধারণ ভাষা পার্বত্য চট্টগ্রামে নেই। অধিকাংশ উপজাতি, প্রথমদিকে অসহযোগিতা মূলক মনোভাব ছিল না। ছিল না বুদ্ধি যুদ্ধে কাজে লাগানোর স্বত একান্ত্রবোধের অভাব। ২০শে মার্চের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাষ্ট্রাধিগণ ও অন্তান্ত শহরের ডিকেল লাইনে খাঙদ্রব্য ও অন্তান্ত সামগ্রী সংগ্রহ করে পাঠানোর কালে উপজাতি ছাত্র—যুবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্যে তা প্রমাণিত।

- ১। রাসেল স্টেলার, জুমিকা, বি মিলিটারি আর্ট অফ পিপলস ওয়ার, জেনারেল ভো নগরেন গিল্লাপের নির্বাচিত প্রবন্ধ, মাস্কলী রিভিউ প্রেস, ১৯৭০, নিউইয়র্ক ও লন্ডন।

ত। সত্ত্বেও তাদের সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়ানো যায় নি। কাক্স উপজাতিদের মানসিকতা বোঝার চেষ্টা করা হয় নি। নেওয়া হয়নি বাস্তবোচিত পরীক্ষণ। তাই ভৌগোলিক অসুস্থ অবস্থান সত্ত্বেও স্বাধীনতা যুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বাণ্ডি অরণ্যাকুলের যে ভূমিকা হতে পারত, তা হয়নি।

রাজা জিম্বি রায় এবং অংশৈ প্র চৌধুরী দখলদার বাহিনীর দুই সক্রিয় সহযোগী ছিলেন। রাজা জিম্বি রায় যুক্তি যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানে চলে যান। অংশৈ প্র চৌধুরী জেলে বন্দী হন স্বাধীনতার পর। এই দুই জনের সব ঘোষ নিরীহ উপজাতিদের কাঁধে চাপে। যারা সাতেও ছিল না, পাঁচেও না, কেন যুদ্ধ, কার সঙ্গে কার যুদ্ধ যারা জানে না, তারাই হল স্বাধীন বাংলা-দেশের দালালি আইনের শিকার।

একাত্তরের পাঁচই ডিসেম্বর উপজাতিদের জীবনে একটি কালো দিন। এই দিন নিরীহ উপজাতির রক্তে পানছড়ি এলাকা হয়েছিল রক্তাক্ত। সেই রক্ত এখনও শুকোয়নি। বহু হয়নি রক্তক্ষরণ। ঐ দিন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পানছড়ি এলাকা ছেড়ে দিলে অন্ততম প্রধান একটি জাতীয় দলের জেলা শাখার অন্ততম প্রধান কর্মকর্তার নেতৃত্বে যুক্তি বোদ্ধা নামধারী একদল মুবক পানছড়িতে ঢুকে শুরু করে তাণ্ডব। যোল জনকে গুলি করে ফেলা দেওয়া হয় জ্বলে। তার ভেতর ভাগ্যক্রমে দু'জন বেঁচে যায়। তারাই নৃশংস ঘটনার সাক্ষী।^১ যুক্তিবোদ্ধা মনীষ বেগুয়ান, অশোক মিত্র কার্বারী, প্রবুদ্ধন চৌধুরী এবং উগ্গা চাই চাইলেন চরম দুঃসময়ে উপজাতি ভাইদের পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বাধা দেয়। তাঁরা পানছড়িতে প্রবেশ করতে পারেন নি। কর্তৃপক্ষের বধাসময়ে বধোপযুক্ত সিদ্ধান্তের ফলে বড় রকমের ভাতৃসংঘর্ষ এড়ানো গেলেও এই ঘটনা উপজাতি ও অসুপজাতি যুক্তি বোদ্ধাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করে। সেই শুরু। তারপর প্রতিদিন যারাম্বক ও ভরাবহ খবর আসা শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামগুলো থেকে। উপজাতি বাড়ি লুট। উপজাতি গুন। উপজাতি মহিলা ধর্ষিতা।

রাজারার সি. এ. এক. আলবদর, আলশারস বাহিনীর কিছু পাণ্ডা

১। অগ্গবংশ মহাশয়ের, স্টপ জেনসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্রাকটস, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮১, পৃঃ ৭। ফার ইন্টার্ন ইকনামিক রিভিউ, ২রা আগস্ট, ১৯৮০।

এক সপ্তাহের বিভিন্ন জেলা থেকে পালিয়ে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের পত্তীরা জঙ্গলে লুকিয়ে থাকারটা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশ সরকার এদের খুঁজে বার করতে নির্দেশ দেন। পুলিশ ও বি. ডি. আর. পত্তীর অরণ্যে ঢুকত না। যারে কাছের জঙ্গলে অভিযান করে ফিরে যেত ক্যাম্পে। দ্বালাল কিংবা রাজাকার, কাউকে তাঁরা খুঁজে বার করতে পারেনি। দ্বালাল খুঁজে বার করতে না পারলেও দ্বালাতির অভিযোগে গ্রামবাসীদের ধরে এনে পুলিশ এবং বি. ডি. আর. নিপীড়ন শুরু করে। ঘরবাড়ি জালিয়ে দেওয়া, জোর করে টাকা আদায় করা, পিটিয়ে ও গুলি করে মারা এবং নারী ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। সরকারি বাহিনীর নৃশংস নির্ধাতনের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানানো হয়। উপজাতি উপদেষ্টা স্ব. রাজা ২৭ প্র চাই চৌধুরী উপজাতিদের উপর নির্বিচার অত্যাচার বন্ধ করতে সরকারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু কোন ফল হয় না। বরং অত্যাচার বেড়ে যায়। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়।

অল্পদিকে মুক্তিযোদ্ধা নামধারী কয়েকজন অসুপজাতি যুবক বোমাং রাজার ভাই এম. এল. প্র'র মাথা মুড়িয়ে, জুতার মালা পরিয়ে তাঁকে বান্দরবন শহরের পথে পথে হুরায়। রাজপরিবারের প্রতি এই নির্মম ব্যবহারে মারমা সন্তোষ প্রকাশ করে নেয় তাঁদের ভবিষ্যত কোন দিকে থাকে। বাহাদুর শালের নয়ই জাহ্নবীরী বান্দরবন শহরে এক বিরাট জনসভা অহুষ্ঠিত হয়। সভায় বোমাং রাজা স্ব. শৈ প্র চৌধুরী এবং অনেক মারমা নেতা উপস্থিত ছিলেন। সাতকানিয়া কলেজের জনৈক ছাত্র বোমাং রাজা এবং মারমা সন্তোষকে আপত্তিকর ভাষায় গালাগালি করে তাক্ষ দেন। তিনি বলেন, “বাচতে যদি চাও, তাহলে হয় বাঙালী হও, নয়ত বার্মা চলে যাও।” এই হুমকি মারমা সন্তোষের জাতিগত ভিন্ন অস্তিত্বে এক মানসিকতার তীব্র আঘাত হানে।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র তখনও রচিত হয়নি। শাসনতন্ত্রের কাঠামো কি হবে, তাই নিয়ে চলছিল আলোচনা-আলোচনা। বাহাদুর চাক বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একটি উপজাতি প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, আইন ও সংসদ

১। অগস্ট ১৯৭১ সালে, স্টপ জেনসাইড ইন টিটোলাং ছিল ট্যাকটিক্স.
কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৭১।

বিবরক মন্ত্রী এক আশ্রয়শীল লিগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জন্য শাসনতান্ত্রিক স্বাক্ষর করে দাবি জানান। একই সালের পনেরই ফেব্রুয়ারী গণপরিষদ সভায় স্বাক্ষর নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে আর একটি প্রতিনিধিত্ব প্রদানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন। সরকারের কাছে তাঁরা লিখিতভাবে চারটি দাবি পেশ করেন।

এক, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং তার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে। দুই, উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনাবিধির দ্বারা অল্পসংখ্যক সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে। তিন, উপজাতীয় রাজ্যের স্বতন্ত্র সংরক্ষণ করা হবে। চার, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

পরে অবশ্য চার নম্বর দাবির সঙ্গে একটি সংযোজন যুক্ত করা হয় এই মর্মে যে, দেশের অজানা অঞ্চল হতে সরকারি উন্নয়নে ব্যাপকহারে লোক এনে যেন পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢোকানো না হয়, তৎক্ষণাত্ বিধি ব্যবস্থার প্রবর্তন।

প্রতিনিধি দলের পেশ করা স্বাক্ষরলিপির প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, পেশ করা দাবি যেনে নিলে জাতিগত অস্বস্তি (এমনকি কিলিংস) বৃদ্ধি পাবে। অথচ জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে ক্ষুদ্র জাতির অস্তিত্ববোধ না থাকা বাঞ্ছনীয়। বৃহত্তর বাঙালী জাতীয়তাবাদে নিজেদের অস্তিত্ব বিকাশ সাধন করার পরামর্শ দেন তিনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অর্থেই বলে থাকুন না কেন, তাঁর বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। দাবী যেনে না নেয়ার চাইতেও প্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ হন তাঁদেরকে জাতিগত অস্তিত্ব বিলোপ করতে বলাতে। তাঁদের যুক্তি, মুসলিমদের আলাদা আবাস-ভূমি হিসেবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। পাকিস্তানের অস্বত্ব হওয়াতে তাঁরা মুসলিম হন নি। হয়েছিলেন পাকিস্তানি। বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। তাঁরা বাংলাদেশের নাগরিক, কিন্তু বাঙালী নন।

তিনাত্তরের সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচনী সঙ্কে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজ্যটি এসেছিলেন। তাঁর আসে পাকিস্তান সরকারের প্রধান হুসেইনে জেনারেল আইয়ুব খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খাঁ রাজ্যটি এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ জনগণের প্রতিনিধি ছিলেন না। তাই

তাদের উপস্থিতি বিরে উপজাতি জনগণের প্রত্যাশা ছিল না। দেশের অকিন্য়বাহী নেতা, জাতির পিতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রাধিষ্ঠা আসা এবং উপজাতিদের সামনে বক্তব্য রাখার প্রকল্প ছিল তাই অনেক বৈশি। রাষ্ট্রাধিষ্ঠা প্রদর্শনী যখনই বিরাট জনসভা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রাধিষ্ঠা আসা এই প্রথম এক শেখ। আঞ্চলিক বৈষম্য এবং জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল সুশ্রীচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা আঞ্চলিক বৈষম্য ও জাতিগত নিপীড়নের শিকার বহু বৃষ্ণ হয়ে। তাই তারা ভাবল, তাদের ভাগ্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে রাষ্ট্রাধিষ্ঠাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বোধনায়। প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে উপজাতি জনগণ তাদের ভবিষ্যত কি, তা শুনে চাইল। আগ্রহভাবে তারা দূর দূরান্ত থেকে এসে হাজির হয় জনসভায়। উপজাতিদের মনে জন্ম নেওয়া আশংকা দূর করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃক্ অহুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বোধনা করেন যে, উপজাতিদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক জীবন ও কাঠামোগত বৈচিত্রে ও বৈশিষ্টে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। এতদিন তাদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। সেইদিনের অবসান হয়েছে। উপজাতিরা দেশের যে কোন নাগরিকের সমান মর্যাদা পাবে। উপজাতিদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও বোধনা করেছিলেন যে, উপজাতিদের প্রবেশন দিয়ে সেইদিন থেকে বাঙালী করা হল।^১ কিন্তু কোন অর্থে বাঙালী করা হল, তা তিনি খুলে বলেন নি।

স্বল্প স্বল্প সমাজের পরিবর্তন আসে সাধারণতঃ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বিকাশের একটা স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত বৈশ্ববিক পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নয়। বিকাশ সাধনের প্রক্রিয়া হওয়া উচিত নিজস্ব চেষ্টা, ক্ষেত্র থেকে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আরোপ করার পথে নয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লিগের বধন জন্ম হয়, তখনও বিজ্ঞানি তত্ত্বের আবেশ জনগণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই আওয়ামী মুসলিম লিগের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী ধর্ম নিরপেক্ষ ও উদার দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বলের নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দটি রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুসলিম শব্দটি রাখা দিলে তখন সেটি হত অতি দ্রাষ্টব্যাল পদক্ষেপ। জনমনে সত্য

১। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী প্রচারণা সভা, রাষ্ট্রাধিষ্ঠা, ১৯৭০।

প্রতিক্রিয়া এড়াতে জয়লয়ে যে বাধ্যবাধকতা ছিল, পাঁচ বছর পর তা আর থাকেনি। 'মুসলিম' শব্দটি বাধ দিয়ে বলকে নামে এক কাজে করা হয় ধর্ম-নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সামাজিক অবস্থা ছিল অসুস্থ সামন্ততান্ত্রিক। রাজারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জনগণকে শোষণ করতেন। তা সত্ত্বেও জনগণ রাজাদের কখনও শোষণ ভাবতে পারেনি। ভাবত রক্ষক। শোষণের চেহারাটা তাদের কাছে একটি ছিল না। ছিল না তাদের চিন্তাচেতনার উন্নত ধারা। তাদের সামনে ছিল বৃহৎ জনগোষ্ঠীর চাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা। তাই উপজাতি জনগণ তাদের দীর্ঘদিনের সঙ্গে ঐর্ষ্য কাঠামো ভাঙতে তৈরি ছিল না। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হয়। কিন্তু উপজাতিদের সার্বিক অবস্থা তাই-ই রয়েই, যেমন ছিল পাকিস্তানের আমলে। উপজাতি বা ক্ষুদ্রজাতি সম্ভার (স্থানাল মাইনরিটি পরিচয় দিতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত উপজাতি জনগণ। সামন্ততন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা বস্তবাবস্থার বাস্তবিকতার নিয়মে একদিন বিলুপ্ত হত। চেতনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে অবলুপ্তির পথে এগুতো সামন্ততন্ত্র এক তার প্রতি উপজাতি জনগণের দুর্বলতা। জোর করে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া জনমনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতি তাদের নিজস্ব স্বাধািবোধ নিয়ে থাকতে চেয়েছিল, বাঙালী হিসেবে নয়। হঠাৎ বাঙালীকে প্রমোশন তারা কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারেনি। বরং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বোম্বাকে তারা ধরে নেয় জাতিগত অস্তিত্বের উপর চরম আঘাত হিসেবে। উনগকাশ সালে আওয়ামি লিগ জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখ এড়িয়ে সঠিক পন্থাক্ষেপ নিতে পেরেছিল। কিন্তু সেই আওয়ামি লিগ তিয়াক্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতি ও জাতিগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সমূহের অন্ত নীতি নির্ধারণে উল্লেখ দিয়ে তুল করেছিল বলে মনে হয়।

ভুলের কারণ তোলে কয়েকটি তথাকথিত বিদ্রোহী দল। জাতীয় রাজনীতিতে তাদের সুমিকা ছিল না। ছিল না নির্দিষ্ট দল ও স্পষ্ট বক্তব্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এই দলগুলো রাতারাতি বের করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। এইসব পত্র-পত্রিকায় উপজাতিদের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে সভাসমিধা বিভিন্ন লিখে উপজাতিদের কেন্দ্রিবে জোলা হয়। তথাকথিত বিদ্রোহী দলগুলোর উদ্দেশ্য অকল্প উপজাতিদের স্বাধীনতা ছিল না। বেশে নৈরাত্ত ও বিশ্বাস্য সৃষ্টি এক স্বাধীনতা বিপন্ন করাই ছিল তাদের

মূল উদ্দেশ্য। দলগুলোর পরস্পরী ভূমিকা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট সামরিক অকৃত্যখানে নব্বয় শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার পর পর্যায়ক্রমে আসা প্রতিটি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের উপর নির্ধারিত বাড়ার। দ্বারা দেশে এক আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য আইন। বলতে গেলে সেখানে আইনের শাসনই নেই। অথচ এক সময় নব্বয় শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠা বিপ্লবী রাজনৈতিক দলগুলো শোষণকার মুক্ত ক আহ্বানে, জিয়াউর রহমান, আবদুল সাত্তারের বৈরী উপজাতি নীতির বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি।

একমাত্র ব্যতিক্রম জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ। চুয়াত্তরের সতের মার্চের আগে দলের বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো সম্পর্কে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ভর দিয়ে কোন স্পষ্ট বক্তব্য ছিল না। স্বভাবতই, শত্রু মিত্র নির্ধারণ ও আন্দোলনের রূপরেখা সম্পর্কে বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারণা ছিল অনুপস্থিত।^১ জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জাসদের ছিল ‘অগোছাল’ এলোপাতাড়ি, গোঁজামিল, দায়সারা গোছের কাজ এবং বক্তব্য।^২ পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও জাসদের ভূমিকা সম্পর্কে এই মূল্যায়ন প্রযোজ্য। তা সত্ত্বেও, উপজাতি ইন্স্যু উপর জাসদের ধারাবাহিক ভূমিকা রয়েছে।

সবচেয়ে বিশ্বয়কর ও হতশাব্যজক হল দেশের প্রগতিশীল দু’টি বাজনৈতিক সংগঠন। জাশনাল আওয়ামি পার্টি (মোঃ) বা জাশ ও বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (সি. পি. বি)-টির ভূমিকা। দীর্ঘদিনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি জয়গণ এই দু’টি দলের ইতিবাচক সাদা প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু তা পূরণে এক উপজাতিদের আদ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল এই দু’টি দল। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সমস্ত নিরে জাশের (মোঃ) ভূমিকা বে উচ্ছন্ন হতে পারত তা বলার কারণ, উপজাতিদের ওপর আবেদন ছিল বলেই জাশের (মোঃ) এবং বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখায় উপজাতি সমস্যাংখ্যা’ তুলনামূলকভাবে অন্তান্ত জাতীয় ছাত্র সংগঠনের চাইতে বেশি ছিল। ছাত্র

১। জাসদের বিতর্কিত কার্ডীশনাল অধিবশন কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক
শ.আবদুল সিরাজের রাজনৈতিক রিপোর্ট, ২৯. ০. ৮৫, পৃ ১৩।

২। সিরাজুল আলম খান, অরুণোদয় ও সংগঠন প্রবন্ধ, পৃ ৭।

ইউনিয়নের উপজাতি ছাত্রনেতাদের মধ্যে হিমাংকবিকাশ খীসা, মামা চি লিলি, করুণেশ চাকমা, অশোক বিজ কাব্যারী, সুধার চাকমা ও ইলা চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। জাপের (মোঃ) হুস্পট বক্তব্য থাকলে আরও অনেক উপজাতি ছাত্রকে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতিত্বের সম্ভবত করা যেত এবং পরবর্তীতে জাপের উপজাতি সমস্ত সংখ্যা বাড়ানো যেত। জাপের (মোঃ) উদ্ভোগে স্বাধীনতার পর রাজ্যমাটিতে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সভার সভাপতি ছিলেন জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা। সংগঠনগত শক্তির অভাব এবং স্বল্প প্রচার সত্ত্বেও সভার জনসমাগম হয়েছিল প্রচুর। সভার মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন বেগম মতিয়া চৌধুরী। তিনি তাঁর বক্তৃতায় মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। ফলে উপজাতি জনগণ যেমন নিরাশ হয় নি, তেমনি আশ র আলোও দেখে নি। জাপের (মোঃ) হুস্পট বক্তব্য ও নীতি থাকলে সারা বাংলাদেশে যেমন প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারত, তেমনি সেত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সংগঠিত করার সুযোগ। তাহলে হয়ত, জাতীয় মূলমন্ত্রের সঙ্গে উপজাতিদের যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারত।

কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ময়মনসিংহের গারো, হাজং অধ্যুষিত অঞ্চলে এক সময় গড়ে উঠেছিল টংক এবং তেভাগা আন্দোলন। গারো ও হাজংদেব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মিল রয়েছে অনেক। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সেই রকম কোন আন্দোলন পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে না উঠলেও পঞ্চাশ দশকে এই এলাকার প্রথম উপজাতি কমিউনিষ্ট মোহনলাল চাকমার নেতৃত্বে রাজ্যমাটিতে একটি শিল্পক আন্দোলন হয়েছিল। আন্দোলন সংগঠিত ও নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে মোহনলাল চাকমার উপর জারি হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের বিশেষ ক্ষমতার একাধিক নব্বয় ধারা। চব্বিশ বছর মধ্যে তাঁকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম। (পরে তিনি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিধান সভার সভ্য হয়েছিলেন।) এরপর কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্ভোগে বা কোন কমিউনিষ্টের নেতৃত্বে কোন আন্দোলন পার্বত্য চট্টগ্রামে হয়নি। সি. পি. বি উদ্ভোগ নিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের বোধানোর স্বাধীনতা সঙ্কট হত যে, সারা দেশের সার্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নতি। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা বজায় রাখার

সংগ্রামে সি. পি. বি-ও অক্লিজ বদ্ধ, তা বোঝাতে সি. পি. বি বার্ষ হয়েছে। কারণ একই সাথে শ্রেনী সহাবস্থান ও শ্রেনীসংগ্রাম তথা সঠিকমূলক বিরোধিতার নামে বলটি আওয়ামি লিগ সরকারের সহযোগী হয়ে ওঠে। অন্তত জনগণ সেই দৃষ্টিতে দেখা শুরু করে। স্থাপের (মোঃ) বেলাহও একই কথা বলা চলে।

স্বাধীনতার পর আওয়ামি লিগ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠনের শেকড় ছড়াতে মনোযোগী হয়। স্বাধীনতার আগে আওয়ামি লিগে উপজাতি সঙ্গ ছিল না বললেই চলে। তবে আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লিগের কিছু উপজাতি সঙ্গ ছিল। তন্মধ্যে দৌতম দেওয়ান, বনীৰ দেওয়ান, বনি বপন দেওয়ান, মুনোতম দেওয়ান ও প্রাণভোষ চাকমার নাম উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর ছাত্র লিগ দু'ভাগ হলে তাদের অধিকাংশ রব-শাহজাহান সিরাজের দলে চলে গিয়েছিল। বলের পতাকাতলে উপজাতিদের টানার কৌশল ছিলেবে আওয়ামি লিগ সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিসরে দুই উপজাতি প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। নির্বাচনের পর থেকে চাক বিকাশ চাকমা আওয়ামি লিগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কুমার কোবনাচন্দ্র রায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাড়া, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক কোন কাজে সক্রিয় থাকেন নি। স্বাধীনতার পর চাক বিকাশ চাকমার প্রভাবে উপজাতি অনেক নেতা আওয়ামি লিগের সঙ্গতপদ গ্রহণ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লিগের সাধারণ সম্পাদক তখন ছিলেন সাইফুর রহমান। আওয়ামি লিগের জন্তু এচুর ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন। একটা সময় ছিল যখন তিনি একাই ছিলেন সংগঠনের কর্মী এবং নেতা। বাংলা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাইফুর রহমানকে সামনে রেখে স্বাধীনতাস্ত্রের পরিবেশের কায়দা তুলতে একটি বিশেষ সোচ্চলী আওয়ামি লিগে অঙ্গপ্রবেশ করে।

বাজারের সার্বিক উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা তহাবকির জন্তু একটি কমিটি নির্বাচন করার প্রথা ছিল। বাজার বা বাজারের কাছে গ্রামগুলো থেকে সবার গ্রহণ-যোগ্য কাউকে বাজার প্রধান বা বাজার চৌধুরী নির্বাচন করা হত। বাজার চৌধুরী উপজাতি বা অল্পজাতি, যে কেউ হতে পারতেন। আগেই বলা হয়েছে মৌল্য ও গ্রামগুলোর বিচারক ছিলেন হেডম্যান এক কাবীরীয়া। তাঁদের বিচারের রায় অল্পজাতিরাও মেনে নিত। এতে দুই সঙ্গতাদের সৌহার্দ্য ও সঙ্গীতি বজায় ছিল। স্বাধীনতার পর আওয়ামি লিগে অঙ্গপ্রবেশকারী এক

শ্রেনীর লোক এতদিনকার প্রচলিত প্রথা ভোর করে তুলে দিতে চাইল। শুধু গ্রামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নয়, হেডকোয়ার্টারসহ বিচার করাও তারা শুরু করে। কেবলমাত্র উপজাতিরা এতে আহত হয় নি। অনেক বছর ধরে বসবাস করা অহুপজাতিরাও এই তুফলকি কর্ণকাণ্ড সম্বন্ধে করতে পারেনি।

সাইফুর রহমানের নাম ভাবিয়ে এক শ্রেনীর লোকের দুর্ভাগ্য উপজাতিদের জীবন দুঃসহ করে তুলেছিল। উপজাতি জনগণ মনে করল, যেহেতু সাইফুর রহমান জেলা আওয়ামি লিগের নেতা, সে জন্তু সব দুর্ভাগ্যের নেপথ্যে আওয়ামি লিগের ইচ্ছা রয়েছে। উপজাতিদের এই ধারণা সর্বৈকভাবে সত্য নয়। সমস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের ঐক্য এবং সংহতি নষ্ট করতে তখন দেশের বিশেষ একটা স্বার্থাশ্রমী চক্র উঠে পড়ে লেগেছিল। তারা দেশের সর্বত্র উদ্ভাসিতমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। দেশের নানা অংশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল বাঙালীদের মধ্যে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা বিরোধ বাহিনীকে দ্বিচ্ছিন্ন উপজাতিদের সংকল্প অহুপজাতিদের।

চাক বিকাশ চাকমা জেলা আওয়ামি লিগ টেলে সাজানোর অগ্ররোধ কেন্দ্রীয় আওয়ামি লিগের কাছে রাখছিলেন অনেকদিন ধরে। বাহান্বয়ের শেষের দিকে নাম মাত্র পুরানো কমিটির কার্যকলাপ এবং নতুন কমিটি গঠন খতিয়ে দেখতে আওয়ামি লিগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রাস্কাক ও প্রচার সম্পাদক সরদার আমজাদ হোসেন রাডামাটি এসেছিলেন। রাডামাটির কোর্ট প্রাঙ্গণে তাঁরা এক জনগণীয় বক্তৃতাও করেন। সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়াতে স্বাধীনতার পর আওয়ামি লিগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সেই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে আসা। এর কিছুদিন পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামি লিগের নতুন কমিটি গঠিত হয়। কমিটি সভাপতি হন চাক বিকাশ চাকমা এক সাধারণ সম্পাদক জেড. এ. আলম। কজন উপজাতি নেতাকে জেলা কমিটিতে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রত্যাশা মত কে. আওয়ামি লিগ সাংগঠনের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দিতে পারেনি জেলার সর্বত্র। তেমনি উপজাতিদের গুরুত্বও তার প্রত্যাব দিক্কার করতে পারেনি।

শাসক বল আওয়ামি লিগের উপজাতি জনগণের মন জয় করে সাংগঠনিক শেকড় ছড়ানোর সুযোগ ছিল বিবিধ। শূন্য উপজাতি নীতি ঘোষণা এক করকারী প্রকাশন সত্বেও মাঝে মাঝে তা বাস্তবায়ন।

উপজাতি ও অল্পজাতি, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দাদের বিশেষত্ব—যা জাতীয় দলগুলোর পক্ষে এই জেলার সংগঠন করার অন্ততম প্রধান অস্ত্রস্বর। একদিকে জাতীয় দলগুলোর প্রতি উপজাতিদের অবিশ্বাস, অন্যদিকে জাতীয় দলগুলোর প্রায় অনতিদূর শাখা এবং অসীম কৰ্ব্বাকণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মনে জাতীয় দলে যোগ দেয়ার মত আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। এইসব ক্ষেত্রে বা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামেও তাই হয়েছে। বাহাত্তরে জন্ম নেয় সেলা ভিত্তিক আঞ্চলিক দল ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি’। সাতার সালে গঠিত হয়েছিল পাহাড়ি ছাত্র সমিতি। উপজাতি ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষা করা, কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সীমিত ছিল পাহাড়ি ছাত্র সমিতির ক্রমিকা। ছেয়টি সালে রাষ্ট্রাধী সরকারি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ছাত্র সমিতির কাজের পরিধি বেড়ে যায়। এই সময় থেকে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির রাজনৈতিক চরিত্র প্রকাশ পেতে শুরু করে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রীতি কুমার চাকমা, রূপাধন দেওয়ান, সৌতম চাকমা, পরিমল চাকমা, পঙ্কজ দেওয়ান, উষতিন তালুকদার, স্নেহময় চাকমা, প্রশান্ত চাকমা প্রমুখ নেতা প্রগতিসহী ক্রমিকা নিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠনে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির অবদান অপরিমীম। পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রাক্তন অনেক নেতা ও কর্মী কর্মজীবনে পেশা হিসেবে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন। উনসত্তরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিজেও পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নেন। তিনি পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রাক্তন নেতা ও কর্মীদের সংগঠিত করা শুরু করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম, বিশেষ করে পুরো উত্তরাঞ্চলে তিনি ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা চালান। এই প্রচেষ্টার পাহাড়ি ছাত্র সমিতি বোঙ্গা ক্রমিকা নেয়। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

কিন্তু তখন তার সাংগঠনিক শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তিনি নির্বাচনী অ’ভাত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলে তখন তিনি তাঁর মনোবীক প্রার্থীও হিতে পারেন নি। কিন্তু সত্তর থেকে তিয়াক্তর, জিন বছরে রাজনৈতিক অবস্থা হয় ওলট-পালট। এই ওলট-পালটে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের কোভকে পুঞ্জি করে লারমা অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করেন। বাসিন্দাদের পর জাতীয় সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত

আসন নির্ধারিত হয়। তিরাস্তরের সাধারণ নির্বাচনে লারমা শুধু নিজে নয়, দক্ষিণাঞ্চল থেকেও জন সংহতি সমিতি মনোনীত প্রার্থী চাই খোয়াই রোয়াজাও নিম্নলিখিত ভোটে সংসদ সম্ভূত নির্বাচিত হন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণের একচেটিয়া দখল ছিল রাজাদের। পরম্পরাগতভাবে মোগল, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী রাজাদের স্বার্থ বড় করে দেখত। রাজারাও সাধারণ উপজাতিদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে কাজ করতেন না। উপজাতিদের শিক্ষা-স্বীকৃতি, চিন্তা-চেতনা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্ত রাজাদের দায়িত্বই ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁদের আসন অটল রাখতে নিজ নিজ এলাকায় স্কুল কলেজ খুলতে এবং উপজাতিবা নতুন কোন উদ্যোগ নিতে চাইলে রাজারা বিভিন্ন কৌশলে নিরুৎসাহ করতেন। সম্ভবত পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রথম উচ্চবিদ্যালয়, রাঙামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনৈক চাকমা রাজকুমারকে পড়ানোর জন্ত। স্বীকৃতির কার্তামোয় আঘাত হানেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। উপজাতি জনসাধারণের রাজনীতি বন্দী ছিল বাজপ্রাসাদে। লারমা সেই রাজনীতিকে নিয়ে এলেন রাজপথে। সাধারণ মানুষের কাছে। তাঁর আগেও করেবজ্র উপজাতি নেতা সাধারণ মানুষের হয়ে লড়েছেন। কিন্তু তাঁর মৃত কেউ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন নি। উপজাতি জনগণকেও সঠিকভাবে বোঝাতে পারেন নি যে, লড়াইটা তাদের নিজেদের। বাঁচতে কেউ কাউকে সাহায্য করেনা। বাঁচার অবলম্বন নিজেদেরই হুঁজে নিতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছিল অমৈত্র্য, সংশয় ও দ্বন্দ্ববোধ। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে এই প্রথম অধিকার আদায়ের স্বার্থে সব সম্প্রদায় এক হয়। এই জন্ত লারমাকে বলা যায় একজন সকল বিপ্লবী।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের দেশের যে কোন সরকারকে অবিধানের চোখে দেখার একটা মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসনের উচ্চপদে কোন উপজাতি না থাকার দৃশ্য এবং আয়তনাত্মক লাল কিতার দোরাস্তো খন তারা স্তম্ভা পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তারা ভাবতে বাধ্য হয়, নিজেদের জেলাতেই তারা অবহেলিত। সারা দেশের প্রেক্ষিতে তাহলে তাদের মূল্য বা স্বাধীন কতখানি? সরকার বঞ্চন হলেও তাদের প্রতি প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আদৌ হবে কি? এইসব উত্তরহীন প্রশ্নের অস্বহীন মোহে

এবং সরকারের গঠন মূলক পদক্ষেপের অভাবে বাঁকতে থাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে কোন সরকারের প্রতি তাদের অবিচ্ছিন্ন গভীরতা।

তিয়াক্তরের পব থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অসন্তোষ রাজনৈতিক ইস্যুর রূপ নিতে শুরু করে।

সেই সময় সরকারি উচ্চাঙ্গে শুধু শরণার্থী পুনর্বাসন নয়, কিছু ঘটনাও ঘটে, যা উপজাতিদের আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। তিয়াক্তরের জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন নিয়েছিল তিন শ পনেরটি আসন। তিন শ সত্তর নির্বাচিত হতেন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল পনের জন মহিলা সদস্য মনোনীত করত। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সত্তর নির্ধারিত ছিল একটি মহিলা আসন। এই আসনের সদস্য হিসেবে নেওয়া হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের স্ত্রীমতী সুদীপ্তা দেওয়ানকে। এর পেছনে গঠনমূলক উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল। প্রথমত, উপজাতিদের প্রতি কমতাসীন দল, আওয়ামি লিগের সমীচীন প্রকাশ ঘটান। দ্বিতীয়ত, জেলা আওয়ামি লিগের কাজে গতি ও প্রাণ সঞ্চার। তৃতীয়ত, জেলা প্রশাসনে উপজাতিদের অংশগ্রহণে উৎসাহ সৃষ্টি করা। চতুর্থত, সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা থেকে সরকারি দলের প্রতিনিধির অল্পপস্থিতির মূণ্যতা পূরণ করা। কাজটা যেহেতু শুরুস্বপূর্ণ সেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি নেতাদের কিংবা জেলা আওয়ামি লিগের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিনিধি বাছারের কাজটা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয় নি বলে উপজাতি নেতা ও জেলা আওয়ামি লিগের অভিযোগ। উপরন্তু, জাতীয় সংসদ সদস্য মনোনীত হবার পর সুদীপ্তা দেওয়ানকে ঘিরে তৈরী হয় একটি সুবিধাবাদী চক্র। সুদীপ্তা দেওয়ানের কাঁধে বসুক রেখে কায়দা তোলে পার্লিট, লাইসেন্স শীকারীর দল। তাই আওয়ামি লিগ যে উচ্চাঙ্গে তাঁকে সংসদ সদস্য মনোনীত করেছিল, তার কোনটাই তিনি সঠিকভাবে কার্যকরী করতে পারেন নি উল্লেখিত চক্রের বড়বয়ে। তিনি উপজাতিদের নয়, ছিলেন আওয়ামি লিগের প্রতিনিধি। তাঁর ও আওয়ামি লিগের নাক ডাকিয়ে সুবিধাবাদী চক্রের বেপরোয়া কার্যকলাপে উপজাতিরা আরও বেশী আতঙ্ক ও বিচ্ছিন্ন হারাতে থাকে আওয়ামি লিগের প্রতি।

বাধীনতার পর আওয়ামি লিগ সরকারের বেশ কিছু মহী পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিলেন। তাঁদের কয়েকজন জনসভায় বক্তৃতাও করেন। জনসভার জনগণের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসভা সাধারণত কম অনুষ্ঠিত হয়। উপজাতি জনগণের সভ্য-পরিষিতে যোগ দেওয়ার অভ্যাসও নেই।

তার কারণ আগে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক কার্যকলাপ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিবিড় ছিল। এই জেলার জনসভার জনগণের উপস্থিতির সঙ্গে দেশের অন্তর জেলার তুলনা করা ভুল হবে। দেশের প্রচলিত ধারণা মতে, বড় সভা হল জনপ্রিয়তার মাপকাঠি। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না। উপজাতি জনগণের বাড়ি ভাল বুঝতেন বলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যম হিসেবে জনসভা বেছে নেননি। জনসভার স্বল্পসংখ্যক উপজাতির উপস্থিতি দেখে কিছু মন্ত্রী এবং নেতা মনে করেন, উপজাতিরা সরকার বিরোধী। সরকার এবং দেশের বিরোধিতা করলে পরিণাম কি হতে পারে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মত তাঁরা রাজা ত্রিবিব রায়ের চৌদ্দশোজী উদ্ভার করেন। তাদের দুর্দশার জন্ত রাজাকে অনেক সমগ্র দায়ী করলেও, অধিকাংশ প্রগতিশীল উপজাতির মনে সামান্য হলেও রাজার প্রতি দুর্বলতা ছিল। সাম্প্রদায়িক উপজাতির ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা ছিল আরও গভীরে। এই দুর্বলতার পেছনে যুক্তির চাইতে বেশি ছিল আবেগ আর দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা অভ্যাস।

রাজা ত্রিবিব রায়কে আক্রমণ তাই উপজাতিদের, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় চাকমাদের আহত করে। এবং তা অস্ত্রাস্ত্র উপজাতি সম্প্রদায়ের মনে ছড়িয়ে যেতে দেখি হয়নি। এই ধরনের মন্ত্রী এবং নেতারা—বাঁদের অনেককে বন্ধন হত্যাকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খোন্দকার মূলতাক আহমেদের মন্ত্রিসভায় বোম্ব দিতে দেখা গেছে—বোম্বার চেষ্টা করেন নি যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বয়ে যাওয়া নিপীড়নের বড়ে উপজাতিরা অনেক কিছুই মথো হারিয়েছে সরকারের প্রতি বিশ্বাসও। রাজা ত্রিবিব রায়ের বিরুদ্ধে বিবোদনার করে হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস কিরিয়ে আনা যায় না। তার জন্ত চাই গঠনমূলক বাস্তব পদক্ষেপ।

পাকিস্তানের নিয়মপত্রের নেতৃত্ব ও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসন উপজাতিদের চিহ্নিত করেছিল ভারতপন্থী। সেই একই নেতৃত্ব এবং প্রশাসন (বাঁদের ভেতর অনেকে হানাদকার বাহিনীর সহযোগী ছিল) স্বাধীনতার পর উপজাতিদের চিহ্নিত করে পাকিস্তানপন্থী হিসেবে। ভারত উপমহাদেশ ভেঙে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ। উপজাতিদের হুজুয়া, সে দেশের নাগরিক হয়েও তারা চিহ্নিত হয়ে রইল পাকিস্তানপন্থী হিসেবে। আজ তারা পায়নি সত্যিকার নাগরিক স্বাধীনতা।

চুরাত্তরের শেষে বা পঁচাত্তরের প্রথম দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আওয়াজি নিগের তৎকালীন সভাপতি চাক বিকাশ চাকমা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিশেষ পড়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক নিগৃহীত হন। চাক বিকাশ চাকমা কর্তব্যবহুর স্বক থেকে বাঁশের ব্যবসায় অড়িত ছিলেন। তাই ব্যবসার কাজে তিনি প্রায় গভীর অবন্যাক্ষেপে যেতেন। তিযাত্তব থেকে শান্তি বাহিনী নামে একটি ক্লম পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র তৎপরতা চালানোর প্রততি নিগেচিকা। পুলিশের সঙ্গে দলটির কয়েকবার সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনার বিন, ঐ সশস্ত্র দলটিকে হত্মের উদ্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামেব পুলিশ স্থপাবেব নেতৃত্বে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী স্মবলং স্মবেব কাছাকাছি অবস্থান করছিল। চাক বিকাশ চাকমা ঐই স্মবের কিছু জানতেন না। তাঁর স্পীডবোট স্মবলং স্মবেব কাছাকাছি আসতে না আসতে শুরু হবে বার শান্তি বাহিনীস সঙ্গে পুলিশের গোলাগুলি। গোলাগুলি বেন হচ্ছে, কোনদিকে হচ্ছে, কার সঙ্গে কাব হচ্ছে, তা বোঝার আগে চাক বিকাশ চাকমা জলে ঝাঁপ মেন। তাঁর সাবীরা কেউ জল, কেউ বা ডগ্গার জললে গিয়ে অঙ্গগোপন করে। গোলাগুলি থামাব পর কে কোথায়, তা বোঝ নেবাব আগেই পুলিশ এসে তাবের ধরে। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ধরা পড়ার পুলিশেব সন্নেহ চাক বিকাশ চাকমা ও তাঁব জুঁতিনজ্ঞন সঙ্গী সশস্ত্র দলের সঙ্গে জড়িত। পুলিশ চাক বিকাশ চাকমাব কোন বস্তব্য শুনল না। শুরু করে বেধড়ক মাবধোব। পুলিশ স্থপার চাক বিকাশ চাকমাকে ভালভাবে চিনতেম। তিনি কিন্তু মাবধোব করা থেকে পুলিশেব বিবত করেন নি। চাক বিকাশ চাকমা ও তাঁব সঙ্গীেব পেটাতে পেটাতেই রাঙামাটির রিজার্ভ বাজার জাটে আনা হয়। রাঙা দিয়ে হাটিরে নেয়ার সন্মণ্ড সমানে চলে পুলিশি লাঠি আর লাথি। পুলিশেব ঐই উল্লক ব্যবহাবে উপজাতিদের সঙ্গে অহুপজাতিরাও সমভাবে ব্যথিত হয়। পুলিশ শান্তি বাহিনীস চার সহস্ত্র লাশও পেয়েছিল। রাঙামাটি বর্গের সামনে চাঃ লাশ ও চাক বিকাশ চাকমা এক তাঁব সঙ্গীেব ছবি একসঙ্গে তোলা হয়। তারপর তাবের নেওরা হয় কোতয়ালি থানায়। হাজতে রাখা হয় চাক বিকাশ চাকমা ও তাঁব সঙ্গীেব। লাশ চারটি রাখা হয় থানার আঙিনায়। ঘটনার শেষ কিছু সেখানে হয়নি। সেইদিন পুলিশ যেন উল্লক হয়ে উঠছিল। তারা মিছিল বের করে খারে বেটে, ক্রিশ্ণে, ভায়েম, ক্রিসিতে। জাহের গোপান ছিল ভয়ংকর। কল্পনা করাও কঠকর যে, জাহের ক্রবক্রাবী বরদারি হয় আইব ভাবার এমন গোপান দিতে পারে। একটি ক্লম

সশস্ত্র দলের সঙ্গে উপজাতিদের সামগ্রিকভাবে জড়ানোর উপজাতিরা ক্রমশঃ ও শক্তিত হয়। মারাত্মক কিছু ঘটায় ভয়ে সেইদিনের এবং রাতের রাঙামাটি ছিল অস্বাভাবিক শব্দধ্বনি। সংসদ সদস্য স্রীমতী সুদীপ্তা দেওয়ানের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং সরাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর আলির হস্তক্ষেপে ঘটনা আর বেশি দূর গড়াতে পারেনি।

কিন্তু বা হবার, তা রোধ করা যায় নি। পরদিন চাক বিকাশ চাকমা মুক্তি পেলেন। তিনি কখনও জনপ্রিয় নেতা ছিলেন না। কিন্তু সেইদিনের সুব ছিল ভিন্ন। তাঁর রাজনীতির বিরোধিতা করেন এমন অনেক উপজাতি নেতা ও সাধারণ মানুষ তাঁকে বীরের সম্মান দেখালেন। তিনি সেদিন ছিলেন না জেলা আওয়ামি লিগের সভাপতি। ছিলেন নির্ধাতিত উপজাতিদের প্রতীক; জাতীয় নীতির পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি সমস্যা সমাধানে চাক বিকাশ চাকমাব বিশ্বাস সর্বজন বিদিত। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি আওয়ামি লিগের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন নি। এমনি করে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পার্বত্য চট্টগ্রামেব তৎকালীন আওয়ামি যুব লিগের আহ্বায়ক রণবিক্রম ত্রিপুরাকে হয়রানি করেছিল মহালছড়ি থানার পুলিশ। জাতীয় রাজনীতিতে জড়িত এবং বিশ্বাসী উপজাতি নেতাদেরও বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্দেহ ও নির্ধাতন কবে বস্তুত সামগ্রিক ভাবে উপজাতিদের জাতীয় মূলশ্রোত থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া শুরু হয়। রাঙামাটিতে পুলিশি উন্নয়নতা নিয়ন্ত্রণে বার্ষ পুলিশ সুপারের বদলি ও ঘটনাব সঙ্গে জড়িত অফিসার ও পুলিশদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক সাজ'ব দাবি করেন উপজাতি নেতারা। কিন্তু কোন ফল হয়নি। পুলিশ সুপার রাঙামাটিতে থেকে গেলেন। অল্পদিকে রাঙামাটির উজ্জ্বল ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিছু অফিসার ও পুলিশকে দেওয়া হয় পদক এবং প্রমোশন। এতে উপজাতিদের একটা অংশের মনে বিচ্ছিন্নভাবে সমস্যা সমাধান করার প্রবণতা বেড়ে যায়।

এই সময় দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। আইন-শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পদক্ষেপ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অপুঁজিবাদী অর্থনীতি বাস্তবায়নের কর্তব্যচর্চা নিয়েছিলেন। তাঁর সরকার গ্রহণ শিল্প ও ব্যাংক জাতীয়করণ করে। ক্ষুদ্র শিল্প বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ পরিমাণ ও জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্দিষ্ট করে দেয়। আওয়ামি লিগ বহুশ্রেণী ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন। মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামি লিগের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বঙ্গ একট হয়ে ওঠে।

কলের অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার কলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রগতিশীল কর্মবৃত্তী বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের চাপে অধির সর্বোচ্চ লিগি এবং বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাধ্য হয়েছিলেন।

অন্তর্দিকে আত্মপূর্ণের চেয়ে ক্ষমতার কোমল আওয়ামি লিগ অঙ্কিয়ে পড়ে। অনেক নেতা ও মন্ত্রী দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি জনমনে তীব্র প্রতি-
জ্ঞার সৃষ্টি করে। দীর্ঘ সংগ্রামের রক্তস্রাব পথে আওয়ামি লিগ দেশবাসীর
বে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছিল, তাতে চিড় ধরে। এর জন্য এককভাবে
আওয়ামি লিগকে দায়ী করা যায় না। দায়ী ছিল আন্তর্জাতিক বড়বড় এবং
বিশ্বসংকটও। যুদ্ধে বিধ্বস্ত বাংলাদেশে দানাদা বেঁধে গুঠে সন্ত্রাস, গুপ্তহত্যা,
ছিনতাই, পাটের গুদামে আগুন, সার কারখানায় বিস্ফোরণ, ঘৃণা, দুর্নীতি,
স্বজনপ্রীতি আর উপযুপরি বক্তা—দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও পরিবর্তিত
সামাজিক অবস্থার সুযোগে একরা দিনে দিনে জনজীবনে বাড়িয়ে তুলল
সংকট। যখন প্রয়োজন ছিল জাতীয় স্বাধীনতাকে সুসংহত করে সুখী সবুজ
দেশ গড়া, তখন সমাজ জীবনের রক্তে ও শাসন ক্ষমতার লুকিয়ে থাকা স্বাধীনতা
ও সমাজতন্ত্র বিরোধী চক্র দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা উত্তর
এই নাজুক পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে একটা ক্রম হতাশার সৃষ্টি হয়। সমাজ
জীবনে আসে লক্ষ্যহীনতা। এই অবস্থার অবসান এবং স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ
করার লক্ষ্যে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো ও
গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন। সমাজতন্ত্রে
উত্তরণের কর্মবৃত্তীর ভিত্তিতে জাতির প্রগতিশীল ও উৎপাদনকারী সকল
জনগোষ্ঠীকে সমন্বিত করে সর্ববৃহৎ সার্বজনীন ঐক্যের অপরিহার্যতার গঠন
করেন জাতীয় দল, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামি লিগ। সংক্ষেপে
বাকশাল। স্ত্যাপ (স্ৰোঃ), সি. পি. বি, আতাউর রহমান খানের জাতীয়
লিগ, সংসদ সদস্য আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে আগকের একাংশ এবং পার্বত্য
চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাকশালে যোগ দেয়।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও চাই খোয়াই যোয়াজার বাকশালে যোগদান
উপজাতি জনগণ সন্তোষজনক ইঙ্গিত বলে মনে করে। এর আগেও পার্বত্য
চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত উপজাতি প্রতিনিধি সরকারি দলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু
জারবার যোগ দেওয়ার বড় গুরুত্ব তারা কেউ পান নি। কারণ উপজাতি জনগণ

বিশ্বাস করত যে, মানবেন্দ্র নারায়ণ জার্মান কনসুলার লোক নেই। জনগণের কুহস্তের স্বার্থে তিনি বাকশালে যোগ দিয়েছেন।

বাকশালের শাসন কাঠামো অহুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি জেলায়—রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন—ভাগ করা হয়। রাঙামাটি জেলা ছাড়া বাকী দু'টো জেলার প্রশাসক বা গভর্নর নিযুক্ত হন দুই রাজা। খাগড়াছড়ির গভর্নর নিযুক্ত হন মং রাজা মং ঞ চাই চৌধুরী। বান্দরবনের গভর্নর হন বোমাং রাজা মং ঞ চৌধুরী। রাঙামাটির গভর্নর মনোনীত হন জেলা প্রশাসক এ. কাসির। তাঁর মনোনয়ন উপজাতিদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করেনি। কারণ তিনি উপজাতি জনগণের আস্থা অর্জন করেছিলেন। তিনটি জেলার বাকশাল সেক্রেটারি মনোনীত হন তিন উপজাতি নেতা। রাঙামাটির সেক্রেটারি মনোনীত হন চাক বিকাশ চাকমা, খাগড়াছড়িতে মনন্ত চাকমা ও বান্দরবনে মং চ ঞ চৌধুরী। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক কাঠামো নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর পর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মনে আশা ও বিশ্বাস কিছুটা কিয়ে আসে। মানবেন্দ্র নারায়ণ জার্মান বাকশালে যোগ দেওয়ার পর বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়, সারা দেশের আর্থিক—সামাজিক—রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি সমস্যা সমাধানে বিচাশী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদৃষ্টি ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপে একটা অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। শেষ হতে পারে নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনীতির প্রোতখিনী জাতীয় রাজনীতির গদায় মিলনের ক্ষণটি বীর্ভব্যায়ী হয়নি। পঁচাত্তরের পনের আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন নির্মমভাবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী খোন্দাকার মুশতাক আহমেদ সামরিক অভ্যুত্থানের মূলহোতা কয়েকজন কর্মরত ও অবসর প্রাপ্ত সামরিক অফিসারের নির্দেশে চড়ে দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসেন। তাঁকে অহুসরণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রী পরিষদের বেশ কিছু সদস্য।

একই সালে তেঙ্গার নভেম্বর ত্রিগেজিয়ার খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে আর একটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়। ঐ অভ্যুত্থানেও দেশের ক্ষতি হয় অপূরণীয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পর যে চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনজুর আলি ও ক্যাপ্টেন আবু জাভিদ নেতৃত্বে বিতে পারজেন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে এক হুগ্রিকল্পিত

বড়বড় তাঁরা নৃশংসভাবে নিহত হন। পাকাপাকি গদিতে বসার আগেই খালেক মোশারফকে সরে যেতে হয়। সাতই নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানে মারা বান খালেদ মোশারফ ও তাঁর বেশ কিছু সহকর্মী। বকে আসেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

পাৰ্বত্যান্বেষণ জয় লয় থেকে গণতন্ত্রের জন্ম পূর্ব পাকিস্তান অনেক রক্ত দিয়েছে। তাই আশা করা গিয়েছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটবে না। হবে না আর রক্তপাত। এবার গড়ে উঠবে স্বাধিকার গণতান্ত্রিক কাঠামো। কিন্তু স্বাধীনতার চার বছর পূর্ণ না হতেই চারমাসে পর পর তিনটি রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানে সব অহুমান মিথ্যে হয়। পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি সামরিক অভ্যুত্থান হলেও রক্তপাত হয়নি। পাকিস্তানের এক অংশ থেকে সৃষ্টি হওয়া বাংলাদেশে প্রতিটি সামরিক অভ্যুত্থানে রক্ত বয়ে প্রচুর।

চব্বিশ বছরের সুদীর্ঘ লড়াইয়ের চড়াই উতরাই পেরনোর পর জেসে ওঠা আশা নিবে যেতে চার বছরও লাগল না। রাজনৈতিক কিছু নেতার অসামুদায় এক সামরিক অভ্যুত্থানে অভ্যুত্থানে রক্তাক্ত বাংলাদেশ অস্থির ও অনিশ্চয়তার টালমাতাল হয়ে ওঠে।

পূর্ববাসন পরিকল্পনা

একটি মানব প্রজাতি বা নৃজ জাতিসত্তা কি করে এবং কি কারণে নিজের স্বর্নীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারায় এবং ধীরে ধীরে তার জাতিগত অস্তিত্ব (Ethnical Entity) অবলুপ্ত হয়, সেই সম্পর্কে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব-বিদ্রা নানা কারণ উপস্থিত করেছেন। প্রধানতম কারণ দুটি। শিল্পায়ন বা আধুনিকীকরণের অনিবার্ণতা। আর দ্বিতীয় কারণ সরকারের উচ্ছেদমূলক নীতি।

একটি দেশের শিল্পায়ননে প্রয়োজন নতুন জমি। কাঁচা মাল সরবরাহের উপযুক্ত ক্ষেত্র। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি কাগজের কলের কথা ধরা যাক। শুধু বস্ত্রপাতি বসালেই তো আর উৎপাদন হবে না। তার জন্তে চাই কাঁচা মাল। কাগজ তৈরির কাঁচা মালের মধ্যে বাঁশই প্রধান। তাই যেখানে বাঁশের সরবরাহ প্রচুর তার কাছাকাছি কাগজ কল প্রতিষ্ঠা লাভজনক। কেননা তাতে কাঁচামাল আমদানির জন্ত খরচ কম হয়।

কিন্তু সেই বাঁশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় হয়তো এমন একটি অঞ্চলে, যেখানে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও নিজ নিজ স্বর্নীয় পরিমণ্ডলে বাস করে নৃজ নৃজ বিভিন্ন জাতিসত্তা। কলকারখানা গড়ে উঠলেই তার কাছাকাছি গড়ে উঠবে নতুন বসতি—শ্রমিক বসতি, বাজার। চলবে মাছবের আনানো। এক-দিকে, কল-কারখানায় শ্রম ও কাঁচামালের ঘোগান এবং বাজারের কৃষি উৎপাদন বিক্রির মাধ্যমে স্থানীয় আদিবাসীদের একটা অংশের অর্থনৈতিক খাঙ্কন্য কিছুটা অর্জিত হয়, অল্পদিকে দীর্ঘদিন নতুন বসতির জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশার প্রভাবে তাদের নিজস্ব সামাজিক জীবন প্রথার হ্রস্বপতন ঘটে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাষা, ধর্ম সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি ধীরে ধীরে স্থানীয় আদিবাসীদের জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে। তাদের স্বকীয়তার ধ্বংস নামতে শুরু করে। আদিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আবার অন্তত কিছুটা আপত্তা করে কল-কারখানা গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীর অরণ্যাকূলে প্রসিয়ে আসন্ন বাধে। বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে

করতে তাদের জনসংখ্যা কমে যায়। মনস্তাত্ত্বিক কারণে প্রজননের হারও হয় নিম্নশ্রী। এমনি করে একটা পর্যায়ে তাদের অবলুপ্তি ঘটে। যারা শহরাঞ্চলে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অনুকরণে বেঁচে থাকে বা দুর্গম গভীর অরণ্যে মনবেতর জীবন ধারণ করে, তাদের জাতিগত অস্তিত্ব বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। শিল্প বা আধুনিক সভ্যতা বিকাশের ঐতিহাসিক অনিবার্য পরিণতিতে একটি বা একাধিক মানব প্রজাতি বা ক্ষুদ্র জাতিসমাজ সমূহের জাতিগত অস্তিত্বের ওপর আঘাতকে সমাপ্ততত্ত্ববিদ্যাবাদে বনেন, ভিত্তিহীন অক প্রোগ্রেস বা প্রগতির শিকার।

যে কোন দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের আলাদা অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। সেই স্বাতন্ত্র্য বক্ষার্থে তারা বিশেষভাবে মনোযোগী। তাদের জাতিগত অস্তিত্ব অনুন্নত থাকবে, এমন শাসনতান্ত্রিক গ্যারাণ্টি চেয়ে তারা সরকারের নিকট দাবি পেশ করে। কোন কোন রাষ্ট্র সংখ্যালঘু জাতিসমাজ সমূহের স্বাতন্ত্র্য শাসনতান্ত্রিকভাবে স্বীকার করে নেয়। গঠনমূলক উপায়ে বুঁজে নেয় তারা স্থায়ী সমাধানও। আবার কোন কোন রাষ্ট্র সেই পথের ধারে কাছে না ঘেঁষে উন্টো পথ ধরে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবি পরে শুষ্ক হুমকী হয়ে দাঁড়াতে বিবেচনা করে তারা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধ্বংস করার নীতি অবলম্বন করে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের জনবিস্তার পালটিয়ে দেওয়াই এই নীতির প্রধান লক্ষ্য। একটি অঞ্চলের জনবিস্তার পালটিয়ে দিয়ে সেই অঞ্চলের আদিবাসীদের নিম্নতম পরবাসী বরাকে ইংরেজীতে বলা হয় হাইনিনাইজেশন। হাইনিনাইজেশনের প্রকট উদাহরণ আজকের তিব্বত এবং শ্রীলঙ্কার তামিল অধ্যুষিত অঞ্চল। তিব্বতীরা তিব্বতে বাসে কোনদিন স্বাতন্ত্র্যের দাবি জানিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেই জন্য চীন ব্যাপকহারে তিব্বতে চীনাধিকার চুকিয়ে দিয়েছে। সেই একই কারণে শ্রীলঙ্কার তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলে অত্যাচারের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে সেই দেশের সরকারের উদ্দেশ্যে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অসন্তোষের মূল কারণ সরকারি উদ্দেশ্যে ব্যাপক পুনর্বাসন। তাই প্রশ্ন, উপজাতিরা কি চোখে দেখছে এই পুনর্বাসন? পুনর্বাসনই বা কেন? তারা কি প্রগতির শিকার? না হাইনিনাইজেশনের বলি? পার্বত্য চট্টগ্রাম যে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল এবং উপজাতিরা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে কতটুকু সচেতন ও বসন্তীল, তা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হয়েছে।

বলা যেতে পারে সমাজে শিকার প্রসারের ফলে অর্জিত এই চেতনাবোধ তাদের রাজনৈতিক শক্তির উৎস। একদিকে যেমন জাতীয় দলভ্রমের উপজাতিদের আস্থা ওজনে ব্যর্থতা, অন্যদিকে তেমনি একই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা যে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে জাতিগত-ভাবে (এথনিক্যাল) আলাদা ও পশ্চাদপদ, ভিন্ন সামাজিক প্রথা, ভিন্ন রীতিনীতিতে অভ্যস্ত এবং তাদের বিকাশের নিজস্ব ধারা অক্ষত ও অব্যাহত থাকবে এমন শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের দাবি দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা ভোটাধিকার প্রাপ্তির পর, একবার ছাড়া প্রতিবারই নির্দল উপজাতি প্রার্থীকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে জাতীয় সংসদে। (পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জেলা ভিত্তিক সংগঠন। জাতীয় সংসদে জনসংহতি সমিতির দুই সদস্যকে নির্দলই ধরা হত)। উপজাতিদের আক্ষেপ, পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক শাসনকালে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও তাদের এই মনোভাব মানবিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা হয়নি। জাতীয় গঠনমূলক কাজেও তাই খাটানো হয়নি উপজাতিদের কর্মশক্তি। বরং তাদের দাবি হুমকি হিসাবে ধরে নিয়ে বৈরী পদক্ষেপ নিতে শুরু করে সরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা মনে করে, বিশ্ব সভ্যতার অনিবার্য অগ্রগতির শিকার তারা এমনতেই। তার ওপর উপজাতি স্বাধিবিরোধী সরকারি নীতির ফলে বর্তমানে তাদের অস্তিত্বের শেকড়ে টান পড়েছে।

কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে উদ্ভূত উদ্বাস্ত সমস্যার ফলে একটা এলাকার উপজাতিদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেলেও তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর ভিত তেমনভাবে টলেনি। বরং শিকার প্রসার, বহির্বিশ্বের সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে উপজাতিদের ঐক্যবদ্ধ হবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। দেবে আর নেবে, মিলাবে আর মিলাবে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে জাতিতে জাতিতে তাব আদান-প্রদানের এই ভিত্তিতে অনেক অল্পবয়স্ক জাতি, উন্নত জাতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নিজেদের উন্নীত করেছে। মোগলরা ভারতে আসার পর নিজেদের স্বীয়কতা যেমন বিলুপ্ত হয়েছিল, তেমনি জোর করে তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ভারতীয়দের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। বরং দুই ধারার মিলনে গড়ে উঠেছে উন্নততর সভ্যতা। উপজাতি হুঁকিজীবীদের মতে, দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সার্বিক প্রভাব সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর স্বাভাবিক-ভাবে পড়বেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা এই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক

প্রভাব গ্রহণ করে বিকাশের নিজস্ব ধারা সচল রাখতে সক্ষমও। কিন্তু যখন এই প্রস্তাব অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত গতিতে বাড়ানো হয়, যখন সরকারি উদ্যোগে দেশের অন্যান্য জেলা থেকে ব্যাপকহারে পার্বত্য চট্টগ্রামে লোক চুকিয়ে দিয়ে উপজাতিদের জমি দখল করানো হয়, তখন উপজাতিরা ভীত-সঙ্কট হয়ে ওঠে। তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্বাভাব্যতা ও স্বাবলম্বিতা ধ্বংস করার সরকারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই পদক্ষেপে তখন তারা ভাবতে বাধ্য হয়, রাজনৈতিক বিবাদে জন্ম নেয়, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা হওয়ার জগাই তাদের ওপর সরকারি এই আক্রমণ। চীন অধিকৃত তিব্বতের তিব্বতী কিংবা শ্রীলংকার তামিলদের চাইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা তাদের নির্মম ভাগ্য বেশি মেলাতে চায় চিলিব ভাগ্যহত মানুষের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। চিলির সামরিক সরকার উনিশ শ উদ্যোগে 'ডিক্রী নং ২৫১৮' জারি করে। এই আইন বলে মানুষের জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায়ভিত্তিক জমি-মালিকানা স্বত্ব শুধু স্বীকার নয়, মানুষের জনগোষ্ঠীর ওপর নেমে আসে জেনারেল পিনোচেটের নির্মম নির্যাতন। পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এথনোসাইডের (Ethnocide) মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীকে পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়ার সরকারি নির্দেশ।

এখন দেখা যেতে পারে সরকারি উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন, উপজাতিদের ভাবায় অস্থপ্রবেশ শুরু হয় কখন? কি ভাবে হচ্ছে এই পুনর্বাসন? স্থানীয় উপজাতিদের প্রতিক্রিয়াই বা কী?

ভারত বিভক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রতিবাদে রাজ্যমাটি ও বান্দরবনে যথাক্রমে ভারত ও বার্মার পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। কাজেই পাকিস্তান সরকার ধরেই নিয়েছিল যে, জেলার অমুসলিম জনগোষ্ঠী সমূহের আত্মগত্য সহজলভ্য নয়। তিব্বত—বর্মী বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী সমূহের আত্মগত্য অর্জনে নূনতম কাঠখড় পোড়াতে রাজিও ছিল না পাকিস্তান সরকার। তাদের বরং পছন্দ ও বিশ্বাস ছিল সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে উপজাতিরা বাড়াবাড়ি করতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসনের জন্ত ব্রিটিশ প্রবর্তিত বিশেষ ব্যবস্থার অবলম্বিত খটায় পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই। শাসনতন্ত্রে ১৯০০ সালের রেজুলেশন বলকং রাখলেও রেজুলেশনের ধারা ভঙ্গ করে পকাশ বংশের প্রথম দিকে সরকারি উদ্যোগে প্রথম পুনর্বাসন শুরু হয় রাজ্যমাটির নানিরাছড়, লংগুড়, রামগড় মহকুমার ডলছাড়ি, বেগছাড়ি, মানিকছাড়ি এবং বান্দরবন মহকুমার আলিকদম, লামা ও

নাইকংছড়িতে। উপজাতি নেতাদের প্রবল প্রতিবাদ, আরকলিপি পেশ, পুনর্বাসন অকলে উপজাতি অহুপজাতি সংঘর্ষ এবং দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে পুনর্বাসন পরিকল্পনা সেই সময়ের মত স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু বাধের পুনর্বাসিত করা হয়, স্থানীয় উপজাতিদের বার বার দাবি সত্ত্বেও, সরকার তাদের তুলে নেননি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার পুনর্বাসন শুরু হয় ছেহাট্টিতে। ছেহাট্টিতে ভারতের বিহারে সংঘটিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কলে উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার পরিবার গৃহহারা স্বজনহারা হয়। লক্ষাধিক বিহারী মুসলিম পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছাড়া তারা সঙ্গে কিছুই আনতে পারে নি। সেই আগুন তারা ছড়িয়ে দেয় পূর্ব পাকিস্তানে। সম্ভবতঃ এতে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর মদত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ অশ্রোণ ও অফাস্ত চেষ্টা করে দাঙ্গা কুখেছিল সেইবার। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বিহারী মুসলিমদের পুনর্বাসন বাবস্থা নেওয়া হয়। দেওয়া হয় ঢালাও সুযোগ। বিহারী মুসলিমরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলিমদের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী মুসলিমদের সঙ্গে নৈকট্য ও আত্মীয়তা বোধ করত বেশি। এই দুর্বলতায় সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বিহারী মুসলিমদের তাদের ভাবেদার হিসেবে তৈরী করতে আরম্ভ করে। প্রয়োজনে যাতে বাঙালীদের বিকল্পে নেলিয়ে দেওয়া যায়, সেই চিন্তা মাথায় রেখে, তাদের পুনর্বাসন শিবির গড়ে তোলা হয় চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও ঢাকা শহরের চারপাশে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পনা কত নিখুঁত ছিল, তার প্রমাণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিহারীদের বাঙালী নিধন বজ্র।

বিহারী উদান্তর এক অংশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। তাদের রক্তে তখনও ছিল দাঙ্গার উদ্বোধন। সরকার খাস জমিতে উদান্তদের পুনর্বাসন দেয়। খাস জমি বলতে বেশির ভাগ হিন্দু আবাদ অযোগ্য পাহাড়। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের জমির উর্বরতা তুলনামূলক ভাবে দেশের অল্প জেলার চাইতে কম। সেসকলে পাহাড় চরে ফসল কলানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিহারী উদান্তরাও কঠোর পথে না গিয়ে সোজা পথ ধরে। উপজাতিদের তৈরী করা জমি দখল করা শুরু করে। স্থানীয় উপজাতিরা সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানান। বিচার চায়। সরকারের বিশ্বাসকর

(উদ্দেশ্য প্রণোদিত ?) নীরবতা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় সরল উপজাতিদের মনে কণ্ঠে কোত্তের সঞ্চার করে ।

ছেষটি সালেই পাবিত্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সরকারি সড়কে চীনে যান । তাঁর অবর্তমানে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের পদ অলংকৃত করেন জাতীয় পরিষদের স্পীকার ফজলুল কাদের চৌধুরী । ফজলুল কাদের চৌধুরী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে যে কিছু কাজ করেন তন্মধ্যে অন্যতম হল আটচল্লিশ বর্টার জঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামের বহিস্কৃত এলাকা (এক্সক্লুডেড এরিয়া)-র মর্যাদা তুলে দেওয়া । সম্ভবতঃ এই সুযোগের সব্যবহার করার জন্য প্রতিবেশী জেলাগুলিতে আগেই নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল । কয়েক হাজার অসুপজাতি পরিবার দু'দিনেই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ কবে লুটপাট কবে উপজাতিদের জমি দখল নিয়ে উপজাতিদেরই ধরছাড়া করে ।

সেই সালেই আঞ্চলিক খ্যাতি সম্পন্ন এগারজন ভূতত্ত্ববিদ, ইস্তিক। বিশারদ, উদ্ভিদবিদ, অর্থনীতিবিদ ও কৃষি বিশারদদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামেও অরণ্যকৃত পার্বত্য অঞ্চলের জমি সর্বোচ্চ পরিমাণে কাজে লাগিয়ে এলাকার উন্নয়ন সাধন করার উদ্দেশ্যে পাবিত্তান সরকার একটি দল গঠন করে । দলটি দুই বৎসর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ চালায় । কাজের শেষে তাঁদের সিদ্ধান্ত হল, পার্বত্য অঞ্চল হওয়ার দরুণ প্রচলিত প্রথা অর্থাৎ জুম চাষ পদ্ধতি ভাল হলেও তার অবসান করতে হবে । জাতীয় অর্থনীতির কল্যাণের স্বার্থে উপ-জাতি জনগণ শুধু বনজ সম্পদ উৎপাদনের অহুস্রতি পাবে । ভোগের নয় । এই বনসমীক্ষা ও মাঠের প্রায় অস্থায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে হালকা বণতিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় । আয়তনগত দিক থেকে তখন ময়মনসিংহ জেলার পর দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম । কিন্তু বনসমীক্ষা ও মাঠের প্রায় শুধু আয়তন ধরা হয়েছিল । চাষযোগ্য জমি এবং জনসংখ্যার অনুপাত ধরা হয়নি । কাপ্তাই বাধ নির্মাণের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম, আবাসযোগ্য জমির পরিমাণ কম হলেও, বাঘো ছিল প্রায় বরংসম্পূর্ণ । পরবর্তী-ছেষটি সালের জুনি রাজস্ব প্রশাসন গৃহীত জরিপে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ৫,০২৫ বর্গমাইল, অর্থাৎ ৩২,৫০,৫২০ একর । অরণ্যভূমির পরিমাণ ২২,০২,৭৩০ একর এক সর্বমোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২৩,০০২ একর । মোট কলঙ্কিত জমি হচ্ছে ১,৩০,০০ একর । পতিত জমির পরিমাণ ১০,০০০ একর । অপর পক্ষে সবুজ এলাকার ৪৫,০০০ একর জমি চাষাধিকার অযোগ্য । আর

১,৭০,৮০০ একর জমি চাষাবাদের জন্য মোটেই লভ্য নয়। কাপ্তাই বাধ নির্মাণের ফলে মোট উর্বর আবাদী জমির চল্লিশ শতাংশ জনময় হয়। ফলে জমি ও জনসংখ্যার অল্পশাতক কম আসে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা একেত পাহাড়ী অঞ্চল, তহুপরি সমস্ত এলাকার প্রায় তিন চতুরাংশ সংরক্ষিত, প্রোটেক্টেড এবং অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল। সংরক্ষিত বনের পরিমাণ ২২৯ বর্গমাইল, প্রোটেক্টেড বনের পরিমাণ (জুয় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ) ৫৭'২০ বর্গমাইল। আর অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনের পরিমাণ ৩, ৩৩১, ১২ বর্গমাইল। সমতল ও আবাদযোগ্য জমির প্রাচুর্য এই জেলার কোনদিন ছিল না। সমতল ভূমি বলত ছিল পাহাড়ের মাঝে ছোট ছোট উপত্যকা। সেখানেই চাষ হত। কাপ্তাই বাধ নির্মাণের ফলে পঞ্চাশ হাজার একর জমি ডুবে যাওয়ার চাষযোগ্য জমির সংকট পার্বত্য চট্টগ্রামে ততটা হয়, যতটা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যাঞ্চলে। কাজেই দ্বিতীয় বৃহত্তম হলেও বাসযোগ্য ভূমি এবং জমির উৎপাদনী ক্ষমতার বিচারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে পরিকল্পনায় যতটা ধরা হয়েছিল, ততটা হালকা বসতি পূর্ণ ছিল না। সুতরাং উপজাতি বৃদ্ধিজনী, যাঁদের এই পরিসংখ্যান অবিগত, তাঁরা ধরেই নেন, বনসমীক্ষা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের মাষ্টার প্ল্যান সরকারি অজুহাতের মোড়ক মাত্র। আসল উদ্দেশ্য, অল্প জেলা থেকে লোক এনে পুনর্বাসন। আর সাধারণ উপজাতিরা, যারা পরিসংখ্যান জানে না, বুঝেও না, তারা ভাবল, তাদের স্বাভাব্য ধ্বংস করতে এটা একটা সরকারি ষড়যন্ত্র।

পাকিস্তান আমলে সরকারী উদ্যোগে যে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তার বিশদ সংখ্যক লোক বাইরের জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে স্বাধীনতা মুক্তকালীন অস্বিগত নয় মাসে এবং স্বাধীনতাত্ত্বের বিশৃঙ্খল সময়ের সুযোগে। আইন-শৃঙ্খলা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসার পরও বিভিন্ন জেলা থেকে লোক প্রবেশ অব্যাহত থাকে। সেই সময় তাদের হাতে বোপাঘোপ মন্ত্রণালয়ের ইন্সপেক্টর বিনা পরসায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বাওয়ার পাশ দেয়া গেছে বলে অভিযোগ ওঠে। তাই ব্যাপকহারে পুনর্বাসন শুরু করার অল্প উপজাতি জনগণ বাংলাদেশের প্রথম সরকার, শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে দায়ী করে। স্বাধীনতাত্ত্বের পরিবেশে যে কোন সরকার নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সঠিক পর্যবেক্ষণ নাও নিতে পারে, এমন নজীর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অল্পশতাংশ পুনর্বাসন উপজাতিদের মনে অসন্তোষ ও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে

জেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনর্বাসনের হার অনেক কমিয়ে এনেছিলেন। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে তাঁর সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন বন্ধ করার ও অবৈধভাবে যারা উপজাতিদের জমি দখল করে রয়েছে, তাদের সেই জমি ছেড়ে দিতে নির্দেশ জারি করেছিলেন। সরকারি উদ্যোগে অস্ত্র জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে লোক ঢোকানো সম্পূর্ণ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি তিনি বাকশাল গঠনের পূর্বে সংসদ সভায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে দিয়েছিলেন।^১ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেশ স্বাধীন হবার পর, আওয়ামি লিগ সরকারের আমলেই। সাকাবি জুব কব মওহুক শিকা প্রতিষ্ঠান সমূহে উপজাতি ছাত্রদের জ্ঞান আগুন সংরক্ষণ, উচ্চ শিকার জ্ঞান তাদের বিশেষ পাঠানো, চাকরী ও বাবসাব কেন্দ্রে উপজাতিদের জ্ঞান বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি ও চট্টগ্রাম বেতার থেকে উপজাতি অস্থান প্রচার শুরু হয় তখন থেকে। সেই সময়ই সরকারের উদ্দেশ্যে বাংলা এচাডেমির উদ্যোগে উপজাতি গল্প, ছড়া, কবিতা, লোকগীতা, রূপকাহিনী পুস্তাকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর অস্থিতিশীল অবস্থা অনেকটা নিশ্চয়। আনার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ সরকার উপজাতিদের অধীনত্বিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মানোন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে উপজাতি নেতাদের পবিত্রাঙ্গনাবীনে উন্নয়ন বোর্ড, বিশেষ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন সমেত বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হতে পারে নি। পরবর্তীতে অগণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় আসা দেশের প্রত্যেকটি সাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত প্রকল্পগুলো নিজেদের সুবিধামত পরিবর্তন ঘটয়ে চালু করার চেষ্টা চালায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের হার তীব্র ও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে পচাত্তরের পনেরই আগস্টের পর সারা দেশে যখন নেন্দে আসে সাময়িক শাসন। বর্তমানে পুনর্বাসনের অর্ধই হচ্ছে, উপজাতিদের জমিতে বাইরের জেলার লোক বসানো।

‘স্বাধীনতা কমিশন কর জারিষ্ট এ্যাণ্ড পীস’ চাকি, ১৯৮৩’র প্রতিবেদন, দ্বি ভাগ প্রবলেম অফ হিস ট্রাইবেলস্, বান্দরবান এলাকার উপজাতিদের নিয়ে লেখা হলেও তা সার্বিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এক

সেই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সাধারণত তিনটি প্রক্রিয়ার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা তাদের জমি হারাচ্ছে।

এক, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ। দুই, ভূমি নথিপত্র তৈরি করে জমি দখল, তিন, জবর দখল।

: সরকারি সংস্থার জমি অধিগ্রহণ :

বৃক্ষ রোপন, ফলের বাগান, পুনর্বাসন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজেব নামে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা বাগ জমির সঙ্গে উপজাতিদের আবাদী জমিও অধিগ্রহণ করছে। অধিগ্রহণের সময় অসং সরকারি কর্মচারিরা জমির ক্ষতিপূরণের হার নিচুতে বেঁধে দেন। জমির শ্রেণী বিভাগ করা হয় তিন শ্রেণীতে। প্রথম শ্রেণীর জমির ক্ষতিপূরণের হার একর প্রতি চল্লিশ হাজার টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণী পনের হাজার থেকে চল্লিশ হাজার টাকা। তৃতীয় শ্রেণীর জমির সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের হার একর প্রতি পনের হাজার টাকা। সংশ্লিষ্ট অফিসাররা জমির শ্রেণী বিভাগ ও ক্ষতিপূরণের হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করেন। অনেক সময় তাঁরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপজাতিদের জমির দাম ও পরিমাণ কমিয়ে দেন।

সম্প্রতি কালাঘাটা বন বিভাগ বেশ কয়েক একর জমি অধিগ্রহণ করে। জমির দর ছিল একর প্রতি কুড়ি হাজার টাকা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অফিসাররা জমির শ্রেণী দ্বিতীয় বিভাগ থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে ক্ষতিপূরণের হার বেঁধে দেন একর প্রতি আট হাজার টাকা।

বস্তুত, কি করে ক্ষতিপূরণ পেতে হয়, কারা ক্ষতিপূরণের হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করেন, কোণায় বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, অধিকাংশ উপজাতিরাই তা জানা নেই। বাধা হয়ে তাই তাদের দালাল ধরতে হয়। দালাল শ্রেণীর লোকেরা তাদের ঠিকিয়ে ক্ষতিপূরণের সিংহভাগ টাকা নিয়ে নেয়। এমন কি, সব টাকা নিয়ে পালিয়ে বাবার ঘটনাও বিহীন নয়।

বন সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য জুস চাষ বন্ধ করতে সরকার উপজাতি পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে আদর্শ গ্রাম বা বৌধ খামার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীতে উপজাতি পরিবার পিছু পাঁচ একর আবাদযোগ্য জমি এবং আনুমানিক খরচ যেটানোর জন্য নগদ ছয় হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়। কথা ছিল এই ব্যবস্থা শুধু মাত্র উপজাতিদের জন্যেই। কার্যকরভাবে কেণা গেল, এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন জেলা থেকে অন্তর্গত

পরিবার এনে বৌখ খামারের জমিতে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। তারাও উপজাতিদের সমপরিমাণ জমি এবং টাকা পাচ্ছে। অধিকন্তু, বাড়িঘর তৈরি করার জন্য তাদের পরিবার পিছু পনের হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে, যার কথা উপজাতি পুনর্বাসন প্রকল্পে আদৌ উল্লেখ ছিল না।

শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলায় আদর্শ গ্রাম বা বৌখ খামার প্রতিষ্ঠার পেছনে উদ্দেশ্যেরও ফারাক রয়েছে। অন্যান্য জেলার বাসবাসনের সুবিধার্থে ও রুহিতে উপাদান বাড়ানোর জন্য আদর্শ গ্রাম বা বৌখ খামার গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে কৃষকদের সাহিল করা হচ্ছেও বুঝিয়ে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য নিয়ম? এই জেলায় আদর্শ গ্রাম বা বৌখ খামার গড়ে তোলার উদ্দেশ্য, প্রথমত, মিলিটারির সঙ্গে শান্তি বাহিনীর (পার্বত্য চট্টগ্রামে তৎপর সমস্ত একটি উপজাতি দল) সংঘর্ষ জাগছে এমন এলাকা উপজাতি স্ক্রু করা। দ্বিতীয়ত, উপজাতি বাধবিরোধী কর্মসূচী বাস্তবায়নে উপজাতি জনগণের সম্ভাব্য সংগঠিত বাধা নিমূল করা। তৃতীয়ত, উপজাতিদের উচ্ছেদ করে তাদের জমিতে অন্য জেলার লোকদের পুনর্বাসন দেওয়া। সরকার নিয়ন্ত্রিত আদর্শ গ্রাম বা বৌখ খামার এলাকায় যেতে অস্বীকার করলে উপজাতিদের উপর চালান হয় অকথ্য শারীরিক নির্যাতন। উপজাতি গ্রাম জালিয়ে পুড়িয়ে আদর্শ গ্রাম বা বৌখ খামার এলাকায় যেতে উপজাতিদের বাধ্য করা হয়। কোন প্রকার ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয় না। বরং আদর্শ গ্রাম বা বৌখ খামারে নিয়ে গিয়ে উপজাতি পুরুষদের গিটিয়ে বা অনাহারে মারার ব্যবস্থা করা হয়। মহিলাদের করা হয় ধর্ষণ। চিকিৎসার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়। বৌখ খামারে বা আদর্শ গ্রামের নতুন ধরণে উপজাতিরা এইগুলোর নাম দিয়েছে নির্যাতন শিবির। লণ্ডনস্থ 'বাংলাদেশ পিপলস ডেমক্রেটিক মুভমেন্ট'ের আশীল স্নেহ, 'নিরপেক্ষ অনেক বাঙালী বুঝিছবী পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে তোলা বৌখ খামার বা আদর্শ গ্রামগুলোর তুলনা করেছেন ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভিয়েতনামী কৃষকদের জন্য নির্মিত মার্কিনী গ্রামের (ট্রাউজিক অিলজ) সঙ্গে।' রাঙামাটির বিলাইছড়ি এবং বাগুখালি ইউনিয়ন এবং খাগড়াছড়ি ও বামরাখানের কয়েক জাতিসার কয়েকটি বৌখ খামার বা আদর্শ গ্রাম গড়া হয়েছে। অজ্ঞাতার ও নিরাপত্তা অতিষ্ঠ উপজাতিরা এখনই সুযোগ পাচ্ছে, পাগিয়ে যাচ্ছে তথ্যবিত্ত আদর্শ গ্রাম বা বৌখ খামার থেকে দূরীকৃত অরণ্যে। বৌখ খামার সম্পর্কে উপ-

জাতিদের মনে এত তীব্র ঘৃণা জন্মছে যে, সরকার বাঘরাতে একটি ঘোঁষ খামার প্রতিষ্ঠা করবে শুনে অনেক উপজাতি বাঘরা ছেড়ে চলে যায় অন্তর।^১

জমি ববাদের বেলারও দেখা যায় বৈষম্যমূলক নীতি। জেলা ও মহকুমা প্রশাসকরা জমি বরাদ্দ করার মালিক। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তাঁরা সাধারণত কদাচিৎ উপজাতি পরিবার পিছু আধ কিংবা এক একরের বেশি জমি বরাদ্দ করেন। ব্রিটিশ শাসন আমলে একটি উপজাতি পরিবার পঁচিশ একর জমি ভোগ করতে পারত। পাকিস্তান সরকার তা কমিয়ে করেছিল দশ একর। বাংলাদেশের মিলিটারি সরকার তা আরও কমিয়ে করেছে পাঁচ একর। জমি সংক্রান্ত এই আইন দেশের অল্প কোন জেনার চালু নেই। উপজাতিরা না পরলেও অল্পজাতি একটি পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোন পরিমাণ জমির মালিক হতে পারে। বাংলাদেশ জমি সংস্কার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রতি পরিবার পঁচিশ থেকে ত্রিশ একর পর্যন্ত জমি রাখতে পারবেন। কিন্তু এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জ্ঞান নয়। যোদ্ধা কথা হল, উপজাতিদের জমি বহিরাগত পরদার্পীদের বিলি করে দেওয়ার স্বার্থে মিলিটারি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামেব জঙ্গ আলাদা নিয়ম চালু করেছেন। এই নিয়মের ফলে ভূমিহীন বা গগেন্দ্র লাল দেওয়ান ও প্রবোধচন্দ্র দেওয়ান তাঁদের জমির বিরাট অংশ পুনর্বাসনের জ্ঞান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমনি করে হাজারো উপজাতি পরিবার পিছুশুদ্ধের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।

যারা এই অত্যাচারের প্রতিবাদ ও নিজেদের বাড়িঘর জমি ছাড়তে অস্বীকার করছে, দুষ্কৃতির অভিযোগ এমন তাদের উপর অত্যাচার চলেছে। মিলিটারি এসে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্প। নির্দাতন পেষ ক্যাম্প থেকে জীবিত-মারা করে এলো, তাবা দেখছে তাদের ঘরবাড়ি জমি বেতখল হয়ে গেছে।

তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে ঘোঁষ বামারের অল্পভূক্ত একটি উপজাতি পরিবারের প্রধানই শুধু জমি বরাদ্দ নিতে পারে। পরিবারের অন্তরা নয়। কিন্তু অল্পজাতি একটি পরিবার পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ছাড়াও পরিবারের সাবালক ছেলের নামে আলাদা জমি ও অর্থ-স্বত্বও পেতে পারে। অল্পজাতি পরিবার পিছু মজুদী করা টাকা এভাবে দেওয়া হয়। কিন্তু উপজাতিদের তা দেওয়া হয় দৈনিক কুড়ি টাকা করে। মজুদী-কেন্দ্র থেকে উপজাতিদের অনেকের

১। সারভাইভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড রেল রিডিউ (১৯৭৩) নং ৪৩, লন্ডন, পৃঃ ১১৪।

-বাড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ মাইল। এমন কি বাট মাইল দূরে। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা
স্বরণথে মজুবী-কেন্দ্রে আসতে তাদের একদিনের বেশি লেগে যায়। প্রতিদিন এসে
টাকা নিয়ে যাওয়া শুধু কষ্টকরই নয়, প্রায় অগাধ। তারপরও তিনমাস টাকা
পাওয়ার পর উপজাতি পরিবারকে (যারা যে কোন ভাবে দিনের টাকা দিনে নিতে
পারে) অকিসে এসে গুনতে হয় সব টাকা তাদের দেওয়া হয়েছে।

: ভূমি দলিল :

ভূমি চাষ ও অরণ্যাকুল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করা গ্রামাঞ্চলের
অধিকাংশ উপজাতিই প্রধান জীবিকা। বর্তমানে ভূমি চাষ বন্ধ সরকারি ঘোষণা ও
জঙ্গল থেকে কাঠ কাটা নিষিদ্ধ হওয়াতে, এবং বিকল্প কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ
না করার দৃশ্য তাদের জীবনে নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষ অর্থনৈতিক দুর্দশা। বছরের
অর্ধেকের চেয়ে বেশি সময় তাদের অর্বাহারে ও অনাহারে কাটাতে হয়। সাময়িক-
ভাবে আর্থিক সংকট লাঘবের জন্ত তারা অনেক সময় মহাজন শ্রেণীর কাছ থেকে
চড়া সুদে ঋণ নেয় কিংবা সামান্য বা জমি আছে তা বন্ধক রেখে, কিছু টাকা
সংগ্রহ কবে। বন্ধকের টাকা ফেরৎ দিতে না পারলে বা পারলেও, নানা ছল-
চাতুরি করে মহাজনেরা সেই জমি স্থায়ীভাবে দখল করে নেয় এক শ্রেণীর অশাধু
সরকারি কর্মচারীর যোগসাজসে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক পুনর্বাসনের সরকারি নীতির সমালোচনা করা হয়
দেশের কয়েকটি দৈনিক ও সাময়িকীতে। আশির দশই অকটোবর প্রকাশিত
দৈনিক গনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, উপজাতিদের প্রবল প্রতিবাদ
ও বিরোধিতা সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলার এক লক্ষ অল্পপ্জাতি পরিবারকে পার্বত্য
চট্টগ্রামে পূর্ববাসনের পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে। পরিবার পিছু বিনামূল্যে
আড়াই একর সমতল জমি অথবা সমতল-অসমতল মিলিয়ে চার একর জমি বা
পাঁচ একর পাহাড়ি জমি এবং নগদে তিন হাজার দুইশত টাকা দেওয়ার সরকারি
প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তা ছাড়া, চার মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে বিনামূল্যে পরিবার
পিছু বার সের গম দেওয়া হবে। প্রয়োজনে এই অস্থান আরও ছয়মাস বাড়ানো
বেতে পারে। সৌদি আরব ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তের
ভিত্তিতে সরকার এই পুনর্বাসন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্ত দেশের প্রত্যেক জেলা প্রশাসককে
নিজ নিজ জেলার স্থিতিহীন ও ভাসমান জনসংখ্যার তালিকা প্রস্তুত করতে সরকার

এক গোপন নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন আলির সেক্রেটারে। সরকার অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটিশ এবং ইউ. এন. ডি. পি. ষাও রাডাঘাট তৈরির কাজে ব্যবহার করছে। সিডা (সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) বেশ কিছুদিন কাজ করার পর প্রকল্প অসম্ভব দেখে দেশে ফিরে গেছে। অস্ট্রেলিয়া সরকারের অহুদানে চেডি ভ্যালী রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা এলাকার রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। ইউনিসেফ পুনর্বাসন শিবির এবং তৎকালীন যৌথ খামারে পানীয় জল সরবরাহের দিকটি দেখাশোনা করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে পুনর্বাসন শিবিরের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ অভিযানে ব্যবহার করা হচ্ছে। পুনর্বাসন পাওয়া শরণার্থীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পণ্যপালন ও মূল্য চাষের বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।^১

পুনর্বাসন পরিকল্পনা যেন জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়, তার জন্য শান্তি বাহিনীর সমস্ত তৎপরতা দমনের অজুহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক মিলিটারি মোতায়েন করেছিল জিয়া সরকার। পুনর্বাসনের কাজে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করার পরই উপজাতি সমস্যা নতুন ও জটিল আকার ধারণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী মোতায়েনের উদ্দেশ্যই হল সেখানে সম্ভ্রান্তভাবে তৎপর উগ্রপন্থীদের দমন, এই কথা সুস্পষ্টভাবে সরকারি বচনে উল্লেখ থাকলেও

SECRET

Commissioner
Chittagong Division

Memo No. 66(9)C

To : Mr.

It has been decided that landless/river erosion effected people from your district will be settled in Chittagong Hill Tracts (CHTS). The settlement will be done in selected zones and each family will be given khas land free of cost according to the following scale :

Plain land	2½ acres-
Plain and dumpy mixed	4 "
Hilly land	5 "

It has been decided that you will send 5,000 families.

১। আই, এফ, ও, আর-এর এক ইউরোপীয় সমসাময় প্রেরিত রিপোর্ট ৮ মার্চ, ১৯৮০, নোদারল্যাণ্ড।

You are requested to collect particulars of intending and suitable families from the Chairman of the concerned Union Parishads sought them out and furnish list to the Deputy Commissioner, CHTS, through special messenger by the 30th of Sept./80 at the latest. To keep paper record of the selected settlers, group leaders and issue of Identity Card in all the districts in an uniform manner, detail guidelines have been prepared (copy enclosed) so that you can ensure strict compliance of the concerned Union Parishad Chairman.

It is the desire of the Govt. that the concerned Deputy Commissioner will give top priority to this work and make the programme a success.

You are requested to immediately call a meeting of the concerned Chairman, Union Parishads and give them detailed instructions in the matter.

I would like to have a report about the action taken by you in the matter by 15.9.80 positively for information of the Govt.

Sd/- Saifuddin Ahmed

4.9.80

Commissioner

Chittagong Division.

SECRET

Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh,

Office of the Deputy Commissioner, CHTS.

Nemo No. 1025(9)C

Dt. Rangamati, 15th Sept./80.

From : Mr. Ali Haider Khan

Deputy Commissioner

Chittagong Hill Tracts.

To : Mr.

Sub : Settlement of Landless non-tribal families in CHTS.

2nd Phase.

With reference to our discussion in Dacca on 21.8.80 and reference to Commissioner, Chittagong Division's letter No. 66(9)/C dt. 4.9.80 on the above noted subject, I furnish below a guideline regarding the programme of settlement of landless non-tribal families from other districts in CHTS :-

1) Selection of families should be completed by 15th Oct. 80.
2) The Chairmen of the Union Parishads concerned will issue Identity Cards to the selected families in the forms enclosed at Annexure (A).

3) Name of families groupwise should be sent to us by 22nd October/80. On receipt of these lists we shall decide as to where they will be rehabilitated and shall indicate to you on which dates the groups should report to the reception centre at the Haji Camp (Pilgrimage Camp), Chittagong.

4) At the reception centre an officer will take care of the settlers and will make arrangements for their journeys to the rehabilitation blocks. The settlers will, however, arrange their own food.

5) At the reception centre settlers will be given taka 200/- per family and on their arrival at their rehabilitation blocks they will be paid another instalment of taka 500/-. After that each family will be given further grants (C) taka 200/- per month for five more months. In addition for 6 months the settlers will be given 12 seers of wheats per family per week under Food for Work programme for construction of their own houses, reclaiming their lands, making village roads for them and for digging tanks in their own parts (area). For another six months there will be provision for wheat under strict Food for work programme.

In rehabilitation blocks each family will be settled with khas land at the following rate :

- (1) 5 acres hilli land
- (2) 4 acres mixed land
- (3) 2.5 acres paddy land

I enclose herewith an annexure 'B' an instruction for the Chairman of the Union Parishad where from the families will be selected.

Sd / -Ali Haider Khan

Deputy Commissioner

Chittagong Hill Tracts.

কার্ত্ত দেখা যাচ্ছে, সেনাবাহিনী উগ্রপন্থীদের দমনের চাইতে পুনর্বাসন কাজেই সরকারকে সাহায্য করেছে বেশী। জবর দখলের মাধ্যমে উপজাতিদের তাদের জমি থেকে উৎখাত করার প্রক্রিয়া মিলিটারি মোতায়েনের পরই জোরদার হয়ে ওঠে। জিয়াব সেনাবাহিনী কি ভাবে বাস্তবায়িত করেছে এই পুনর্বাসন পরিকল্পনা? 'সাধারণত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে, তা খুঁটি গোড়ে চিহ্নিত করার পর তার আশেপাশে মিলিটারি ক্যাম্প বসান হয়। তারপর খোলা হয় পুনর্বাসন শিবির। পুনর্বাসন পাওয়া এক শ্রেণীর লোক মিলিটারির মদতে ও প্রয়োচনায় উপজাতিদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার চালায়। যেমন, জোর করে ধান কাটা, ফলগাছ নষ্ট করে দেওয়া। উপজাতি জনগণ স্থানীয় ও জেলা কতৃপক্ষকে এই সব ঘটনা বারবার জানিয়েও কোন প্রকার প্রতিকার না পেয়ে এক সময় ভিত্ত-বিরক্ত ও হতাশ হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। তাদের পরিত্যক্ত বাড়ি-জমিতেই তখন বাইরের জেলা থেকে নিয়ে আসা লোকদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়।'^১

পার্বত্য চট্টগ্রামে মিলিটারি মোতায়েন শুরু হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর

১। পিটার নিলসনস্‌ড, আপ্‌ হিল প্রবলেম ফর চিটাগাং ট্রাইবসম্যান, দি গার্ডিয়ান, লন্ডন, ২৯শে জুলাই '৮১।

২। হারান এ্যাডস, ম্যাসাকর ফিরারড ইন বাংলাদেশ, দি অবজার্ভার, লন্ডন, ১৫ই মার্চ, ১৯৮১।

থেকে। আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘি-নালা, কমা ও আলিকদমে তিনটি মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাকিস্তান সরকার যখন তখন ভারত বিরোধী জিগির ও যুদ্ধের হুমকি দিলেও, এই জেলার সীমান্ত রক্ষা এবং এখান থেকে আক্রমণ হানতে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট তৈরি করে নি। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পঁচিশ বছরের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট কেন তৈরি করা হয়, উৎসাহিতদের এই প্রশ্নের সন্তুষ্ট সরকার দিতে পারেন নি। তবে অনেকের মতে ভারতের মিজো বিদ্রোহীদের দমনে ভারতকে সহযোগিতা করার জন্য এই তিনটি ক্যান্টনমেন্ট খোলা হয়েছিল। কিন্তু উৎসাহিত জনগণের একটা অংশ ক্যান্টনমেন্ট তৈরির পেছনে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পায়। তাদের যুক্তি, গুরু ভাবাপন্ন দেশের আগ্রাসন নীতির হাত থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষা করতে যদি পাকিস্তান কখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে নি, সেই ক্ষেত্রে বঙ্গ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখতে কী আওয়ামি লিগ সরকারের মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের প্রয়োজন? পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক বাহিনীর একটি গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত তিনটি ক্যান্টনমেন্টের কর্মতৎপরতা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। দেশের মানুষ দীর্ঘদিন লড়াই করে অনেক রক্ত ঝরিয়ে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, তার কণ্ঠ আবার রুদ্ধ হয় নিতানতুন সামরিক অর্ডিন্যান্সে। জনগণের চলা-বলার আসে নিয়ন্ত্রণ। কেড়ে নেওয়া হয় মৌলিক অধিকার। যে আহরণের জন্য ছাত্র যুব জনতা প্রাণ দেয় সাতচল্লিশ থেকে একাত্তরের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত, সেই আদর্শ জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্রনীতি থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। সামরিক বাহিনীর স্বার্থাবেশী একটি চক্র বন্ধুকের নল দিয়ে সার্বিক সমস্তার সমাধান খুঁজতে গিয়ে নিজে আসে আর্ধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে চরম অবক্ষয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তবুও সারা দেশে বা যেটিনি এই জেলায় তাই খটল। মিলিটারি অভ্যুত্থানের তীব্রতা বাফল। উদ্বেগ ও ভিন্ন ধরনের। সামরিক সরকার দেশের অন্তান্ত অঞ্চলে জনগণের কণ্ঠরোধ করেছিল যাতে বিরোধী কোন শক্তি জনগণের হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

এবং তাদের ক্ষমতায় থাকার রাস্তা যেন বরাবর পরিষ্কার থাকে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠিত মিলিটারি বৃহৎস কাঁধকলাপের পেছনে উদ্বেগ হল, বারংবার বাংলাদেশের সত্যিকার ন্যায়সমিক হিসেবে মর্যাদার জীবন দাবি করছে, তাদের অর্থাৎ উপজাতিদের কণ্ঠস্ব্য তুল্য করে দেওয়া।

পাঁচাত্তরের শাভাই নভেম্বর সিপাহী বিপ্লব বা পান্টা-অভ্যুত্থান ঘটলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর ক্যান্টনমেন্ট তিনটি বড় করা হয়। সৈন্য সংখ্যাও বাড়ান হয় কয়েক গুণ। খানাব সংখ্যা বাড়ান হয় বার থেকে আঠাশে। শুকতরুপূর্ণ সব জায়গাতে বসান হয় সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশ কাম্প এবং স্থল ও জলপথে চেকপোস্ট। গেরিলা দমন প্রশিক্ষণের জন্য মহানছড়িতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ধল্যাছড়িতে নৌ বাঁটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া বিমান বাহিনীকেও এই এলাকায় সক্রিয় রাখা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে সৈন্য মোতায়েনের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, প্রায় প্রতি পাঁচজন উপজাতির জন্য একজন সৈন্য রাখা হয়েছিল। বস্তুত, পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি বৃহৎ মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। সামরিক বাহিনী এবং সাহায্যকারী বাহিনী মোতায়েনের পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল—...

বাহিনীর নাম	ব্যাটেলিয়ন ডিভিশন	সদস্য সংখ্যা
বাংলাদেশ আর্মি	২৪তম পরামিতিক ডিভিশন	২৫,০০০ জন
বাংলাদেশ রাইফেলস	৮ ব্যাটেলিয়ন	১২,০০০ জন
আনসার	২ ব্যাটেলিয়ন	৪,০০০ জন
পুলিশ	৫ ব্যাটেলিয়ন	৬,০০০ জন
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	—	৮০০ জন

১ ও ২। উলফ্ গেং মে, জেনসাইড ইন বাংলাদেশ, দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্-টস কেস, ৭-১১ জুলাই অনর্দ্রান্তিত 'অন মডার্ন' এশিয়ান স্টাডিজের ৭ম ইউরোপিয়ান কনফারেন্সে' পঠিত প্রবন্ধ, ১৯৮১, লন্ডন, উলরীচ হেন্স, দি সিক্রেট ওয়ার ইন বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল ফেলশীপ অফ রিকর্নিসলিগেশানের রিপোর্ট, নোদারল্যান্ড, অক্টোবর, ১৯৮০, বাংলাদেশ : গ্রান্ড এন্ড নোসাইড অফ ন্যাশনাল মাইনরিটিস ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাক্-টস, বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক মুক্ত-

মিলিটারি অপারেশন সহজতর ও দ্রুততর এবং প্রত্যক্ষ অঞ্চলেও পুনর্বাসন ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার সব ক্ষেত্রে চলাচলের উপযোগী নতুন রাস্তা তৈরি করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের এক প্রান্ত থেকে অগ্র প্রান্ত পর্যন্ত। বান্দরবন থেকে রুমা। চিরিক থেকে আলিবন্দা। রামগড় থেকে খাগড়াছড়ি হয়ে দিঘীনালা। চট্টগ্রাম থেকে কটকছড়ি হয়ে খাগড়াছড়ি।^১

বস্তুত, পুরো এলাকা তিন ভাগে ভাগ করে সামরিক কর্তৃপক্ষ গোপনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অপারেশন এলাকা ঘোষণা করেছে। তিনটি ভাগে বিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের অঞ্চলগুলো হল, সাদা, সবুজ ও লাল। সাদা অঞ্চল—আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসন দপ্তরের দুই মাইলের মধ্যবর্তী উপজাতি ও অল্পপজাতি অধ্যুষিত এলাকা-গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সাদা বা নিরপেক্ষ অঞ্চল।

সবুজ অঞ্চল—শরণার্থী অধ্যুষিত এলাকাগুলো সবুজ অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত।

লাল অঞ্চল—উপজাতি অধ্যুষিত গভীর অরণ্যাকুল। এই সব এলাকা লাল অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে সামরিক তৎপরতা চালানো হয়।^২

সামরিক সরকারের উপজাতি নিমূল করার ক্ষমতা নীতি পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল সাতাত্তরের ছাব্বিশে ডিসেম্বর সামরিক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত খাগড়াছড়ি জনসভায়। কয়েক হাজার উপজাতিকে বন্দুকের নলের মুখে জনসভায় হাজির করা হয়। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তৎকালীন সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল মজুর জনসভায় বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, ‘ষাদেশকে এ জেলায় পুনর্বাসিত করা হচ্ছে, তারা গরীব এবং ভূমিহীন। এই এলাকার জন-সাধারণকে তাদের আশ্রয় দিতে হবে।’ উপজাতিরা যদি এই পুনর্বাসন পরিদৃষ্টনায় সহযোগিতা না করে, তবে তার পরিণতি কী হবে, তা বোঝাতে গিয়ে বক্তৃতার এক পর্যায়ে উপজাতিদের হুমিয়ারি দিয়ে মে: জেনারেল মজুর বলেন, ‘আমরা তোমাদের

মেম্বারের আবেদন, ২৫শে এপ্রিল, ৮৩, লন্ডন, বাংলাদেশ: রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইন দি চিটাগাং হিল ট্রাকটস এ্যান্ড এ্যামনোন্ট ইন্টারন্যাশনাল কনসার্ন, এ্যামনোন্ট ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৮০।

১। দি ল্যান্ড প্রভলেম অফ হিল ট্রাইবেলস্, ন্যাশনাল কমিশন ফর জাস্টিস এ্যান্ড পীস্, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮০।

চাই না। তোমরা যেখানে থুশি চলে যেতে পার। আমরা তোমাদের মাটি চাই।^{১১} মেজর জেনারেল মজুরের কথাগুলো শ্রবণ করিয়ে দেয় একাত্তরের দুঃসহ নারকীয় দিনগুলো এবং এক হানাদার জেনারেলের উদ্ভূত আচরণের কথা। একাত্তরে লাখো লাখো নিরীহ শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশের মানুষ হত্যা করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মনে করেছিল বাংলাকে চির পদানত রাখা যাবে। রক্তের গন্ধ বইয়ে দিয়ে হানাদাররা বাংলাকে পবিত্র করতে চেয়েছিল। সেই সময় এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাত-কারে এক হানাদার জেনারেল বলেছিল, বিজিতরাই হুমকি থেকে রক্ষা করে পূর্ব পাকিস্তানকে চিরদিনের জন্য পবিত্র করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সেই জন্য যদি কুড়ি লাখ লোক হত্যা করতে হয় এবং প্রদেশটাকে তিরিশ বছরের জন্য উপনিবেশ হিসেবে শাসন করতে হয় তবুও—ফ্রান্স ১৬নং ডিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে উদ্ভতভাবে আমাকে একথা বলা হয়।^{১২} এটা ম্পষ্ট যে, পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল মানুষ নয়, মাটি। মেজর জেনারেল মজুর স্বাধীনতা যুদ্ধের অবজ্ঞন বীর সেনানায়ক। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর সদস্ত ঘোষণা এবং নয়া-উপনিবেশিক শক্তির কাল হাত ভেঙে দেওয়ার লড়াইয়ে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয় এবং অবদান রুতিত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাবত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্তা এক নয়। প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। কিন্তু পাকিস্তানী জেনারেল ও মেজর জেনারেল মজুরের স্থর অনেকটাই অভিন্ন। বিশ্বয়কর হলেও সত্যি, মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জ্বল হয়ে যে সেনানায়ক মানবতার স্বর্ণাতম পুরুষের পরাক্রম করেন, মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে তিনিই এমন ঘোষণা করেছিলেন, যা ইয়াহিয়ার সেনানায়কদের মানায়।

অনিয়ন্ত্রিত ও বেচ্ছাচারী মিলিটারি অপারেশনের ফলে প্রতি পদে পদে লাহিত হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায়। লুণ্ঠিত হচ্ছে মানবাধিকার। ব্যাপক গণহত্যা, বিনা বিচারে আটক, ধর্ষণ, জীবন ধারণের আবশ্যিক প্রাণসামগ্রী হানান্তরণে নিষেধাজ্ঞা, ধর্মবিশ্বাসের জন্য হত্যারানি, বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস এবং

১। অম্পবরণ মহাধের, স্টপ জেনোসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্রাক্টস, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮১, পৃঃ ১৫।

২। এ্যান্টনি ম্যাসকারেন্স, ব্রেপ্ অফ বাংলাদেশ, বিকাশ পার্বালিশ, দিল্লি, ১৯৭৩, পৃঃ ১১৭।

কলুষিত করে দেওয়া, উপজাতি গ্রামের পর গ্রাম দখলানে পরিণত করা প্রায় রোজদার ঘটনার পাড়িয়েছে।

আশির পঁচিশে মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রামের কলমপতি ইউনিয়নে সামরিক বাহিনীর একটি দল নৃশংসতার চরম নজীর রাখে। দিনটি ছিল হাটবার। স্থানীয় মিলিটারি কমান্ডার হাটে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা কবে দেয় যে, পোয়াপাড়া বৌদ্ধ মন্দির মেরামত করা হবে। তাই উপজাতি বৌদ্ধরা যেন পোয়াপাড়া বৌদ্ধমন্দির প্রাঙ্গণে মনতিবিলম্বে হাজিরা হয়। পবিত্র মন্দির মেরামত কবতে সোৎসাহে উপজাতি বৌদ্ধরা এগিয়ে আসে। মন্দির মেরামতের কাজে অংশগ্রহণে আসা সকলে মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হলে স্থানীয় মিলিটারি বমাগার তাদের উপর গুলি ছুঁড়তে নির্দেশ দেয়। স্বাংকিয় হাতিয়ারের শুলিতে ঘটনাকূলে নিমিষে মারা যায় শতাধিক সরলবিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ উপজাতি। পোয়াপাড়া বাজার চৌরুরা কুমুদবিকাশ তালুকদার ও স্থানীয় স্কুল কমিটির সেক্রেটারি কাশীদেব চাকমাও নিহতদের মধ্যে ছিলেন। প্রবাস্ত দিবালোকে গণহত্যায় জাঙ্গাল হুড়িয়ে পড়ে উপজাতিদের গ্রামে। তারা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটে। পোয়াপাড়া বৌদ্ধমন্দিরে গণহত্যার অব্যবহিত পর মিলিটারির প্ররোচনায় একদল শরণার্থী উপজাতি গ্রামগুলো লুণ্ঠন কবতে শুরু করে। কাউশানি, মুগংগাড়া এক হেডম্যান পাড়া পুড়িয়ে ছাটি বরে দেওয়া হয়। তাদের আক্রমণে মারা যায় অনেক নিরাহ উপজাতি। আরও নয়টি বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করা হয়। পেটানো হয় কুড়িজন বৌদ্ধ ভিক্ষুককে। আশির বাইশে এপ্রিল বিরোধী দলের তিন সংসদ সদস্য শাজাহান সিরাজ (জামদ), উপেন্দ্রলাল চাবমা (জামদ) ও রাশেদ খান মেনন (গুয়ার্কাস পার্টি) ঘটনা সরজমিনে তদন্ত করতে কলমপতি যান। পঁচিশে এপ্রিল ঢাকা কিরে এসে তাঁরা এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা জানান, নৃশংস ঘটনাবলীর খবর সম্পূর্ণ সত্য। পঁচিশে মার্চের মিলিটারি সংগঠিত গণহত্যায় কমপক্ষে তিনশ উপজাতি নিহত ও সহস্রাধিক নিখোঁজ হয়েছে। গণহত্যায় নিহত উপজাতিদের গণসমাধিও তাঁরা পরিদর্শন করেন। কলমপতি হত্যাকাণ্ড একাত্তরের পঁচিশে মার্চ সংঘটিত বাঙালী শ্রমিক বজোর সঙ্গে তুলনা করে তাঁরা বলেন—এই হত্যাকাণ্ড বাঙালী জাতির লজ্জা, কলঙ্ক। পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে নির্ধাতন ও জমি ধ্বংসের ঘটনাও তাঁরা উল্লেখ করেন। সরকারের অসত্য ও পাপ কাটানো বিহুভিতে তাঁরা

কিম্বদন্ত প্রকাশ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্তার সমাধানকল্পে তাঁরা সরকারের নিকট উপজাতিদের ক্ষুদ্র জাতি সত্তা মেনে নিতে এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান। এই লক্ষ্যে তাঁরা সরকারকে দুটি পদক্ষেপ নিতে সুপারিশ করেন—

এক, অবিলম্বে মিলিটারী অপারেশন বন্ধ করে সত্যিকার অর্থে অসামরিক প্রশাসন প্রবর্তন।

দুই, অবিলম্বে উপজাতি নেতাদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্তা নিয়ে সংলাপ শুরু করা।

একই সাপে কলমপতি ইউনিয়নে সংগঠিত ঘণা ও দুঃখজনক ঘটনার প্রতিবার হিসাবে কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁরা সরকারের কাছে দাবি জানান।

এক, পশ্চিম মাচ কলমপতি ইউনিয়নে সংগঠিত হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার ঘান ব বিচার বিভাগী। তদন্ত, বিচার ও ক্ষেতপত্র প্রকাশ।

দুই, দুঃখ উপজাতি পরিবারগুলোর যথাযথ নিরাপত্তা সহকারে পুনর্বাসন।

তিন, বিধ্বস্ত বৌদ্ধ মন্দির পুনর্গঠন।

চার, বিভিন্ন জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শরণার্থী পুনর্বাসন বন্ধ।

পাঁচ, শরণার্থীদের অনতি বিলম্বে ফিরিয়ে নেওয়া।

ছয়, বাজারে অবাধ বেচাকেনা ও পণ্যসামগ্রী একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়া ও পণ্য আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

সংসদ সদস্যরা আরও উল্লেখ করেন যে, দেশের কোথাও জরুরী অবস্থা ভাবি হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামেও না। তাঁরা সরকারকে প্রস্তাব করেন, কোন বৈধ অধিকারে পার্বত্য চট্টগ্রামে আঘোবিত যুদ্ধ চালাতে সরকার বিপুল সংখ্যক মিলিটারি মোতায়েন করেছে।

মিলিটারি গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে তিন সংসদ সদস্যের ঘটনাক্ষলে গিয়ে বক্তৃতা করে মিলিটারি বর্ববতা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এক অর্থে ঐতিহাসিক। কলমপতি গণহত্যার আগে সংগঠিতভাবে সরকারি বা বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধিদল উপজাতিদের দুঃখ অবস্থা দেখতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আসেননি। দেশের অন্যান্য জেলার পুলিশ অত্যাচার, মিলিটারি বর্ববতা এবং প্রশাসনের উদাসীনতার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন জাতীয়

১। তিন সংসদ সদস্য শাহাজান সিদ্দিক, রাশেদ খান মেনন ও উল্লেখ্যলল চাকমার সাংবাদিক সম্মেলন, ঢাকা প্রেস ক্লাব, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮০।

নেতৃত্ব। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে তার চেয়ে বড় ঘটনা ঘটলেও অজ্ঞাত কারণে তা জাতীয় নেতারা খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তিন সংসদ সদস্যের কলমপতি গণহত্যা তদন্ত করতে যাওয়ায় উপজাতিদের মনে সাময়িকভাবে হলেও দ্রুত মনোবল ফিরে এসেছিল। তারা আশঙ্কিত হয়েছিল দেশের সচেতন ও বিবেকবান মানুষ তাদের স্বাধীনতা, আনন্দ বেহনার সাথী। এই অসুস্থতা আগাতে পারার মূল্য ও গুরুত্ব অপরিণামী। দীর্ঘদিন সরকারী বৈষম্যনীতি, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর এক শ্রেণী লোকের বৈরিতা ও শেষে মানবতাবাদের জীবনযাপন করা উপজাতিদের মনে এই ধারণা দৃঢ়ভাবে শেকড় গেড়েছিল যে, তারা একা। সংসদ সদস্যরা এই অমূলক অবিশ্বাস, ঘৃণা ও ভয় কিছুটা দূর করতে পেরেছিলেন। তাই দেখা যায়, যেখানে মিলিটারি ধরনের তাওবসীলা চালিয়েছে, যেখানে গেলে গুলি করা হবে বলে শাসনো হয়েছিল, সংসদ সদস্যদের হাত ধরে সেই জায়গাগুলোতে যেতে তারা ভয় পায়নি।

দুঃখজনক হলেও এটা সত্য, জাতীয় মূলধারা থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উপজাতিরা কলমপতি গণহত্যার পর যে ধরনের সাদা জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিল, তা তারা পায়নি। ধর্মীয় রাজনীতিতে বিভাগী মুসলিম লিগের সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীও ঘটনা হলে গিয়ে গণহত্যার তীব্র নিন্দা ও খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইলেন, কিন্তু প্রগতিশীল, ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সববৃহৎ বিরোধী দল আওয়ামী লিগ নিজস্ব সংসদ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে পাঠাতে পারেনি। জাসদ, ওয়ার্কাস পার্টি এবং মুসলিম লিগের একটি অংশ যে ধরনের উদ্বোধন নিয়েছিল, তার চেয়ে বড় ভূমিকা উপজাতি জনগণ আশা করেছিল গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যবাহী সংগঠন আওয়ামী লিগের কাছ থেকে। অথচ তিনটি বিরোধীদলের সমন্বিত ভূমিকাও আওয়ামী লিগ নেয়নি।

সংসদে কলমপতি গণহত্যার তদন্ত চাইল না। ঘটনার নিন্দা করে সাদামাটা একটা বিবৃতি দিল শুধু। তিনটি বিরোধী দলের সমান ভূমিকা যদি আওয়ামী লিগ নিত, তাহলে কলমপতি ইউনিয়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মনে যে গুস্তকিয়া হয়েছিল, তা আরও ব্যাপক, গভীর ও স্থায়ী হত। উপজাতিদের দুর্ভাগ্য, জাতীয় মূলধারার সঙ্গে একাত্মবোধ গড়ে ওঠার মত সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পরও অধিকাংশ জাতীয় দল তার বার্ষিক গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। সবচেয়ে বিষয়কর হচ্ছে, দেশের অন্ততম প্রধান দুটো প্রগতিশীল রাজনৈতিক

এল জাপ ও সি. পি. বি'র নীরব ভূমিকা। কঙ্গমণ্ডি গণহত্যার তদন্ত ও বিচার দাবিতে এই দুটি দলের জোরালো ভূমিকা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা পালনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে হল দু'টি।

সংসদের ভেতরে এবং বাইরে কঙ্গমণ্ডি গণহত্যা নিয়ে সোরগোল ওঠার পর প্রেসিডেন্ট জিয়া এই হত্যাকাণ্ড কেন হল, তা তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটিতে বিরোধীদল কিংবা উপজাতি নেতাদের নেওয়া হয়নি। বলাবাহুল্য, তদন্ত কমিটি কোন রিপোর্ট পেশ করেনি। হত্যাকাণ্ডে জড়িত সামরিক ব্যক্তিদেরও কোন বিচার হয়নি।

আশির ডিসেম্বরে জিয়া সরকার সংসদে 'দুর্গত এলাকা বিস উনিশ শ আশি' পাশ করিয়ে নেয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও গণহত্যা চালানোর বৈধ রাস্তা তৈরী হয়। এই আইন অনুসারে পুলিশের সাব ইনসপেক্টর বা মিলিটারিয় এন, সি, ও (নন-কমিশন অফিসার) যে কোন ব্যক্তিকে বেআইনী কার্ফজলাপে লিপ্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার কিংবা গুলি করার নির্দেশ দিতে পারবে। এই আইনের ক্ষমতা বলে নেওয়া কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যাবে না। পুলিশ এবং মিলিটারি যে কোন বাড়িতে তল্লাশী চালাতে পারবে। অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হয় সন্দেহে যে কোন বাড়ি পোড়াতে এবং জরি ক্রোক করতে পারবে। বিরোধী সংসদ সদস্যরা এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন। সরকার স্বীকারও করেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র কর্মকাণ্ড দমন করতে বিলটি উত্থাপন করা হয়েছে। সংসদ সদস্য উপেন্দ্র লাল চাকমা সরকারি বক্তব্যের উপর মন্তব্য করে বলেন, 'খুলির বেড়াল বেড়িয়ে পড়েছে। এটা এখন পরিষ্কার যে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বা সমূহের সমস্যার সমাধান গণহত্যার মাধ্যমেই করতে চায়।'^১

১৯৮১ সালের ২৮শে এপ্রিল, দুর্গত এলাকা বিলের গুণন লগুনের 'পার্ডিয়ান' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'that the army and Police would be immune from challenge in the Courts and could enter any premises without warrant. For the Paramilitary opposition the Act was seen as sanctioning violation of human rights. Such legislation is indeed extraordinary since even legislation

১। আউতুল আলম, বাংলাদেশ লুটে অন সাইট বিল, দি পার্ডিয়ান, লন্ডন, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৮১।

enacted in war time, such as the Defence of India Rules passed during the second world war or the Defence of Pakistan Rules promulgated during 1965 do not provide such powers of shooting to kill as are provided under the proposed Disturbed Areas Act'

সরকার যে তাই চায়, তার প্রমাণ মিলে একাধির ২৬শে জুন। এটো দিন মিলিটারি ছত্রছায়ায় একশ্রেণীর সত্ত্ব পুনর্বাসিত এগাব মাইল বিস্তৃত উপজাতি এলাকায় হাজা লাগায়। তিনদিন ব্যাপী চলে নারকীয় উৎসব। পুড়ে ছাই হয় বনবাট বাড়ি, বেলতলি ও বেলজড়ি গ্রাম। মারা যায় পাঁচশ নির্দোষ নিরীহ নিবন্ধ উপজাতি নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ। হাজার হাজার গৃহহীন উপজাতিব অধিকাংশ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বাকিরা পালিয়ে যায় পতীর অরণ্যাকূলে। পুনর্বাসিত শরণার্থীরা দখল করে নেয় উপজাতিদের জমি। একই সালে উনিশে সেপ্টেম্বর মিলিটারি, সীমান্ত রক্ষাবাহিনী ও পুনর্বাসিত শরণার্থীরা একাংশ সম্মিলিতভাবে খাগড়াছড়ি মহকুমার ফেনী উপজাতিব পয়ত্রিশটি উপজাতি গ্রামে হামলা চালায়। অসহায় উপজাতি নিহত হয় হাজারের উপর। প্রাণভয়ে হাজার হাজার উপজাতি আশ্রয় নেয় ভাবতের ত্রিপুরা রাজ্যে। শরণার্থী (রিফিউজি) ক্যাম্পে কলেরা ও আমাশয রোগে মারা যায় আরও কয়েকশত শিশু। ভারত সরকার শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে জিয়া সরকারকে অনুরোধ করে। প্রতিবারের মত এবারও সরকার ভারতে শরণার্থী যাওয়াব কথা অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উপজাতি জনগণের উপর নৃশংস অত্যাচারের খবরের সত্যতা অস্বীকার করে প্রতিবাদ জানায় সান্তাব সবকাণ। অবশেষে সংবাদপত্র, মানবিক অধিকার সংক্রান্ত সংস্থা, দেশ ও বিদেশের বিবেকমান জনগণের চাপে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। দেশে ফিরিয়ে আনে আঠার হাজার শরণার্থী। সীমান্ত পার হওয়ার পর সরকারী কর্মীচরীরা উপজাতি পরিবার শিছু আট মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ টাকা দিয়ে উপজাতিদের ছেড়ে দেয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে। নিজেদের আয়গায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাদের জমি জবরদখল হয়ে গেছে। বর্তমানে হাজার হাজার ভিন্নমূল উপজাতি অনাহারে, অনশ্বে, সরকারি যন্ত্রে অনবরত হয়রানিতে নরকবন্যায় জর্জরিত।'

১। খি. ফিফটি বাংলা টাইমেলস কন্ট্রি টাইং টু এন্টোর টিপদ্রো, কি টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৯শে জুন, ১৯৮১।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে মিলিটারি অপারেশন এবং জমি জবর দখলের কলে গভীর অরণ্যাকূলে আশ্রয় নেওয়া হাজার উপজাতি পরিবার গাছের শেকড় এবং লতাশাড়া খেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন শহর এলাকার বাইরে অত্যাধিকারী পণ্য যেমন চাল, ডাল, লবন, কেরোসিন, কাপড় এবং ঔষধপত্র নেওয়ার উপর সাময়িক কর্তৃপক্ষ কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পরিবার পিছু প্রতি সপ্তাহে চুই কিলোর বেশি চাল গ্রামের উপজাতিরা কিনতে পারে না। সাধারণতঃ একটি পরিবার ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত। নির্ধারিত চাল পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব প্রকট। বাজার থেকে ঔষধপত্র কিনে গ্রামে নেওয়ার জন্য বিশেষ পারমিট সংগ্রহ করতে হয়। উপজাতিদের বেশ কয়েক মাইল হেঁটে সরকারি অফিস হতে এই পারমিট সংগ্রহ করতে হয়। পার হতে হয় সরকারি অফিসে যেতে তাদের অনেকগুলো পুলিশ এবং মিলিটারি চেক পোস্ট। চেক পোস্টগুলোতে পুলিশ ও মিলিটারিরা উপজাতিদের স্বাক্ষরভাবে নাজেহাল করে। শুধু হয়রানি নয়, তাদেরকে অনেক সময় আটক রাখা থাকে। জল কিংবা খাবার দেওয়া হয় না। বস্তুতঃ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দৈনন্দিন অত্যাধিকারী দ্রব্যাসামগ্রী ক্রয় করা থেকে উপজাতিদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। ঔষধের অভাবে গ্রামাঞ্চলে মহামারী আকারে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

চট্টগ্রাম থেকে ত্রিপুরাতে শরণার্থী বাড়ছে, আনন্দবাজার, ৩০শে জুন, ৮১, রিফিউজ ইনস্ট্রাকশন ইন ত্রিপুরা, অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩০শে জুন, ৮১, এন্ড ট্রাইবাল ইনস্ট্রাকশন বাংলা টোলড, দি টাইমস অব ইন্ডিয়া, দিল্লী, ৩রা জুলাই, ১৯৮১।

ট্রাইবাল ম্যাসাকার ইন চিটাগাং, অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১ই জুলাই, ৮১, দি টাইমস অব ইন্ডিয়া, একজেকিউশন, দি টাইমস অব ইন্ডিয়া, দিল্লী, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ৮১।

বাংলা হিল্ড এরিয়া ডেথ রোল ৫০০ নো ইন্ডিয়ান হেল্ড ইন বাংলা ইনসিডেন্ট, দি টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

মোর ইনস্ট্রাকশন অব ট্রাইবেলস, দি টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ৮১।

এই সব ক্ষেত্রে মনে হয়, সকল প্রকার অমানবিক প্রক্রিয়ার পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জন-গোষ্ঠীসমূহ বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে সাময়িক সরকার বন্ধ পরিকল্পনা।^১

সরকারি একরোখা নীতির সাথে তাল রেখে উপজাতিদের ভাষাও যেন বারবার বিখাসঘাতকতা করেছে। সরকার যখন তার উপজাতি নীতি পূর্বমূল্যায়ন ও রক্তপাতের অবগান ঘটরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে উপজাতি সমস্যা মীমাংসার পথ খুঁজছে, সারা দেশের রাজনীতিতে বিপর্যয় নেমে এসেছে তখন। পঁচাত্তরের পনের আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে জাতীয় রাজনীতি ভুবে গিয়েছিল অস্থিতিশীল ও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। পরবর্তীকালে জেনারেল জিয়া স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার আশ্রয় চেষ্টা করেন। কিছুটা সফলও হন। সৌমিত্র আকারে হলেও তাঁর আমলে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। জিয়া মারা যাবার কয়েকমাস আগে তার এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'মনে হয়, আমবা তুল পথে চলেছি। আমরা উপজাতিদের প্রতি অসন্তুষ্ট করছি, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান পুলিশ ও মিলিটারির অগারেশন দিয়ে করতে চাইছি। রাজনৈতিকভাবে বোধ হয় এই সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। উপজাতিদের জমি কোড়ে নিয়ে তাদের কোণঠাঙ্গা করার সঠিক হুক্তি আমাদের নেই, অন্যদিকে আমাদের উচিত উপজাতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা করে জেনে নেওয়া, তারা কি চায়।' প্রেসিডেন্ট জিয়াও হয়ত উপজাতি সমস্যা নিরূপণে এত্বের বিকল্প কোন পনক্ষেপ নেওয়াও কথা ভাবছিলেন। জিয়া উপজাতি নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে শান্তি বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার

১। ম্যালোরিয়া ডেব্‌স, দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৯শে এপ্রিল, দিল্লি ৮১, ম্যালোরিয়া ডিক্‌টিমস, দি টাইমস্‌, ওরা অক্টোবর, লন্ডন, ১৯৮০, ম্যালোরিয়া ডেব্‌স, দি গার্ডিয়ান, ওরা অক্টোবর, লন্ডন, ১৯৮০, সুনন্দ কে দত্ত রায়, চিটাগাং বুদ্ধিস ফিয়ার ডেব্‌ ইন দি জংগল, দি অবজার্ভার, লন্ডন, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮০। রবিন লাস্‌টিগ্‌, ট্রাইবস ফেস জেনসাইড, দি অবজার্ভার, লন্ডন, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৮০, প্যারিস কীটলী, জেনসাইড পলিসি এ্যালেকজেন্ড ইন বাংলাদেশ, দি গার্ডিয়ান, লন্ডন, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮০।

২। পিটার নিসওয়াল্ড, দি গার্ডিয়ান, ২৯শে জুলাই, ১৯৮১ লন্ডন।

প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। আলোচনা কি ভিত্তিতে হবে, তা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সংলাপ বিনিময় হচ্ছিল। এমনি যুদ্ধের্তে জিয়া নিহত হন। সৃষ্টি হয় আরও একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। জিয়ার অল্পমত লৈঙ্গরা চট্টগ্রামের সামরিক অভ্যুত্থান হয়নে সফল হয়। ঘটনার অব্যবহিত পর রাষ্ট্রপতির স্বাগতম পূরণ করতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অল্পমতি হয়। জিয়ার প্রতিষ্ঠিত হল বাংলাদেশ জাণানালিস্ট পার্টির বিচারপতি আবহুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। উশজাতি জনগণ আশ্বস্ত হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্তা নিয়ে প্রস্তাবিত আলোচনা ষথাসময়ে অল্পমতি হবে। কিন্তু হল না। হল আবার একটি সামরিক অভ্যুত্থান। আবার সেই খাড়া বড়ি খোর, খোর বড়ি খাড়া। স্বমহার পালা বদল আর জনগণের দুর্দশাবৃদ্ধি। গণতান্ত্রিক আবহাওয়া কিয়ে আসতে এক পা এগোয়, তিন পা পিছোয়।

স্বাভাবিক জীবনের মত রাজনীতিতেও হত্যার অল্পপ্রবেশ নিন্দাহ'। নিরস্ত সাধারণ অল্পজাতি শরণার্থী গ্রামগুলোতে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র হামলা চরম নিন্দনীয়, তেমনি সমভাবে নিন্দনীয় মিলিটারির দেওয়া অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একশ্রেণীর শরণার্থীর নিরীহ উপজাতি গ্রামগুলোতে নৃশংস আক্রমণ চালানো। সামরিক সরকার যেমন সমস্তা সমাধানে খোলামেলা আলোচনার চাইতে অস্ত্রের উপর বেশী জোর দিয়েছে, তেমনি শান্তি বাহিনীকেও ঠেলে দিয়েছে উত্তরোত্তর অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হতে। শান্তি বাহিনী কোন সময় সামরিক ছাউনিতে, ইদনোং বেশি সময় শরণার্থী গ্রামগুলোতে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে কিয়ে যাচ্ছে তাদের গোপন ষাঁটিতে। সামরিক বাহিনী পান্টা ব্যবস্থা হিসেবে একশ্রেণীর শরণার্থীদের দিয়ে উপজাতি গ্রামে চালাচ্ছে সশস্ত্র আক্রমণ। এতে মারা যাচ্ছে উভয় সম্প্রদায়ের নিরস্ত্র নিরীহ শত শত মানুষ। শান্তি বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর ভুলের জন্ত এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আরেক সম্প্রদায়ের তুণা, অবিশ্বাস দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন সরকারের উপর্যুপরি তুলনীতির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্তা বর্তমানের নাজুক অবস্থায় এসে পৌঁড়িয়েছে। এম, কিউ, জামানের ভাষায়, 'given the freshness and intensity of the struggle for her own antonomy, right to self-ruler, right to educate in her own language and right to free herself from domination by outsiders, it is striking that successive political regime in

Bangladesh has proved to be less responsive in some of those areas in case of tribal ethnic minorities'.¹

এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান জনবিশ্বাসের দিকে তাকানো যাক। জেলাব জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সাতচল্লিশ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপজাতির সংখ্যা ছিল ২%। একাল্পতে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২%। সরকারি উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণবাসন দেওয়ার ফলে জেলাব জনসংখ্যার পুনর্বিত্তাস কি দাঁড়িয়েছে, তা নিম্নের পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যাবে।

সারণী-১

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান (হাজারে)

পূর্ব পাকিস্তান পরবর্তীতে বাংলাদেশ									
১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	
২৮২২৮	৩১৫৫৫	৩২২৫৫	৩৫৬০২	৪১২৩১	৭১২৩১	৫০৮৪০	৭১৪৭২	৮	০৫২

পার্বত্য চট্টগ্রাম

১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	
১২৫	১৫৪	১৭৩	২১৩	২৭৭	২৮৮	৩৮৫	৫০৮	৭৪৫	

সারণী-২

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি ও অনুপজাতির জনসংখ্যার হিসাব-

	১৯৭৪	১৯৮১
উপজাতি	৩,৭১,৪৫৩	৩,২২,২২২
অনুপজাতি	১,৫৬,৫৬৭	৩,০৬,০০১
মোট	৫,০৮,০০০	৭,৪৮,০০০

সূত্র—1980 and 1981 statistical year Book of Bangladesh (A Government of Bangladesh publication), Dhaka.

1. M.Q. Zaman, *tribal survival in the chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, *Man in India*, vol. 64 (4)-page-78.

অধিকাংশ উপজাতি বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন সরকার প্রদত্ত পরিসংখ্যান নিচু ল নয়। পরিসংখ্যানে শরণার্থীদের সংখ্যা কম দেখানো হয়েছে। যেমন কম দেখানো হয়েছে উপজাতিদেরও। তাঁদের অভিযোগ, কয়েক হাজার উপজাতি পরিবার বাধ্য হয়ে নিজদেশের বাস্তুভিটা ছেড়ে দেবার পরেই এই পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে। তদুপরি ইচ্ছাকৃত ভাণ্ডার বাদ দেওয়া হয়েছে উপজাতি জনসংখ্যার একটা অংশকে। তাঁরা নিজদেশের উদ্যোগে জরীপ চালিয়ে উপজাতি জনসংখ্যার একটা পরিসংখ্যান তৈরি করেছেন এবং তাতে দাবি করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতির সংখ্যা প্রায় ছ' লাখ। সেই সঙ্গে সরকারের কাছে তাঁদের দাবি, পরিসংখ্যানে যে সব উপজাতি বাদ পড়েছে, তাদের তালিকাভুক্ত করা ও যারা প্রাণভরে গভীর অরণ্যস্থলে পালিয়ে আছে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সাময়িক আশ্রয় নিয়েছে, তাদের যথাযথ নিরবশ্রম ব্যবস্থা করে ফিরিয়ে আনা। কত লোককে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়েছে, তারও সঠিক পরিসংখ্যান তাঁরা সরকারের কাছে দাবি করেন। তাঁদের মতে পুনর্বাসিতদের সংখ্যা ৭ থেকে ৮ লক্ষ।

উপজাতিদের তৈরী জনসংখ্যার পরিসংখ্যান নিয়ে সন্নিবেশিত করা হল।

সারণী—৩

১৩টি সম্প্রদায়	ধর্ম	জনসংখ্যা
চাকমা	বৌদ্ধ	৩,৫০,০০০
মারমা	বৌদ্ধ	১,৪০,০০০
ত্রিপুরা	হিন্দু	৬০,০০০
খুচিয়া	বৌদ্ধ	৫,০০০
ম্রো	প্রকৃতি-পূজারী	৩৫,০০০
রিয়াং	প্রকৃতি-পূজারী	
খুমি	প্রকৃতি-পূজারী	
চাক	বৌদ্ধ	
মুকং	প্রকৃতি-পূজারী	
রিয়াং	বৌদ্ধ	
বনবোঙ্গী	প্রকৃতি-পূজারী	
পাংকো	প্রকৃতি-পূজারী	
লুসাই	খ্রীষ্টান	

১৯০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ছিল ১,২৫০০০। ১৯৫১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২,৮৮,০০০। অর্থাৎ বছরে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১,৬৩,০০০। অথচ ১৯৮১তে জেলার জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৭,৪৬,০০০। ১৯৫১ থেকে ১৯৮১— এই তিরিশ বছরে মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে ৪,৬৮,০০০। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ১৫২। সেই একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ স'ল, এই তিরিশ বছরে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ১০৭। তাই দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিন দফার পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে, এই ভিত্তিতে কাজ শুরু করা হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার কাজ শেষ হয়েছে ১৯৮১ সালের মাঝামাঝি। তৃতীয় দফার পুনর্বাসন কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ১৯৮৩ সালের মধ্যে। কতজনকে পুনর্বাসন করা হল, তার প্রতিয়ান সরকারিতবে এখনও পাওয়া যায়নি। তবে পূর্বোল্লিখিত সারণী দুটোতে সরকারি উদ্যোগে অস্থপজ্জাতি পুনর্বাসন বৃদ্ধির জ্যামিতিক হার দেখে অনেক উপজাতি নেতা অসুমান করছেন যে, তাঁরা নিজস্বমে পরবাসী হয়ে বাবেন। মর্যাদাপূর্ণ জীবনের দাবি জানিয়ে তাঁদের যে কঠোর এক সময় জোরালো ছিল তা একসময় ক্ষীণ হতে হতে হারিয়ে যাবে অনন্তিমের অতলাস্তে।

তাহলে কী পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থপজ্জাতি অনন্তিমপ্রত? এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভবতঃ পাওয়া যাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীতের দিকে তাকালে। মোঘল সাম্রাজ্যের সময় থেকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অরণ্যক্ষেত্রে সমতলবাসীদের প্রবেশ শুরু হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করার পর এই জেলাকে নন-রেগুলেটেড এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে। নন-রেগুলেটেড জেলা হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার আগেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জমির মালিকানা ছিল না। তাদের সামাজিক ও জীবন ধারার নিজস্ব চঙে তারা যেখানে সুবিধা চাব করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু হয়েছিল শুধু মাত্র রেগুলেটেড জেলাগুলিতে। সারা দেশের আইন-কানূনের শক্তির মধ্যে থাকলেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষত সব সময়ই ব্রিটিশদের তৈরী পৃথক বিধিরও ব্যবস্থা ছিল, যাতে করে উপজাতিরা আধুনিক আইনের সঙ্গে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি লার্কেলের সীমানা চিহ্নিত ও তিন রাজ্যের আসন ও মর্যাদা যির হওয়ার পর, তিন রাজ্য নিজ নিজ লার্কেলে কৃষি কাজের জন্য বিভিন্ন সময়ে সমতল এলাকা থেকে অস্থপজ্জাতি চাবী নিয়ে আসতেন। কারণ

উপজাতিরা সমতল জমির চাষ ভাল বুঝত না। তৃহণির সমতল এলাকা থেকে আনা চাষীরা ছিল তীব্র পরিশ্রমী। অভিজ্ঞতা এবং পরিশ্রম মিলে উৎপাদন হত ভাল। সাধারণত প্রতিবেশী জেলা চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী থেকে এই ধরনের চাষীদের আনা হত। তারা বাড়ি করার মত জায়গা পেত। অনেক সময় উপজাতিদের জমি, দীর্ঘদিন যে জমিতে উপজাতিরা চাষ করেছে, তারা বর্গাপ্রদায় চাষ করত। রাজাদের কাছ থেকে তারা, কোন কোন ক্ষেত্রে, নিজেরাও চাষ করার জঙ্গ জমির যজুরি পেত। মালিকানা স্বত্ত্ব না থাকতে রাজারা ইচ্ছে করলে তাদের তুলে দিতে পারতেন। বিভিন্ন সময়ে চাষবাসে সাহায্য করার জন্য সমতল এলাকার চাষীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আসাটা উপজাতিদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। ব্রিটিশ শাসনকালেও চাকরি বা ব্যবসার কাজে অনেক অসুপজাতি এই এলাকায় আসতেন। কিছু পরিবার আবার স্থায়ী ভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে এই জেলায় থেকে যেতেন। নন-রেজিস্টেড জেলা হওয়াতে বহিরাগত অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন, এমন কেউ এই জেলায় জমি কিনতে পারতেন না। কিছু বসবাস করার মত ভিটেমাটির যজুরি তাঁরা পেতেন। বেউ আবার অসুস্থতি না নিয়েও ঘরবাড়ি তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেন। পাকিস্তান আমলেও এই প্রক্রিয়ায় অনেক সমতলবাসী অসুপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। তখন তাদের সঙ্গে উপজাতিদের কোন সংঘাত বাঁধেনি। সৌহার্দ্য-পূর্ণ পরিবেশও তাই বজায় ছিল। সংঘাত বাঁধে বিভিন্ন জেলা থেকে সরকারি উত্থোমে ব্যাপকহারে লোক এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন, উপজাতিদের ভাষায় অসুগ্রবেশ শুরু হয় বরন।

দীর্ঘদিনের বিবর্জন ও আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে উপজাতিরাও সরকারের কাছ থেকে নিজ নিজ জমির সীমানা চিহ্নিত করে মালিকানা স্বত্ত্ব নিয়ে নিলেছে। উপজাতিদের বিখাগ, তারা একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অংশ। তাদের এক সময় বিরাট সাম্রাজ্য ছিল। বিভিন্ন সময়ে বৃহৎ, দ্বিবিভক্ত ও গৃহ বিগ্ৰহের পরিণামে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। তাদের বিখান্দ কতটুকু সত্য নির্ভর, তা প্রমাণ করতে প্রচুর গবেষণার অবকাশ রয়েছে। উপজাতিদের ক্ষেত্রে, তারা পাঁচশ বছর আগেও বর্তমানের টেকমাক, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত একটি দেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম জনগণ ছিল। বালকসে তারা বিভিন্ন জাতির কাছে পরাজিত হয়ে শিষ্ট হুঁতে বাধ্য হয়েছেন।

পিছু হটতে হটতে তাদের পিঠ আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে একটি জেলায় এসে ঠেকেছে। কয়েক শ বছরের অভিজ্ঞতায় তাদের চেতনায় ঘটেছে পরিবর্তন। তারা আর পিছু হটতে রাজী নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামকে তারা মনে করে, তাদের মাতৃভূমির শেষাংশ। তাদের যাবার মত কোন জায়গা আর নেই। মাতৃভূমির শেষাংশ যে কোন মূল্যে তারা আঁকড়ে থাকতে চায়। সেই শেষ বিক্ষুব্ধতা এখন, তাদের ভাবার অহুপ্রবেশ ঘটানো হয়, তখন উপজাতিরা স্বাভাবিক কারণে আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পাল্লাবদলে বিভিন্ন দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও, যে দেশের নাগরিক, সেই দেশের সরকার যেমন তাদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকেরও মর্যাদা দেয় নি, তেমনি উপজাতিরাও পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া দেশের অন্য কোন অংশ তাদের মাতৃভূমি বলে মানতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তাই দেখা যায়, স্বাধীনভাবে বসবাস ঘুরের কথা, কর্মক্ষেত্রেও যদি উপজাতিদের ভিন্ন জেলায় বদলি করা হয়, তাহলে তারা ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ করে। অসন্তুষ্ট হয়। অংশ এই মনোভাব ধীরে ধীরে কাটিছে। এমন একটা মানসিকতা গড়ে ওঠার জন্য উপজাতিরা এককভাবে ঝাড়ো নয়। দ্বা.বি. বিভিন্ন সরকারের উপজাতি স্বাধীনতার নীতিও।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ, তাদের শেষ আশ্রয় ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য কোন জনগোষ্ঠীর আধিপত্য সহজে মেনে নিতে চায় না। তারা মনে করে, তাদের মাতৃভূমিতে তাদের নিরঙ্কুশ অধিকার থাকবে। সেই অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে বলে এখন তাদের মনে হয়েছে, তখন তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কেন এই প্রতিবাদ, কারণ কেন বিদ্রোহ করে, তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে টি. আর. স্তার তাঁর 'হোয়াই মেন রেবেল' গ্রন্থে লিখেছেন, When an established socio-political order is suddenly put into disorder by any external thrust, resistance is inevitable no matter how simple or complex the society affected might be'.^১

কথাটা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

১। টি. আর. স্তার, হোয়াই মেন রেবেল, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৭০, ডি, সি, ডেভিস (সম্পাদিত), হোমেন মেন রেভল্ট এ্যান্ড হোয়াই, লন্ডন ফ্রি প্রেস, ১৯৭১।

তাই দেখা যায়, উনিশশ বাহান্ন থেকে আজ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রামের লক্ষ্যণ্য সমাধান সম্ভব কিভাবে, বিভিন্ন সময়ে উপজাতি নেতারা (এমনকি সরকার পক্ষীয় উপজাতি নেতারাও) বিভিন্ন সরকারের কাছে যে দাবি বা সুপারিশ পেশ করেছেন, তন্মধ্যে পুনর্বাসন বন্ধ করা, পুনর্বাসিতদের প্রত্যাহার ও জবরদখলকৃত জমি পূর্বতন মালিকদের ফিবিয়ে দেওয়া, এই তিনটি দাবি সবক্ষেত্রেই প্রধান দাবি হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক পুনর্বাসনই হচ্ছে উপজাতিদের অসন্তোষের প্রধান কারণ। আর এই অসন্তোষ পূর্জি করে গঠিত হয়েছে কতিপয় উপজাতির মঙ্গল সংগঠন শান্তি বাহিনী।

শান্তি বাহিনী

উনিশ শ হেবটির পরলা মার্চ ভারতের মিজোরামের একদল মিজো বিদ্রোহ-
 ঘোষণা করে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন মিজো ক্রাশানাল ক্রুটের প্রধান লালডেঙ্গা।
 বিদ্রোহীরা ভারতের পতাকা পুড়িয়ে কেলে। ভারতের সঙ্গে মিজোরামের সব
 রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে দেয়। পুলিশ এবং আধা-সামরিক বাহিনীর
 সব চৌকি দখল করে মিজোরামের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়। কিন্তু তার স্থায়িত্ব
 ছিল মাত্র কয়েকদিন। ভারতের সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের দমন করতে সক্ষম
 হয়।^১ বিদ্রোহের নেতা এবং বিদ্রোহীরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য
 চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। পাকিস্তান সরকার বিদ্রোহীদের শুধু আশ্রয় নয়,
 পেরিলা যুদ্ধে দক্ষ এবং শিক্ষিত করে তোলার জন্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে
 কয়েকটি গোপন প্রশিক্ষণ শিবিরও খুলেছিল।

কুকিদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের জমগোঞ্জী, বিশেষ করে চাকমা সম্প্রদায়ের
 বহুগুণ আগে দ্বন্দ্ব এবং সহিংস সংঘর্ষ হয়। চাকমা ছড়া এক ইতিহাসে
 কুকিদের সঙ্গে সংঘর্ষের অনেক ঘটনা বিবৃত রয়েছে। কুকি এবং মিজো একই
 গোত্রভুক্ত। যদিও নামে আলাদা। চাকমারা মনে করে, কুকিরাই পরে মিজো
 নামে পরিচিত হয়েছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে মিজো এক চাকমা, দুই
 সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান কাজে লাগিয়েছিল।
 পাকিস্তান সরকারের প্ররোচনায় মিজোরা বেশ কয়েকটি চাকমা গ্রামে সশস্ত্র হামলা
 চালায়। হেবটির পর দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার সংঘাত বাঁধে।
 কখনও তা সহিংস রূপ নিয়েছিল। মিজো এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের
 সমস্তর প্রকৃতি মূলত এক হলেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন উপজাতি সম্প্রদায়ের
 সঙ্গে মিজোদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। মিজোরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপ-
 জাতিদের প্রায়ই বলার চেষ্টা করত যে, আমরা যদি দেশে ফিরে যেতে না।

১। ডি. আই. কে সারিণ, ইন্ডিয়ান নর্থ ইস্ট ইজ ইন্ ফ্রন্ট, ভারত-
 পাকিস্তান, দিল্লী, ১৯৮২, পৃঃ ১৯৮।

পাত্রে, তাহলে পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি হত পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা পুনর্বাসিত হবে। জাতিগত ভাবে তাদের হত, জিরেতো—বর্মী হংগোলীয় বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা মিজোদের উপস্থিতি এবং কথাবার্তা ভাল চোখে দেখে নি।

ছেষটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি জনকল্যাণ পরিষদ’ নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে ওঠে।^১ সংগঠনটি গোপন হলেও, দাবি আদায়ের সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। একই সালে ভারতের বিরোধী মিজোদের মধ্যে উপজাতি যুব সশস্ত্রদায়ের একটা অংশও অল্পরূপ সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

বীর্ঘদিনের শেষ বকনায় এমন একটা চরম মানসিকতা উপজাতি জনগণের একটা অংশের মনে জেগে ওঠা যুব স্বাভাবিক ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক অবস্থা এতটা হতাশজনক ছিল যে, উপজাতিরা জেলার সর্ব স্তরে দ্বেষভ, তারা অধঃস্তর এবং অল্পজাতিরা উদ্ধর্ভন। মাইরণ গুয়েনার বিশেষ একটা অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে বা বলেছেন, তা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর করলে দাঁড়ায়, শিক্ষক অল্পজাতি, ছাত্র উপজাতি। ডাক্তার অল্পজাতি, রোগী উপজাতি। উকিল অল্পজাতি, মহেল উপজাতি। দোকানদার অল্পজাতি, ক্রেতা উপজাতি। সরকারি কর্মকর্তারা অল্পজাতি, আবেদনকারী উপজাতি। তহুপরি জেলার সরকারি প্রশাসনে নিয়োজিত বড় কর্মকর্তাদের কেউ কেউ সেই মানসিকতা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসন চালাতেন, যেমনটি করতেন ব্রিটিশ অফিসাররা ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন জেলা-জলোতে। বিরাট আশাঃজাসিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলেও, এই অবস্থার বড় একটা ভারতমা হয়নি।

বিগত কয়েক দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আর ও শোণাসত রাশকাট্টিতে না হলেও শিক্ষা ও চেতনায় উপজাতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। বহুগত ভাবে মধ্যবিত্ত হওয়ার অনেক আগে চিন্তা চেতনায় এই শ্রেণী মধ্যবিত্ত হয়েছিল পূর্বেই। এই শ্রেণী দেখানে পৌঁছতে চাইল, বা এতদিন তাদের ধরাইয়ারা যাইয়ে ছিল। সাধারণ উপজাতিদের ও তারা সচেতন করা শুরু করে। দ্বন্দ্বত, মধ্যবিত্ত এই শ্রেণী

১। অঙ্গকলন মহাধের স্টপ জেনারাইড ইন চিটালং ছিল স্ট্যাকটন, অক্টোবর-১০, কলকাতা, পৃ. ১২।

উপজাতিদের বোঝাতে সমর্থ হয় যে, সরকারি উপজাতি নীতির বিরুদ্ধে ও নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন সংগঠিতভাবে না লড়লে তাদের চিরদিন জাতি নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। শোষণ ও নিপীড়ন তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবে। নিজেদের পায়ে শক্তভাবে না দাঁড়ালে তাঁরা একদিন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি জনগণ নতুন প্রেরণা লাভ করে। তারা নিজেদের সম্পর্কে সচেতন এবং ভাগ্যোন্নয়নে সচেষ্ট হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে উপজাতি জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। উনসত্তর-সত্তরে তারা একজন নেতা পেয়ে যায়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে তারা তাদের জীবনের আকাশে পুঞ্জীভূত দুর্দশার কালো মেঘের বহলে আশার সোনালী স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কিন্তু সেই স্বপ্ন যে ভয়ংকর এক ঝড়ে তখনই হয়ে যাবে, তা তারা তখনও জানত না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে সত্তর সালের বোলই যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান রাজ্যটি কোট তখন ছিল নির্দানবীণ। উনসত্তরের গণ অস্থাপনের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য নির্দানের কাজ কয়েক মাস পরিত্যক্ত ছিল। নির্মিয়মান কোর্ট বিজি-এর চারপাশে তখন দুই মাসব্যব সমান উঁচু ঝোপঝাড়। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর বসেছিল সেই গোপন সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্ত, অমিয় সেন চাকমা, কানি মাখব চাকমা ও পংকজ বেগরান। সেই গোপন সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, উপজাতিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন, তা সংরক্ষণ এবং বিকাশের মাধ্যমে তাদের (উপজাতিদের) অবলুপ্তির থেকে রক্ষা করার লক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ও সর্ব শ্রেণীর উপজাতি সম্মুখীন ভিত্তিক একটি আঞ্চলিক দল গঠিত হবে। যদিও দলের নামকরণ সেই মুহূর্তেই হয়নি তবুও বলা যেতে পারে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' সেই গোপন সভার কলঙ্কিত। পাঁচজন যুনেতা যখন এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন, তখন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অধিকার আন্দোলনের ঝড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পাড়াবাঁশাসক শোষণ গোষ্ঠীর গদী টলটলানমান। বস্তুতঃ, সারা পাকিস্তান তখন আপামর জনগণের সর্বদা পুষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলনে আন্দোলনে অশান্ত, উদ্বেল হয়ে উঠলেও, সেই জাতীয় আন্দোলনে উপজাতিদের বক্তব্যবৃৎ অংশগ্রহণের বড় ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগ বা পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন, না জাতীয় নেতারা, না উপজাতি নেতারা, কেউ কারো সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। সর্বশ্রেণীর এবং সর্ব সম্প্রদায়ের উপজাতিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক হল গড়ার এত উপযুক্ত ক্ষেত্রও পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন ছিল না। সম্ভবতঃ তাই পাঁচ হুৎ উপজাতি নেতা শুধুমাত্র উপজাতিদের নিয়ে রাজনৈতিক হল গঠনের কথা ঘোষণা করে কোন ঝুঁকি নিতে চান নি। সংগঠন গড়ার প্রস্তুতি পর্বও গোপন রাখার সিদ্ধান্ত তাঁরা নেন। এক অর্থে এই পাঁচজনই, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সম্ভব। পাঁচজন ছাড়া আর যেউ যেন এই গোপন সভার কথা জানতে না পারে, তাই অন্য মহাগুপ্তি শপথ নেওয়া হয়। মহাগুপ্তি শপথ শুধু ন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

কিন্তু একটি প্রকান্ত আঞ্চলিক হল গঠনের পূর্বে গোপন তৎপরতা চল। কালীনই উদ্বোধন সংকটের মুখোমুখি হন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গভীর রাতে রক্তপিপাসু হায়েনার মত পাঞ্জাবী শ'সক শোষক গেলীয় মিলিটারি ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ মানুষের ওপর। স্তব্ধ করে নরহত্যা বজ্র। গণতন্ত্র, ও মানবাধিকার লুণ্ঠনের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বাংলার জনগণ। স্বাধিকার অর্জনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন রূপ নেয় লক্ষ শ্রদ্ধাশীল সংগ্রামের। কেন এবং কি পরিস্থিতিতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং তাঁর হলবল এই সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই সিদ্ধান্তই বা রাজনৈতিকভাবে কতটুকু সঠিক বা বৈধিক হয়েছিল, তা পূর্বের এক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন নি পঙ্কজ বেগুমান, যাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল ভবিষ্যতে যে হল গঠিত হবে, সেই হলের সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল বেহাশেবক বাহিনী গড়ে তোলার। তিনি বয়ঃ মত পোষণ করেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা করলে রাজনৈতিকভাবে লাভ হবে। সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল, দারুণ প্রতিফল অবস্থা সামলে পাকিস্তান তার অর্থও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের হাত শক্তিশালী করলে গৃহযুদ্ধের অবসানে পুরস্কার হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীসমূহ শাসনতান্ত্রিকভাবে স্বীকৃত একটি নিরাপদ ব্যবস্থা পাবে, বা তাদের অস্তিত্ব বিপর্যয় হবার হুমকি থেকে বাঁচতে সক্ষম। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিধিত পোষণ করেন গোপন বৈঠকের অন্য চার নেতা। স্বত্ববিরোধের পরিণতি হিসেবে পঙ্কজ বেগুমান

সি. এ. এক (সিভিল আর্স কোর্সেস)-এর সফল হয়ে হানাদার বাহিনীর সহযোগিতা করেন। এই কাজের জন্য অবশ্য তিনি বহিষ্কৃত হন তাঁর চার সঙ্গী যারা।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ কমা ঘোষণার পর পব্জ দেওয়ান স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান। তাঁর সঙ্গে অপর চার বন্ধুর সম্পর্ক ছিল হবার পর, তিয়ান্তরে তিনি রাজনীতিতে আবার ফিরে আসার চেষ্টা করেন। এক সময়ের জাঁকিয়ে ছাত্রনেতা পব্জ দেওয়ান তাঁর কন্মীলের দ্বিবে একমাত্র উপজাতি ছাত্রসংগঠন পাহাড়ী ছাত্র সমিতি প্রথমে স্বপ্ন, পরে ভাঙার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। অবশেষে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি থেকে বেরিয়ে আসা কয়েকজনকে নিয়ে তিনি গঠন করান 'পাহাড়ী যুবক সংঘ।' তিনি দলভাড়া, দল গড়ার প্রকাজ কাজে আসেন নি। কলকাটি মেড়েছিলেন নেপথ্যে। পাহাড়ী যুবক সংঘ গড়ার উচ্ছোগীদের মধ্যে নির্মল চাকমা, হুনির্মল ভালুকদার (বুলবুল) হুশান্ত দেওয়ান (ভাতু), চাঁদ রায় (কর্ণ), নিবারণ চাকমা (বড়দা)-র নাম উল্লেখযোগ্য। নির্মল চাকমা সভাপতি ও চাঁদ রায়কে সাধারণ সম্পাদক করে একটি নামমাত্র কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, পাহাড়ী যুবক সংঘ বেশিদিন টেকে নি।

উপজাতি ছাত্রদের মূল সংগঠন পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ভাঙার চেষ্টা আর একবার হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা হিমাংশু বিকাশ খীসা (ভুজুং) পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ভেঙে ছাত্র ইউনিয়ন ভাবানর্পে প্রভাবান্বিত একটি উপজাতি ছাত্র-যুব সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তিয়ান্তরের শেষে। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তা সত্ত্বেও, নিকট আশ্বীর ও ছাত্র ইউনিয়নের কয়েকজন উপজাতি ছাত্রকে নিয়ে গঠন করেন 'পাহাড়ী যুব সমিতি।' এই সমিতির অস্তিত্বও কিছুদিন পর বিলুপ্ত হয়। অতদ্বিকে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি প্রতিটি আশ্বাত কাটিয়ে দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

গোপন বৈঠকের চার নেতা আরও কয়েকজনকে নিয়ে বাহাদুরের পনেরই কেকদ্বারী গঠন করেন প্রকাজ দল 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'। বি. কে. রোয়াজা সভাপতি ও হানবেজ নারায়ণ লারমাকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে অগ্রতিব্বী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জন

সংহতি সমিতি গঠন ও জনপ্রিয়তার মূলে ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্ম ও জাতিগতভাবে দ্রুত জনগোষ্ঠীসমূহের জাতীয়তাবোধ (Ethnic feelings)। তাই দেখা যায়, সমিতির মূল উদ্ভোক্তরা—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সত্ত্ব জাতীয়তাবাদী, বতীন্দ্রলাল মিশ্রুরা রুশ বোঁবা (তিনি ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের কর্মী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপক ছিল) ছাত্র সংসদের (স্টিডিয়া গ্রুপ)-এর কেবিনেটে নির্বাহী সদস্য ছিলেন, ও ভবভোষ দেওয়ান স্বাধীনবাদী—ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে প্রভাবান্বিত হলেও একজোট হতে পেরেছিলেন।

বাহ্যিকের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পর্বেই সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা উপজাতি জনগণের স্বকীয় অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে শাসন-তান্ত্রিক রক্ষাক্ষেত্রের জন্ত সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু উপজাতি জনগণের জন্ত কোনপ্রকার শাসনতান্ত্রিক নিরাপত্তা আদ্যে তিনি ব্যর্থ হন। জনসংহতি সমিতির অনেক নেতা ও কর্মী তখন মত পোষণ করেন যে, শান্তিপূর্ণ ও গণ-তান্ত্রিক পথে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার সমাধান নাও হতে পারে। অতীতকালে, ‘মুক্তিযোদ্ধা নামধারী এক শ্রেণীর বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে জ্বালেন রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল। হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, অগ্নি দগ্ধ করার চালিয়েছে নির্বিবাদে। বারবার জানানো সত্ত্বেও এইসব নৃশংস কর্মকাণ্ড দমনের চেষ্টা সরকারিভাবে করা হয় নি।’ অধিকন্তু সরকারি উদ্যোগে বাইরের জেলার লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকহারে ঢোকান শুরু হয়। জাতীয় বিদ্রোহী দলগুলোর সরকারি নীতির কড়া সমালোচনা করেনি। উপজাতি জনগণ তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহিত হয়। তাদের মনে এই ধারণা জন্মাতে শুরু করে যে, বাচার লড়াই তাদেরকেই করতে হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাধানের পথ বন্ধ হচ্ছিল, তখন জয় নেয় গোপন তৎপরতা। বার অনিবার্য পরিণতি সবার কার্ণকলাপ। পার্বত্য চট্টগ্রামেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি।

উপজাতি জনগণের পৃষ্ঠপোষক শোভা এক জরী মনোতাব মফল করে তিগ্রাতরর সাতই জাহারী গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির

১। চন্দ্র মল্লিক, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাপ্তাহিক বিচিত্র, ১০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে, ৮৪, ঢাকা।

শশর শাখা 'শান্তি বাহিনী' পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামে-গঞ্জে অস্থিরতা, বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে উপজাতি সমাজ জীবনে ভারসাম্য, স্বাভাবিকতা ও নিরাপত্তা কিরিয়ে আনার জন্য এই বাহিনীর জয় দেওয়া হয়েছিল বলে বাহিনীর নাম রাখা হয় শান্তি বাহিনী। নামে সজ্ঞিত থাকলেও মার্কিনী শান্তি বাহিনী বা পীস কোরেব সঙ্গে এই বাহিনীর কর্মে বা উদ্দেশ্যের কোন একাত্মতা নেই।

শান্তি বাহিনী গঠিত হবার পেছনে বাহ্যিক কিছু কারণও আছে। বাংলাদেশ বাতে শত্রু ভিতের উপর দাঁড়াতে না পাবে, তার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত চীন-মার্কিন-পাকিস্তান আঁতাত নানাভাবে নানান্দিক থেকে দেশে বিশৃংখল ও অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করার বড়বন্দে লিপ্ত ছিল। চীন-মার্কিন-পাকিস্তান আঁতাতের মধ্যকার প্রধানতম শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। চীন তখনও তার প্রচার ব্যতী প্রচার করছিল যে, তৎকালীন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে লড়াই চলছে। বাংলাদেশ নামে একটি দেশের আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। জনগণহিত সমিতির অধিকাংশ নেতা সম্ভবতঃ চীনের উলকানীমূলক অভিসন্ধি ঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। তাঁরা হয়ত এই বিরোধীতা ধবে নিয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রতি চীনের পরোক্ষ সমর্থন হিসেবে। অন্যদিকে পাকিস্তান ও তার হোসব মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদে সর্ব্ব্ব দেশগুলো তখনও বাংলাদেশকে মুসলিম বাংলার পরিণত করার স্বপ্ন দেখছিল। বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ ছড়াচ্ছিল গুজব। অপপ্রচার। মুসলিম বাংলার প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিম উপজাতিদের কোন দুর্বলতা না থাকলে, পাকিস্তান জানত, পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তম শস্ত্রাধার চাকমাদের রাজা জিবিব রায়ের প্রতি দুর্বলতা আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে যাওয়া নিহর ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই দুর্বলতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। সাধারণ চাকমাদের বিশ্বাস, রাজা জিবিব রায় ভায়েব সঙ্গে থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যা ঘটছে, তা হত ঘটত না। চাকমাদের স্পর্শকাতরতা স্বচরুরভাবে পাকিস্তান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। চাকমাদের ধর্মীয় এবং সামাজিক অহুতানের দিনে পাকিস্তান বেতার রাজা জিবিব রায়ের ভাষণ সম্প্রচারিত করা শুরু করে। লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলনে বক্তব্য দেয় মুজিবুর রহমানের ঘোষণা দেওয়া এবং জুলফিকার আলি ভুট্টোর বাংলাদেশ বকর পর্যন্ত এই প্ররোচনা অব্যাহত ছিল। তাছাড়া, রাজা জিবিব রায় বার্ষিক পাকিস্তানের

রাষ্ট্রদূত হয়ে আসছেন বলে একটি গুজব বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বলে, জনসংহতি সমিতির অধিকাংশ নেতা হয়ত মনে করেন যে, এবার আত্মরক্ষাতিকভাবে তাঁরা সমর্থন ও সহযোগিতা পাবেন।

এই সময় দেশের চীনপন্থী কয়েকটি রাজনৈতিক দল হক-তোহা এবং আলাউদ্দিন-মজিনের কমিউনিস্ট পার্টি, সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি, বাংলা-দেশের স্বাধীনতা অবীকার করে। দলগুলোর বক্তব্য, এই স্বাধীনতা অস্পষ্ট স্বাধীনতা। কৃষক-শ্রমিক-সেহনতি মানুষের মুক্তি আন্দোলন নষ্ট করার জন্য ভারতের সম্প্রদায়বাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বড়বয়ে সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ। তাই, পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল ও স্থায়ী করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দলগুলো পৃথক পৃথক ভাবে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করেছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের তিন যুগ ও ছাত্র নেতা সিরাজুল আলম খান, আ. স. ম. আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জুলিঙ্গের নেতৃত্বে লক্ষ্য নিয়েছিল নতুন একটি দল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ। এই দলটিও সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে শেখ মুজিব সরকারকে উৎখাত করতে গোপনে দলের সশস্ত্র শাখা 'গণবাহিনী' গঠন করে।

আওরাহি লিগের মধ্যেও এমন একটা গাঁড়িয়েছিল যে, দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সশস্ত্র ক্যাডার। দলের কিছু তথাকথিত নেতার শক্তির উৎস ছিল সশস্ত্র ক্যাডার। সশস্ত্র ক্যাডারের সংখ্যা কার বড়, তার উপর নির্ভর করত কে বড়, পরমর্ষণ কার বেশি প্রাণ্য। রাজনৈতিক পর্ববেক্ষক একটি মহল মনে করেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পেছনে এই ধরনের নেতাদের গোপন হাত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি নষ্ট করে দেওয়ার জন্যও তাঁরাই দায়ী বলে এই মহলের ধারণা। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং অস্ত্রের রাজনীতির প্রভাব পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ওপর পড়াতা স্বাভাবিক। জনসংহতি সমিতি হয়ত ধরে নিয়েছিল যে, দেশে রক্তাক্ত পৃথিবী আসন্ন। সমিতির প্রধান দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। আদ্যে তাই প্রয়োজন সশস্ত্র সমর্থন। আর তারই প্রত্যতির অংশ হিসেবেও হয়ত শান্তি বাহিনী গঠিত হয়েছিল।

হুড়িয়ে পাওয়া অস্ত্র বিক্রেই শান্তি বাহিনীর সহজতম প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। যে সব গাঁহাজী রাজাকার গ্রামগুলো গভীর অরণ্যে পানিয়েছিল, তারাও অস্ত্রসহ

যোগ দেয় শান্তি বাহিনীতে। পুলিশ, বি. ডি. আর ও সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত করেকজন পাহাড়ী সৈনিক প্রথম দিকে দায়িত্ব নেয় প্রশিক্ষণের। তিরাত্তর এক চুরাত্তর ছিল রিক্রুটমেন্ট বা বলে টানার বছর।^১ শস্ত্র কর্মজ্ঞপরতা শুরু করার আগে জনসংহতি সমিতির নেতারা বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে রাখতেন। মূলতঃ শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতায় জনসংহতি সমিতি প্রশংসনীয়ভাবে করেকটি সমাজ সংস্কার মূলক কাজ বাস্তবায়নে সক্ষম হয়। যেমন, উপজাতিরা বলতে গেলে জয়গতভাবে জুয়া ও মদে আসক্ত—যা তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ। জনসংহতি সমিতি গ্রামাঞ্চলে জুয়া খেলা ও অপরিমিত মদ পান বন্ধ করতে সক্ষম হয়। গ্রামের কিছু অংশ থেকে মহাজনী প্রথা উচ্ছেদ করতেও জনসংহতি সমিতি প্রশংসনীয় ভূমিকা নেয়। আমরা নিরস্ত্র নই, প্রয়োজনে অস্ত্রের সাহায্যে সমস্তর সমাধান করব, এমনটা বাবহারিক ভাবে ঘোষণা ও জনমনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে জনসংহতি সমিতি বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে শান্তি বাহিনীকে বেশি কাজে লাগাতে শুরু করে। সুসংগঠিত শস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতিতে উপজাতি জনগণের একটা অংশ বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন মার বেধে এসেছে। প্রয়োজনে পাশ্টা মার দিতে তারা এখন সক্ষম, এই আস্থা ও বিশ্বাস তাদের মনে জন্মানোর পর শান্তি বাহিনী উপজাতি জনগণের একটা অংশের আস্থা অনেকটা অর্জন করতে সক্ষম হয়। শান্তি বাহিনী ক্রমশ জনসংহতি সমিতির শক্তির প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়। তিরাত্তরের সাধারণ নির্বাচনে জনসংহতি সমিতির বিরাট সাফল্যের সিংহভাগ কৃতিত্ব শান্তি বাহিনীর—যদিও বা তখন অভিযোগ উঠেছিল শান্তি বাহিনী কবুকের নলের মুখে উপজাতি জনগণকে বাধ্য করেছিল জনসংহতি সমিতির পক্ষে ভোট দিতে—সত্ত্বের সাধারণ নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বিজয় পাহাড়ী ছাত্র সমিতির অনবদ্য অবদানের চাইতেও বেশি। জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপ ও বক্তব্যও দেখা গেল পরিবর্তন। সমিতি দিনে দিনে অধিকতর জব্বী হয়ে ওঠে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ছিল গণসংগঠন। উপজাতি জনগণের স্বত্বিই দলের লক্ষ্য বলে ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল। লক্ষ্যে পৌঁছাতে ভিত্তি হিসেবে কি আদর্শ বা রণনীতি ও বরকৌশল অনুসরণ করা হবে, তা স্পষ্ট ছিল

১। চন্দ্র মৃৎসন্দ্বী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ৬৪, ঢাকা।

না। তাই দেখা যায়, জনসংহতি সমিতির প্রথম সভাপতি বি. কে. গোস্বামী সহ অধিকাংশ নেতা ও কর্মীর বিশেষ কোন আদর্শের প্রতি ঝোঁক ছিল না। কিন্তু জনসংহতি সমিতি গঠনে যে সংগঠনের সবচেয়ে জোরালো ও কার্যকরী ভূমিকা ছিল, সেই পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কিছু শীর্ষ নেতা এক কর্মী মাও-সে-তুং-এর চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত।

পাহাড়ী ছাত্র সমিতি দল নিরপেক্ষ সংগঠন ছিল। জনসংহতি সমিতি গঠিত হবার পর এই ছাত্র সংগঠনটি জনসংহতি সমিতির ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়। পরবর্তীতে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির অনেকে আবার সরাসরি শান্তি বাহিনীতে যোগ দেয়। তন্মধ্যে ডু' একজন নেতার উৎসাহে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের আদর্শগতভাবে গড়ে তুলতে মাও-সে-তুং-এর লাল চাট বই বিলি করা হয়। প্রতিজ্ঞাও হয় ব্যাপক। শান্তি বাহিনীর বৃহৎ অংশ তাঁর প্রতিবাদ জানায়। তবুও বক্তব্য, আমরা কোন ইজমের অঙ্গপ্রবেশ চাই না। ইজমের অঙ্গপ্রবেশ হলে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটবে। আমরা জাতীয়তাবাদী পন্থা। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সকল উপজাতি জনগণকে একীভূত করতে চাই। আদর্শের কোন্‌দল কেন্দ্র করে শান্তি বাহিনীর কিছু সদস্য চূড়ান্তরের প্রথম দিকে গোপনে গঠন করে 'ট্রাইবেসল পিপল্‌স পার্টি বা টি. পি. পি'। শান্তি বাহিনীর শীর্ষ নেতারা কর্মীদের প্রতিজ্ঞা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার পরিণতিতে আরেকটি দল গুলিয়ে উঠুক তা নেতারা চান নি। ভবিষ্যতে কোন বিশেষ ইচ্ছাতে মতবিরোধের ফলে যেন শান্তি বাহিনী ভেঙে না যায় কিংবা শান্তি বাহিনী থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোন নেতা এবং কর্মী নতুন আরেকটি দল গঠন করার প্রচেষ্টা না পায়, সেই জন্য শান্তি বাহিনীর নেতারা টি. পি. পি. গঠনের মূল নেতাদের দল থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেন। টি. পি. পি.-র সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে কিছু সদস্যকে দল থেকে ছাটাই করাও শুরু করে দেন তাঁরা। যারা বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রতি আত্মসত্য প্রকাশ করে, তাদের দলে রাখা হয়। যারা করেনি, তাদের স্বাভাবিক জীবনে কিরে বাবার সুযোগ বেওয়া হয়। এই ঘটনার পর অবশ্য প্রকৃতভাবে মাও-সে-তুং-এর লাল চাট বই বিলি করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে এই গোষ্ঠী 'রাডায়াটি কমিউনিস্ট পার্টি' নামে শান্তি বাহিনীর মধ্যে একটি সংগঠন গড়ার সোপান

উন্মোগ অব্যাহত রাখে।^১ শান্তি বাহিনী প্রথম সাংগঠনিক দলের দাক্ষিণ্যে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে শান্তি বাহিনীর নেতাদের একাবদ্ধ আলোচনায় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু শান্তি বাহিনীর একটি বক্তব্য—পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এনেস্ত, মূল ভূখণ্ড নয়—বাংলাদেশের ঐ কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি মানতে রাজি হয়নি। এতে পার্বত্য এলাকার দাবি আদায়ে কমিউনিস্ট ঐক্যের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।^২

সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি তখন জাতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিয়ে শসস্ত্র আকশন কর্মসূচী শুরু করে দিয়েছে। শসস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি শান্তি বাহিনীর সঙ্গে আগ্রহ নিয়ে আলোচনা-আলোচনা করতে এসিয়ে আসার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, একটি নিরাপত্তা পকেট তৈরী করা। যেখান থেকে প্রশিক্ষণ এবং শসস্ত্র আকশন চালানো যাবে। প্রয়োজনে রিট্রিট করে পরবর্তী আকশনের পরিকল্পনাও নেওয়া যাবে। কোন সমঝোতায় আসতে না পেরে ঐ দলগুলোর কোনটাই পার্বত্য চট্টগ্রামে পকেট সৃষ্টির চেষ্টা করেনি। পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টিও অতীতপক্ষে শান্তি বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা-আলোচনা করে কোন প্রকার সমঝোতায় পৌছতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সর্বহারা পার্টি হাল ছাড়ে নি। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের দলে টানার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি ঘোষণা করে, বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিকে স্বায়ত্বশাসন ও বিভিন্ন উপজাতিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে।^৩ শিক্ষিত উপজাতি যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ মনে করে যে, উপজাতি জনগণের সার্বিক বিবাণ

১। সূত্র, জনসংহতি সমিতি।

২। চিন্ময় মৃৎসুন্দরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে, '৮৪, ঢাকা।

৩। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ নীতি, নব নম্বর নীতি, সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন—১, শাহীম সিকদার, ঢাকা, পৃঃ—১৬।

সাধনের প্রধান শর্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গ আকলিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তা আদায় সম্ভব নয়। প্রয়োজন সমস্ত লড়াই। তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে নয়। সমস্ত সংগ্রামে বিশ্বাসী এবং উপজাতিদের অধিকারের কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করবে যে দল সেই দলে যোগ দিয়ে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাঠামো আমূল বদলের মধ্য দিয়ে উপজাতি জনগণের নিরাপত্তা এবং বিকাশ সাধন করতে হবে। সর্বহারার পার্টি সহজে এই শ্রেণীর যুবকদের দলভুক্ত করতে সক্ষম হয়। তাদের দিয়ে 'মুক্তি পরিষদ' নামে একটি সংগঠন তৈরী করিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্ত তৎপরতা শুরু করে সর্বহারার পার্টি। কয়েকজন উপজাতি বুদ্ধিজীবীও সর্বহারার পার্টিতে যোগ দেন। তার ভেতর রাঙাঘাট সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজির অধ্যাপক প্রমোদ বিকাশ কার্কারী এবং সুশান্ত ভট্টচ্যার নাম উল্লেখযোগ্য। সর্বহারার পার্টি উপজাতি সদস্যদের দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েকটি গোপন ঘাঁটি করতে চাইল।

অন্যদিকে শান্তি বাহিনী চায় না যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য কোন দলের সমস্ত তৎপরতা গড়ে উঠুক। কলে শান্তি বাহিনীর সঙ্গে সর্বহারার পার্টির কয়েকটি সমস্ত সংঘ বাধে। তবে শান্তি বাহিনীর সাফল্যের পান্না ভারি ছিল। সংঘর্ষ সকলতার কলঙ্কভিত্তে শান্তি বাহিনী সর্বহারার পার্টির বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। এতে শান্তি বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার মজবুত হয়। অবশেষে, সর্বহারার পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রামে গোপন ঘাঁটি তৈরীর পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। প্রাথমিক বিপর্যয় সক্ষমভাবে কাটিয়ে ওঠার কলে শান্তি বাহিনীর সাংগঠনিক শক্তি আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। সেই সঙ্গে ব্যাপক সমস্ত এ্যাকশনে যাওয়ার জন্য শান্তি বাহিনী পার্টির উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

শান্তি বাহিনী নিজের স্বার্থে, বিশেষ করে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও অন্য বোম্বার্ডের গোপন রাজ্য তৈরী করতে প্রতিবেশী দেশ বার্মার নির্দিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বোম্বাঝালের চেষ্টা চালায়। দুই পার্টির মধ্যে মাত্র একবার বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রকার যৌথ কর্মসূচী গৃহীত হয় নি। তবে এই স্বার্থে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, একে অন্যকে বিরক্ত করবে না।^১ এই সময়ের মধ্যে

১। চিন্ময় হুসেইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে, '৮৪, ঢাকা।

চীন ছিল ডেমক্যাটিক ফ্রন্ট, আরাকানের বিদ্রোহী দল রাহাইয়ের উক্ত গ্রুপ, আরাকান কমিউনিস্ট পার্টি এবং জাতীয়তাবাদী রামলাপার সঙ্গে শান্তি বাহিনীর বহুতরুণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।^১ পববর্তীতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা চীনের সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেন। প্রথম দিকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও, তথ্যভিত্তিক মহলের ধারণা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ৭৭'র শেষের দিকে চীনের সঙ্গে কাজ চালানোর মত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তবে তৎকালীন জিয়া সরকারের সঙ্গে চীনের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর শান্তি বাহিনী সম্পর্কে চীন আর আগ্রহ দেখায় নি।

দীর্ঘদিনান্তে সদর দপ্তর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ছাট সেক্টর, প্রত্যেকটি সেক্টর চারটি জোন-এ ভাগ করে শান্তি বাহিনী সশস্ত্র আকর্ষণ বর্ধনশীল শুরু করে ছিয়াত্তরে। কিন্তু তার আগে প্রস্তুতি চলাকালীন সময়ে পুলিশের সঙ্গে কয়েক-বার শান্তি বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। শান্তি বাহিনীর মূল দায়িত্বে তখন ছিলেন জ্যোতির্জিৎ বোম্বিপ্রিয় লারমা সন্ত (তুঙ)। যদিও সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (প্রবাহন)। তবুও তিনি মূলতঃ প্রকাশ্য সংগঠন জনসংহতি সমিতির কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর সমস্ত ঘটনা নতুন মোড় নেয়।

খোন্দকার মুক্তাক আহমেদ এক সাময়িক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট হলেও সংসদ ব্যক্তিগত করেন নি। বেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামত জানতে তিনি বিশেষ আলোচনা চক্রের আহ্বান করেন। হঠাৎ উদ্ভূত নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অনেক সংসদ সদস্য তখন কিছুটা গা ঢাকা দিয়ে চলছিলেন। তাই সংসদ সদস্যদের অভয় দিয়ে ঢাকার নেওয়ার উদ্ভোগ মুক্তাক আহমেদ নিয়েছিলেন। তারই অঙ্গ হিসেবে লারমাকে ঢাকার নিতে জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। লারমা সংসদ সদস্য হলেও বেশের অভ্যন্তর সংসদ সদস্যদের সঙ্গে তার চলাকোরার কার্যক ছিল। প্রকাশ্য রাজনীতির খোলাখোলা ভাবের বদলে তাঁর মধ্যে ছিল খুবই সতর্কতা এবং অশেত:

১। সি. জনসন, হি হু লেস ডাউন হিস গান লেস ডাউন হিস রিভলুশন-
আই, ডারিউ, জি, আই, এ, নিউজলেটার, জুন-অক্টোবর, ১৯৮২,
নং ৩১-৩২।

গোপনীয়তা। যার দ্বারা উপজাতি জনগণ অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁকে পেত না। তিনি কোথায় আছেন বা কোথায় থাকবেন, তা প্রায়শ কেউ জানত না। একই সঙ্গে প্রকান্ত রাজনীতি এক গোপন সংগঠন শান্তি বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার দ্বারা তাঁর মধ্যে পাশাপাশি দুটো সত্তা সব সময় ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাকশালে যোগ দেওয়ার পর এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে লারমা প্রকান্ত রাজনীতিতে থাকতে চান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার পর তিনি হয়ত মনে করেছিলেন যে, দেশে গৃহযুদ্ধ অব্যাহত। কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের তুলনায় তখন দেশের প্রথম শ্রেণীর যে কোন নেতাকে যোগ্যতার খাটো বলে মনে হয়েছিল। বিরাট নেতার বিরাট শৃঙ্খতা অপূরণীয়। আর ঐ শৃঙ্খতা ও অস্থিরতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন মুজিব বিরোধী বিভিন্ন শক্তি। মুজিবশত্রীরাও ছেড়ে কথা বলবেন না। তাঁরাও চেষ্টা করবেন ক্ষমতার দ্বারে আসার। এবং লড়াইয়ের অনিবার্হ পরিণতি দীর্ঘ মেয়াদী গৃহযুদ্ধ। লারমা তাই হয়ত মেরি করতে চাইলেন না। অব্যাহত গৃহযুদ্ধের চরম বিশৃঙ্খলার সুযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্রাঘ্য অধিকার বা স্বায়ত্বশাসন অর্জনে সশস্ত্রভাবে চাপ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন। শান্তি বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের মজুত তখন সম্ভাবজনক ছিল না। তবে লারমার ভরসা ছিল যে, গৃহযুদ্ধে সারা দেশ জলাবে। সরকার থাকবে নাম মাত্র। সরকারি বাহিনীর সঙ্গে শান্তি বাহিনীর তেমন বড় সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে না। যদিও বা শান্তি বাহিনী সশস্ত্র এ্যাকশনে বাওয়ার পর সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ সাকল্যের পর সংগঠনের অস্ত্র ভাঙার বেশ সম্ভবত করতে পেরেছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আত্মগোপনের পর শান্তি বাহিনী এ্যাকশন কর্মসূচী শুরু করে। লারমা সর্বস্ব কতৃৎ গ্রহণ করেন। জনসংহতি সমিতিও গোপন সংগঠনে পরিণত হয়। পাহাড়ী ছাত্র সমিতিও প্রকান্ত কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। দলের প্রচার পত্র জনসংহতি সমিতির নামে ছাপা ও বিলি করা হলেও শান্তি বাহিনীর কুখ্যাতি মুখ্য হয়ে ওঠে। দল নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি থাকলেও শান্তি বাহিনীর দাবই বেশী করে প্রচারিত হতে শুরু করে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও শান্তি বাহিনী, দুটি নাম একে অপরের পরিপূরক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। কয়েকটি সীমান্ত বাহিনীর চৌকি এক পুলিশ ক্যাম্পে শান্তি বাহিনী পরপর কটিকা আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও বেশদ্রব্য হতগত করতে লক্ষ্য হয়। সামরিক বাহিনীর উপর দৌরালা কারাবার আক্রমণ হলেও শান্তি বাহিনী প্রাথমিক সাকল্য

জ্ঞাত হবে। কয়েকবার সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হবার পর শান্তি বাহিনী উপলব্ধি করে যে, সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রয়োজনে শিক্ষিত কমান্ডারের দরকার। তাই সশস্ত্র লড়াইয়ে যোগ দিতে শান্তি বাহিনী যুব সম্ভ্রদায়কে আহ্বান করে। সেই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি ছিল দ্রুত অবনতিশীল ও চরমভাবে হতাশজনক। কোন যুবক গ্রামের বাড়িতে থাকতে পারত না। শান্তি বাহিনীর সদস্য, এই অভিযোগ আরোপ করে মিলিটারি তাদের ঘরে নিয়ে যেত ক্যাম্পে। জেলা শহর রাঙামাটিতেও অনেক উপজাতি যুবক ও ব্যক্তিকে দিনরাত হুমকান করে ছে মিলিটারি কর্তৃপক্ষ। যে সব উপজাতি পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি ছিল তাঁরা এবং কষ্ট করে হলেও কিছু পবিত্র ঠাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করতে পাঠিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহীতে সামান্য ব্যতিরাজ্ঞ। বাইরে পড়তে যাওয়া ছাত্ররা ছুটির দিনগুলোতেও বাড়ি যেতে পারত না। গেলেই তাদের মিলিটারি নির্ধাতনের শিকার হতে হত। তহুপরি উপজাতিদের ওপর সবকিছু ক্রমবর্ধমান অত্যাচার ও নির্ধাতন দেখে এক জাতীয়ভাবে এর কোন প্রতিকারের পথ না পেয়ে নিজেরাই একটা বিহিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে শান্তি বাহিনীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের বেশ কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রও যুবক শান্তি বাহিনীতে যোগ দেয়। বলা যেতে পারে সরকারি ভুল নীতিই তাদের ঠেলে দিয়েছিল শান্তি বাহিনীতে যোগ দিতে। এতে শান্তি বাহিনীর গুণ ও পরিমাণগত শক্তি বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে সরকার শরণার্থী পুনর্বাসনের সঙ্গে ভাল রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে গৈষ্ঠ সমাবেশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, সাইমন উইনচেস্টারের লেখা ‘সানডে টাইমস’-এর এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, হালায়ের অরধ্যাক্ষে করিউনিট সশস্ত্র তৎপরতা দমনে সকল ও বিশেষতঃ বে বক্ষ ও অভিন্ন কুটিল আর্মির স্পেশাল আর্সঃ সার্ভিসের কর্বেল গিবসনের নেতৃত্বে একটি ইউনিট বাংলাদেশের বীরপুরে সামরিক অক্সিগারদের প্রশিক্ষণ বেঞ্জার কক্ষে নিয়োজিত ১৯৭৭ সাল থেকে। এই ইউনিটটি, প্রতিবেদকের ভাষায়—

‘Offend assistance to the Country’s military government on

several occasions (including) providing equipments for dealing with the insurgents in the hills east of chittagong^১

ব্যাপারটি নিয়ে ব্রুটেনের আরও কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। একই সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রায়শই লিখিত ভাবে উদ্‌ঘাপন করেন লেবার পার্টির এম. পি. আলকস ডাবলু। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বলা হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে এস. ও. এস - এর একটি ইউনিটের উপস্থিতি স্বীকার করা ছাড়া এ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রশ্নের কোন জবাব দেওয়া হয় নি।^২

অন্যদিকে সামরিক সরকার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সামরিক অভিযানে এক-শ্রেণীর পরণাথীদের ব্যবহার করতে শুরু করে। এতে শান্তি বাহিনীর সঙ্গে একশ্রেণীর পরণাথীদের সশস্ত্র সংঘর্ষ বাঁধতে লাগল। জমি ও টাকা-পয়সা লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর গুলি-সোলার মাঝে জড়িয়ে ফেলাতে পরণাথীদের একটা অংশ পালিয়ে কিয়ে যায় নিজেদের পূর্বতন এলাকায়। বাকি কিয়ে যাবার অসুস্থতা চাইল, সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের কিয়েতে দেয় নি। বরং তাদের একটা অংশ দিয়ে তারা ক্রমশঃ শান্তি বাহিনীর নামে উপজাতিদের বিকল্পে অভিযান চালায়। পরণাথীদের বক্তব্য, তারা শান্তিতে বাঁচতে চায়। তারা কায়েলা চায় না। সংঘর্ষ বা রক্তপাত তো নয়ই। একই সঙ্গে তাদের অভিযোগ, মিলিটারি নির্দেশ ও প্ররোচনা সত্ত্বেও তারা যদি উপজাতি গ্রামে হামলা চালাতে রাজী না হয়, তাহলে তাদের গুলিও চালানো হয় নানা ধরনের অভিযাচর্য। বন্ধ করে দেওয়া হয় সাপ্তাহিক রেশন, টাকা-পয়সা। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের একটা অংশ উপজাতিদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

কলে শান্তি বাহিনী আর সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ সীমিত না থেকে এক শ্রেণীর পরণাথীরাও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

শান্তি বাহিনীর প্রতি উপজাতি জনগণের সহানুভূতিশীল অংশের সহানুভূতি

১। সাইমন উইনচেস্টার, সানডে টাইমস, ২৭শে মার্চ, ১৯৬৩, লন্ডন, বাংলাদেশ পিপলস ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট, লন্ডন ১৯৬১।

২। অ্যাট স্লেভারি সোসাইটি, দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস, লন্ডন, সিরিজ-২, ১৯৬৪।

এখন হিকে নিসফোর্চ ছিল না। বিশেষ করে শক্তি ও জনসমর্থন কিছুটা হোগাফ করার পর শান্তি বাহিনীর সমর্থক নন কিংবা ভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপজাতি সমস্তা সম্বন্ধে বিখ্যাত, এমন অরাজনৈতিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের শান্তি বাহিনী জাতিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে। গ্রামাঞ্চলে কয়েকজনকে সাজাও দেওয়া হয়। চূড়ান্ত সাজা হিসেবে কয়েকজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। গ্রামাঞ্চলে শৃঙ্খল ও নিরপেক্ষ বিচার অনুষ্ঠানের বদলে শান্তি বাহিনীর কোন কোন নেতা ও কর্মী বিচারকের আসনে বসে বেত বলে শোনা যায়। শুধু তাই নয়, মনঃপূত নয়, এমন রায় ঘোষণার জন্য বিচারক বা গ্রাম প্রধানকে বিচারের আসরে প্রকাশ্যে বেত মারার ঘটনাও বেশ কয়েকটি ঘটেছিল। উপজাতি বুদ্ধিজীবীরা শান্তি বাহিনীর কার্যকলাপের গঠন মূলক সমালোচনা করেছিল। শান্তি বাহিনী ধরে নেয় যে, তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ংস্ফূর্ত গুরু হয়েছে। পাণ্টা ব্যবস্থা হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে প্রতিশর করতে শান্তি বাহিনী কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। এতে বুদ্ধিজীবীদের সহায়ত্ব শান্তি বাহিনী অনেকাংশে হারায়। বুদ্ধিজীবীরা সাধারণতঃ শহরাঞ্চলে থাকেন। তাঁদের চিন্তা ভাবনার প্রভাব শহরাঞ্চলের ছাত্রযুবকদের উপর থাকে। এই কারণে এক প্রথমত ও প্রধানত গ্রামের যুবকদের নিয়ে শান্তি বাহিনী গঠিত হয়েছিল বলে শহর ও গ্রামের ছাত্র-যুবকদের মধ্যে একটা তেজ রেখা টানা হয়। শিক্ষিত ও ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন একটা শক্তিকে শান্তি বাহিনী বিশেষ নীতি অনুসরণ করে সম্বন্ধে দূরে রাখে। পরবর্তীতে সংগঠনের প্রয়োজনে শহরের ছাত্র যুবকদের শান্তি বাহিনীতে রিক্রুট করা হয়েছিল সত্য। তবে যে সম্বন্ধ ও দূরত্ববোধ প্রথমদিকে জন্ম নিয়েছিল, তা কখনও দূর হয় নি।

শান্তি বাহিনীর মূল দুর্বলতা হল লক্ষ্য, ও লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার অভাব। এই কারণেই শান্তি বাহিনীর নেতারা সাধারণ কর্মীদের রাজনৈতিক ভাবে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে পারেন নি। শান্তি বাহিনীর মূল দাবি, ডিষ্ট্রিক্ট অটোনমি বা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের রূপরেখা কি ধরনের হবে, তা নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন নেতা ও কর্মীদের মধ্যে নানা মত। কারণ মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিজস্ব একটি নির্বাচিত আইন পরিষদ হল স্বায়ত্বশাসনের প্রধান ও প্রথম স্তর। এই আইন পরিষদের সুপারিশ কিংবা অস্বীকার অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হবে, এমন শাসনভিত্তিক প্যারামিট থাকতে হবে। কেউ মনে করেন, মুক্তরাষ্ট্র কার্ঠাসের রাজ্যগুলো যে কারণে স্বায়ত্বশাসক

ভোগ করে, সেই পরিমাণের সুযোগ সুবিধাই হল আকস্মিক স্বায়ত্বশাসনের সঠিক রূপ। কেউ আবার হত শোষণ করেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া সমস্ত সমাধানের কোন পথ খোলা নেই। অতি চালাক কোন কোন নেতা এবং কর্মী প্রচুর বক্তব্যের আড়ালে তাঁদের বৃত্তি রাখেন। তাঁদের মতে, উপজাতি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় হল লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে যদি আদায় সম্ভব হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। আর যদি সেই অধিকার আদায়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়, তাহলে তাই চাই। লক্ষ্য সম্পর্কে নেতাদের ম্পষ্ট এক বক্তব্য না থাকার দরুন কর্মীরা বিভ্রান্ত। বেশী বিভ্রান্ত সাধারণ উপজাতি জনগণ।

শান্তি বাহিনী টি. পি. সি-র সম্ভাব্য অভ্যুত্থান কাটিয়ে উঠতে পারলেও পবনভীতে ভয়, আরও পরে গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত হয়ে পড়ে। আশি সালে তা একটি আকার ধারণ করলেও এই স্বদেশের নৃহতপাত হয়েছিল পঁচাত্তরে। মানবেন্দ্র নারায়ণ দারমার বাকশালে যোগদানের আগে শান্তি বাহিনী প্রায় ছুটো শিবিরে ভাগ হয়ে পড়েছিল। পঁচাত্তরের পনেবই আগষ্টের পর দারমা প্রকৃত রাজনীতি ছেড়ে সমস্ত এ্যাকশনে বাণ্যার পর এই অবস্থার সামান্য দেন। কিন্তু স্বদেশের অবসান ঘটতে পারেন নি। পঁচাত্তরের চার্বিশে অক্টোবর জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় দারমা সত্ত (তুঙ) পানহড়ির কাছাকাছি অসহায়ের মত পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। সত্তর সম্বর্ষকদের সম্মেহ, এর পিছনে বিরোধী গোষ্ঠীর হাত রয়েছে। সম্মেহ সংঘর্ষে রূপ নিতে ধেরি হয়নি। শান্তি বাহিনীর সোপান খাঁটির কাছাকাছি গ্রামগুলো সেই সময় পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীর সংঘর্ষ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কিছু কর্মী সংঘর্ষের পরিণতিতে হত্যা হলে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। দারমার শত্রু হাতের নিয়ন্ত্রণ শান্তি বাহিনীকে আরও স্বায়ত্বক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছিল সত্য, কিন্তু জনমনে শান্তি বাহিনী সম্পর্কে পূর্বের ধারণায় চিড় ধরা রোষ করতে পারেনি। ছিন্নাত্তর থেকে সরকারি উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে শরণার্থী আগার মোত বেড়ে যায়, মিলিটারি সরকারও শান্তি বাহিনী ইমানে ব্যাপক মিলিটারি অপারেশন শুরু করে। সরকারি এই পরবেশ শান্তি বাহিনীর জন্য পরোক্ষ আনীর্ষ্যের রূপ নেয়। একদিকে সমস্ত সংঘর্ষ নিষ্পত্ত হওয়াতে শান্তি বাহিনীর স্বাধীনতা বন্ধ চাপা পড়ে যায়। অন্যদিকে মিলিটারি সত্যাচার এবং মিলিটারি প্রত্যাচার এক প্রেণীর

শরণার্থীদের দ্বারা বাস্তবতা থেকে উচ্ছেদ হওয়া উপজাতি জনগণ, বোলকলায় পূর্ণ না হলেও তাদের হয়ে লড়েছে—এটো সত্যনিয়ম, শান্তি বাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।

আশির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক অবস্থার বেশ পরিবর্তন হয়। শরণার্থীর সংখ্যা দাড়িয়েছে তখন প্রায় ছ'লাখ। শান্তি বাহিনীর মূল কেন্দ্রগুলি ঘিরে সরকার শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়। এতে গৃহহারা হয় হাজার হাজার উপজাতি। এমন পুনর্বাসনের অভ্যন্তর কারণ শান্তি বাহিনী আর শান্তি বাহিনীর গোপন বাঁটির কাচাকাছি স্থানীয় উপজাতিদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা। তার সঙ্গে বৃদ্ধি করা হয় সাধারণ উপজাতিদের উপর মিলিটারি নিপীড়ন। শান্তি বাহিনীর প্রচারপত্রে জানা যে শরণার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ইচ্ছা প্রথমদিকে শান্তি বাহিনীর ছিল না। শান্তি বাহিনী শুধু বহিরাগত শরণার্থীদের দ্বারা দাবা এলাকায় কিংবা বাবার নির্দেশ জারি করত। শান্তি বাহিনীর বক্তব্য ছিল, তাদের মূল শত্রু মিলিটারি সরকার। তারা লড়ছে সরকারের উপজাতি উচ্ছেদ ও নিধন নীতির বিরুদ্ধে। শরণার্থীদের সঙ্গে তাদের কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু তারা যদি সরকারি বাহিনী হাতিয়ার হয়ে উপজাতিদের অধিকার দখল ও অত্যাচার চালায়, তাহলে শান্তি বাহিনী তার সমুচিত ব্যবস্থা নেবে। শরণার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামে আশা কমেনি। বরং তৎকালীন সরকার তা বাড়িয়ে দেয় বিত্তে ধারে। গভীর পার্বত্য অরণ্যকূলের উপজাতি গ্রামগুলি ছাড়া বাকি সব গ্রামের চারপাশে, নদীর পারে, পাঁকা সড়কের ধারে, পাশে চলা পাহাড়ী রাজ্যের পাশে স্রুত গড়ে ওঠে সরকারি উদ্যোগে শরণার্থী গ্রাম। এতে শান্তি বাহিনীর চলকেরা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। খাতি জব্দ সরবরাহ ব্যাহত হয়। শান্তি বাহিনী ও তার প্রতি সহানুভূতিশীলদের পারস্পরিক ঘোণাঘোষ বন্ধ করা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে ওঠে। তদুপরি চার পাঁচ বছরের রক্তাক্ত লড়াইয়ে শান্তি বাহিনী সাক্ষ্য দাবী করলেও সরকারি বাহিনীর কয়েকটি ফাঁড়ি দখল ও কিছু লক্ষ্যকে হতাহত করা ছাড়া, তাও নিজেদের ক্ষতি অস্বীকার করে নয়, দাবী আদায়ের প্রস্তুতি কোন প্রকার অগ্রগতি হয়নি। অথচ সাধারণ উপজাতিদের দিতে হয় চরম মূল্য। এই সমস্ত কারণে শান্তি বাহিনী আর উপজাতি জনগণের মধ্যে ক্রমশ চিত্তের ব্যর্থতা বাড়তে শুরু করে। বলা বাহুল্য সাধারণ উপজাতিরা শান্তি বাহিনী সম্পর্কে মোহ ছাড়তে থাকে। অবশেষে

শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র আকশনের যে তীব্রতা ছিরাভরে ছিল, তা হান পায়। হৃদয় পায় লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক। স্বাভাবিকভাবে সৌজন্য প্রবলতম হয়।

উদাশির তেইশে জাছুয়ারী তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিরাউর রহমান উপজাতি জনগণের প্রতি সদিচ্ছার নিদর্শন হিচাবে শান্তি বাহিনীর নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সঙ্গ (তুঙ) ও চাবাই মগকে জেল থেকে মুক্তি দেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে চাবাই মগ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয়া লারমা সঙ্গ (তুঙ) ও গোপন ঘাঁটিতে তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে উপজাতি সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট জিরাউর সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে গেলেন। প্রেসিডেন্ট জিরাউর এক সামরিক অনুষ্ঠানে নিহত হবার পর সঙ্গ লাবমা শান্তি বাহিনীর গোপন ঘাঁটিতে ফিরে যান। শোনা যায় সঙ্গ লাবমা ও চাবাই মগের মুক্তি নিয়ে শান্তি বাহিনীর কিছু নেতা ও কর্মীদের মনে তখন নানা প্রশ্ন উঁকি মারছিল।

সাংগঠনিক সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে জনসংহতি সমিতির জাতীয় কংগ্রেস-এর অধিবেশন বসে বিরানিব অক্টোবরে। এই অধিবেশনে পুরান বিরোধ আর নতুন ধন্দ চরমে ওঠে। পার্টির ঐক্য অনুরূপ রাখতে শেষ মুহূর্তের চেষ্টায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে চোরামান ও ভবতের দেওয়ান (গিরি)-কে সাধারণ সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। লারমা,ব বিরোধীতা সত্ত্বেও কংগ্রেসে উপস্থিত অধিকাংশ নেতা ও কর্মীর সমর্থনে জ্যোতিরিন্দ্র লারমা সঙ্গ পুনরায় ফিল্ড কমান্ডার নির্বাচিত হন।

পার্টির কংগ্রেসে জোর সশস্ত্র আকশন চালানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু দেশে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিকভাবে জোর সশস্ত্র আকশন চালানো বা চালিয়ে ছানতথ্য সকলতা পাওয়ার মত অবস্থা তখন ছিল না। শান্তি বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সঙ্গ লাবমা সময় নিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনার তত্ত্বিতে স্বপ্ন ও জ্বলন্ত লড়াইয়ের প্রকৃতি নিয়ে চাইলেন। কিন্তু হলের একটি সৌষ্ঠব সঙ্গ লারমার এই নীতির ভেতর বড়বয়ের গন্ধ পান। সেই সময় শান্তি বাহিনীর মধ্যে নানা ধরনের স্তম্ভন ছড়িয়ে পড়ে। পরিশ্রান্তে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমূলক আচরণ। এই নিয়ে শুরু হয় আবার ধন্দ। সংঘাতও বেঁধে যায় কয়েক জরিদার। উত্তর পক্ষ থেকে অন্তর্দলীয় আপোসের চেষ্টা করা হয়। আপোস করার আলোচনা ঢাকালালী জিরাশির জ্বনের পর পর কয়েকটি ঘটনার পর ঐক্য

এচেটা ভেঙে যায়। সেসে যায় দুই গোঞ্জিঃ মধ্যে সেকটর ও জোন কখনে রাখার রক্তাক্ত লড়াই।

মূল লড়াইয়ের ভিত্তি হিসেবে যে দুটি মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছিল—পরিণতিতে দুটি গোঞ্জি, তার একটি হল শান্তি বাহিনীর লড়াই একদিনের নয়। দীর্ঘকালীন যুদ্ধ ও চরমতম সাক্ষ্যের অন্ত প্রয়োজন দীর্ঘ প্রস্তুতি ও বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মুক্তি সংগ্রামের চিন্তাধারার শিক্ষিত হওয়া।

একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী জাতীয়তাবাদ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে। কিন্তু সেই তুলনায় স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন যেমিত অন্ততম রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-তন্ত্র তখনও বাংলাদেশের মাটিতে ও গণমানুষের মনে দৃঢ় ভিত্তি গাড়তে পারেনি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরবর্তী স্তর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে এই উত্তরণ ঘটা সহজসাধ্য ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামকে কয়েক যুগ ধরে লড়াইতে হয়েছিল হাত বদল করা উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের শুরুটা তাই জাতীয়তাবাদী হলেও শেষটা হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক। বা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের অনিবার্ণ পরিণতি। বাংলাদেশে তা হয়নি। শান্তি বাহিনীর ক্ষেত্র ছিল আরও সীমিত। রাজনৈতিকভাবে অনভিজ্ঞ, অনেকাংশে অশিক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতি সম্রাটদের ক্ষুদ্র জাতি-সম্ভাবোধ, (Ethnic feelings) বৃহৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ দেওয়া তত্ত্ব ও ব্যবহারিক দিক থেকে নিজস্ব তফাৎ রয়েছে। উপজাতীয়তাবোধ জাতীয়তাবাদী চেতনার স্তরের উন্নীত হওয়ার আগেই যদি আবার স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ভাক দেওয়া হয়, তাহলে লড়াইয়ের মূল ভিত্তি থেকে যায় দুর্বল। যেখানে লড়াইয়ের বিভিন্ন স্তর না পেরোনোর বিরাট ঝাঁক থাকে। লড়াইয়ের পরিণতিও হয় ভরাবহ ও মারাত্মক। শান্তি বাহিনীর প্রথমোক্ত গোঞ্জিঃ মধ্যে রণনীতি ও রণকৌশলে এই দুর্বলতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

শান্তি বাহিনীর অপর গোঞ্জির মতে, দীর্ঘ ক্ষোভী লড়াইয়ে লিপ্ত হবার মত সুযোগ এবং সময় নেই তাদের। সরকার যে ব্যাপকহারে শরণার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামে আনছে, এবং উপজাতিদের উচ্ছেদ করছে, তাতে অনতিবিলম্বে উপজাতিরা প্রথমে নিজস্ব পুরবাসী, তাদের ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন কোন কিছুই আর তাদের পথ দেখাতে পারবে না। সুতরাং প্রয়োজন জোরালো সশস্ত্র অ্যাকশন। হয় এখনই, নয়ত কখনও নয়। দীর্ঘ লড়াইয়ে বিধানী

প্রথম গোষ্ঠী 'লাখা' নামে অভিহিত হয়। (চাকমা শব্দ লাখা মানে দীর্ঘ)। দ্বিতীয় গোষ্ঠী 'বাধি' নামে পরিচিত। (চাকমা শব্দ বাধি মানে সংকিশ্ল বা খাটো)।

দ্বিতীয় গোষ্ঠী তাত্ক্ষণিক একাশন বলতে কি বোঝাতে চায়, জোরালো মনস্ত্র একাশন কার বিরুদ্ধে এবং কেন, শেষ লক্ষ্য কি, লড়াইয়ের এইসব মূল বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার নয়। বরং তাদের বক্তব্যে হতাশার স্বর স্পষ্ট। তাই ধরে নেওয়া যায়, শান্তি বাহিনীর বন্দ আদর্শগত নয় ততটা, বতটা দলীয় কথ্যতা স্বত্বের। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সার্বিক পরিস্থিতি দেখে শান্তি বাহিনীর নেতা ও কর্মীদের হতাশা। শান্তি বাহিনীর কয়েকজন চাকমা নেতার জ ত্যাগ্গিমান ও সংগঠন ভাঙার অন্ত দ্বারী বলে উপজাতি বুদ্ধিজীবী মহলের ধারণা।

জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনী যে নেতা ও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ঝড়ে উঠেছিল সেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পারভেন সংগঠনের ঐক্য ধরে রাখতে। শান্তি বাহিনীর নাম রাজ সাফলা, লক্ষ্য অর্জনে লড়াইয়ের ভবিষ্যত, সাংগঠনিক অবস্থা দেখে হয়ত তিনিও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। অহুমান করা হয়, সাংগঠনিক বন্দ চরমে ওঠার পর লারমা কিছুটা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই ধারণার মূল কারণ হিসেবে বলা হয়, শান্তি বাহিনীর তেজস গোষ্ঠী কোম্পল মিটিয়ে কেনতে শক্ত হাতের নিয়ন্ত্রণের বন্ধে লারমা উদারতা দেখিয়েছিলেন। একটা গোষ্ঠীর প্রতি নীরব সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তিনি চেটা করেছিলেন সকলকে নিয়ে চলতে। কোম্পল নয়, ঐক্যই একমাত্র পৌঁছে দিতে পারে অতীত লক্ষ্য, এই চেতনা জাগাতে। কিন্তু তাঁর এই উদারতাকে দুর্বলতা মনে করে পরস্পর বিরোধী দুটি গোষ্ঠীই গোষ্ঠী কোম্পল চরমে নিয়ে যেতে থাকে। পরিণামে লারমা সংগঠনের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেন। গোষ্ঠী কোম্পলের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের নির্বয় পরিণতিতে ওঁরাশির দশই নভেবর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর গোপন আত্মনার কুশলভাবে নিহত হন। এই ঘটনার পর শান্তি বাহিনী আত্মসমীক্ষিতভাবে দু'ভাগ হয়। লাখা গোষ্ঠীর নেতৃত্ব নেন জ্যোতির্বিজ্ঞ বোধিপ্রিয় লারমা সন্ত (জুঙ)। বাধি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে এসেছে ভক্তভোষ বেগরান (সিরি) ও প্রীতিসুয়ার চাকমা (প্রকাশ)।

শান্তি বাহিনীর প্রতি সহায়কুতিশীল অনেক বনে করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দু'খা হত্যাকাণ্ডের পরিণতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের আত্মবর্ধা আদর্শের লড়াইয়ের আশ্রয় অশ্রুত পড়েছে। তাঁদের বক্তব্য, লারমার নেতৃত্বের

কিছু ক্রটি হয়ত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর ভাবমূর্তিকে বিরে গড়ে উঠেছিল উপজাতিদের বাঁচার লড়াই। তাঁকে কিছু সময় দিলে তিনি পার্টির একা কিরিয়ে আনতে পারতেন বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদি নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আকস্মিক মৃত্যুতে শুধু উপজাতিদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়েছে সরকার এবং দেশেরও। কারণ শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতার উদ্দেশ্য হল, রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার রাজি হতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপে বসার জগ্য চাই জনগণের সমর্থনপুষ্ট একজন প্রতিনিধি। একমাত্র লারমারই ছিল সেই বৈধ অধিকার এবং যোগ্যতা। তাঁর মৃত্যুতে সৃষ্টি হয়েছে নেতৃত্বের বিরাট শূন্যতা। তাঁরা মনে করেন, উপজাতি নেতাদের মধ্যে বর্তমানে এমন কেউ নেই, যার পেছনে রয়েছে জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থন। 'তাঁই তাঁরা আশংকা করেন, সরকার যদি উপজাতি নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপে বসতে রাজি হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছুতে নেতৃত্বের দুর্বলতা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

শান্তি বাহিনী আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাগ হবার পর আত্মরক্ষা সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করেছে।

শান্তি বাহিনীর ঋক্ষদ্রব্য ও আর্থিক যোগানের মূল উৎস ছিল উপজাতি গ্রাম-গুলো। রক্তিত্র গ্রামবাসীরা কষ্ট হলেও, যা পারত শান্তি বাহিনীকে দিত। বেউ খেচ্ছায়, কেউ বন্দকের মুখে। শান্তি বাহিনীর গোপন ঘাঁটি আর অধিকাংশ উপজাতি গ্রামের মাঝখানে সরকার শরণার্থীর দেওয়াল বসানোর ফলে শান্তি বাহিনীর সরবরাহ ব্যবস্থা ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। ফলে শান্তি বাহিনীর আয়ত্বাধীন গভীর অরণ্যগুলোর গ্রামগুলোর উপর যোগানের বোঝা ভারী হয়ে নেমে আসে। কিন্তু তা বহন করার মত ক্ষমতা গ্রামবাসীদের নেই। শান্তি বাহিনী হু'ভাগ হবার পর এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। আগে ছিল একটি হল। বর্তমানে দুটি। দুটি হলকে দ্বিতে গিয়ে গ্রামবাসীদের খাপসার মত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গ্রামবাসীরা তাদের অক্ষমতা আগে না জানালেও এখন জানাচ্ছে। ইহানী শান্তি বাহিনী ঋক্ষদ্রব্য সংগ্রহ করতে গ্রামবাসীদেরকে উপর জোর জবরদস্তি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে উপজাতিদের ক্ষোভ ক্রমশ জমে উঠছে। গ্রামবাসীদের উপর নির্ধারনের জল শান্তি বাহিনী একদল আরেক দলকে হোদ্যারোপ করছে। কোন হল দায়ী সে

সম্পর্কে জনগণের ধারণা পরিষ্কার নয়। যে গোষ্ঠীই কর্তৃক না কেন, এতে সংগঠনের ভাবমূর্তি ও জনপ্রিয়তা জ্যামিতিক হারে হ্রাস পাচ্ছে। একপাশে শান্তি বাহিনী, অপর পাশে সরকারি বাহিনী, মাঝখানে রয়েছে সাধারণ উপজাতিরা। নির্ধাতন ও নিষেধণে তাদের নানিবাগ উঠছে।

একসময় শান্তি বাহিনীর আর্থিক বোগানের উৎস পরোক্ষ ভাবে জি সরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামে মিলিটারি অপারেশনের জন্ত প্রয়োজন ছিল সর্বত্র ব্যাপক মিলিটারি মবিলাইজেশন। কিন্তু দু' তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ছাড়া সকল ক্ষুদ্রে চলাচলের উপযোগী কোন রাস্তা পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল না। সরকার তাই প্রথম জোর দেয় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের উপর। প্রথম দিকে শান্তি বাহিনী সড়ক নির্মাণে বাধা দেয়। রাস্তার কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে সরকার ঠিকাদারদের দিয়ে শান্তি বাহিনীর কাছে মোটা টাকা প্রস্তাব রাখে। শর্ত, রাস্তার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।

শান্তি বাহিনীর নেতারা প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজী না হলেও দারুণ আর্থিক সংকট বিবেচনা করে তারা রাজী হয়ে বান। সরকার ঠিকাদারদের মোট বিলের একটি নির্দিষ্ট অংশ শান্তি বাহিনীর টাকা হিসেবে বেঁধে দেয়। তেমনি চন্দ্রাবান কাগজের বিলের জন্ত প্রয়োজন কাঁচা মাল বাণেশ্বর। বাণেশ্বর ঠিকাদারদেরও শান্তি বাহিনীর টাকার জন্ত বিলের একটা নির্দিষ্ট অংশ ছাড় হওয়া হয়েছিল। রাস্তাঘাট নির্মাণ সম্পূর্ণ না হওয়া এবং সরকারি ট্রুপ সব জায়গায় না পৌঁছান পর্যন্ত শান্তি বাহিনী সরকার থেকে এই পরোক্ষ টাকা পেয়েছে।^১

প্রথমে সরকারি পরোক্ষ টাকা বন্ধ, তারপর দলে ভাঙন, পরিণতিতে উপজাতি জনগণের মোহ কেটে যাওয়া, সব মিলিয়ে শান্তি বাহিনী দারুণ সংকটে পড়ে। সংকটের কণে বিশেষদ্বারা হয়ে শান্তি বাহিনীর অনেক নেতা এবং কর্মী বাংলাদেশ মিলিটারি সরকারের আত্মানে আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণকারীদের সংখ্যা কীভাবে খুঁজে বের সরকারি মহল থেকে জানানো হয়েছে।

শান্তি বাহিনীর দুই গোষ্ঠীর কার্য ক্ষমতা ও পথ সঠিক, নাকি উভয় গোষ্ঠীই মন্দ

ও পথ বেটিক, তা বলার বত চূড়ান্ত সময় এখনও আসেনি। সেই রাত্তিরে ঘোষণা করার অধিকার আছে শুধু আগামী দিনের ইতিহাসের।

শান্তি বাহিনী এখনও ভাঙনের বিপন্ন কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অন্তর্ভাবে ক্ষত-বিক্ষত শান্তি বাহিনীর সঙ্গে সরকারি বাহিনী তেমন একটা সংঘর্ষের সুখোমুখী ইহানীং আর হচ্ছে না। তার অর্থ অবশ্য এই হচ্ছে উচিত নয় যে শান্তি বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিংবা সোজা হয়ে পাড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সশস্ত্রভাবে তৎপর নিয়ন্ত্রিত একটি গোপন দলের চাইতে অনিয়ন্ত্রিত দলের শোকাবিলা করা কষ্টসাধ্য। শান্তি বাহিনীর প্রাথমিক ভাঙন পরবর্তীতে আরও ভাঙনের কারণ হতে পারে। ভাঙন হলে সংগঠনের শক্তি হ্রাস পায়। কিন্তু তার সঙ্গে ধুলে যায় এখানে ওখানে অনেকগুলো অপরিচালিত ও অনিয়ন্ত্রিত ফ্রন্ট। যে কোন নিয়মিত বাহিনীর পক্ষে পার্বত্য গভীর অরণ্যকূলে এই পেরিলা তৎপরতা সমূলে বিনষ্ট করা সহজসাধ্য নয়। স্বরণে রাখা উচিত, শান্তি বাহিনী সশস্ত্র সশস্ত্র সংখ্যা খুবই কম, সম্ভবত হাজারের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু সংখ্যা বহুতার শূন্যতা তরিয়ে দিয়েছিল সমস্তদের ভাগ, সাহসিকতা আর বৃত্তাকে জয় করার ইম্পাত কঠিন সংকল্প। তাই বেধা বার, বহু সংখ্যক সশস্ত্র নিয়ে গঠিত শান্তি বাহিনীর পেরিলা তৎপরতা ধ্বংস করতে সরকারকে নিয়োগ করতে হয়েছে এক ডিভিশনের বেশি সামরিক ও আধা-সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সহায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অসন্তোষের মূল কারণ জিইয়ে রেখে মিলিটারি অপারেশন চালিয়ে সমস্ত জাতিগত গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া শান্তি বাহিনীকে নিমূল করা সম্ভব নয়। ভাঙনের পর জনমনে শান্তি বাহিনী সম্পর্কে যে ভীতি ও বীতশ্রদ্ধা জন্ম নিয়েছে, তা থেকে নিজেকে বাঁচা হচ্ছে কেবার ক্ষমতা উজ্জ্বল হল হরত এক সময়ে শান্তি বাহিনী নাশ পরিত্যাগ করবে। শান্তি বাহিনী বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু বতর্বিদ উপজাতিদের মৌলিক সমস্ত স্বাধীন সম্মান না হার, ততদিন সন্তানরা এক বা একাধিক গোপন সংগঠনের পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে আবার সম্মান পাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে আশঙ্কা

কুমার দেওয়ানের মূল্যায়ন বর্ষায়, 'With the emergence of Bangladesh, this district (Chittagong Hill Tracts) has become one of the serious trouble spots of South Asia. The problem is similar to the Naga and Mizo in Eastern India, the Kurds in Iran and Iraq, the Britrean movements in Ethiopia and similar movements throughout the world'.^১

১। এ. কে. দেওয়ান, ক্রাস এন্ড এর্থিনিমিটি ইন ইলস অফ বাংলাদেশ, (পি. এইচ. ডি.র জন্য লিখিত অপ্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ) নৃত্য-বিভাগ, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা, ১৯৭২, পৃঃ-৭।

শেষ কোথায় ?

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্ম ও জাতিগতভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহের সমস্যাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। অর্থনৈতিক কারণেই সমস্যার সৃষ্টি, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সরকার ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে উপজাতিদের অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। বোর্ডের মোট সদস্যের ষট শতাংশ উপজাতি হলেও মূল নিয়ন্ত্রণ সরকারের ক্যাবিনেট ডিভিশনের হাতে। উন্নয়ন বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নয়। অথচ এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, ক্ষমতা সাধারণতঃ হয়ে থাকে স্বায়ত্তশাসিত। বোর্ডের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত করার জন্যও তা প্রয়োজন। নেতৃস্থানীয় উপজাতিদেরকেই বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। নগচ অর্থনৈতিকভাবে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে উপজাতিদের কল্যাণ হবে, সেই নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা গৌণ। ক্ষমতাও নিতান্তই সীমিত। নেই বললেই চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও তাদের উন্নয়নের ওপর মোহাম্মদ এম. হক তাঁর পবেষণাকর্ম প্রবন্ধ, ‘Government Institutions and underdevelopment : a study of the tribal peoples of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh’-এর একস্থানে বোর্ড সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, ‘Real authority lies with the Cabinet Division at the Central Secretariat...Even if the tribal component of the Board’s personnel were 100 percent instead of the present 60 percent and the tribal representatives were in the majority in the consultative Committee the situation could not have changed substantially.’¹ তাই অভিযোগ উঠেছে,

M. M. Hoque, Government Institution and underdevelopment, a study of tribal peoples of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, Institute of local Government Studies, University of Birmingham, Dec’. 82,

বোর্ডের সিংহভাগ টাকা মিলিটারি খাতে ও শরণার্থী পুনর্বাসনের জন্যই খরচ করা হয়, উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নয়। উপজাতিদের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। ব্যাপক শরণার্থী পুনর্বাসনের ফলে জমি হারাতে বাধ্য হওয়া উপজাতিরা অর্থনৈতিকভাবে আরও পঙ্গু হয়ে গিয়েছে।

এটা সত্য যে, চল্লিশ দশকের পার্বত্য চট্টগ্রাম আর আশির দশকের পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে পার্থক্য অনেক। জেলার বোণাখোণ ব্যবহার প্রস্তুত উন্নতি হয়েছে। স্কুল-কলেজ গড়ে উঠছে মহকুমায়, থানায়। অফিস-আদালত খোলা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। কল-কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। তার সঙ্গে শুরু হয়েছে ব্যাপক বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প। বাড়ছে ব্যস্ততা। প্রসারিত হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র। কিন্তু সুই নীতি প্রণয়ন ও তা কার্যকরী করার বাস্তবোচিত পদক্ষেপ না থাকার ফলে উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে সমষ্টিগতভাবে উপজাতিদের জড়ানো যায় নি। তাই দেখা যায়, বাঁদের আগেও ছিল, এমন স্থিতির উপজাতিদের আয় ও জীবনধারণের মান আরও উঁচুতে উঠে যাওয়া ছাড়া জেলায় গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কল্যাণে বা কিছু অজিত অর্থনৈতিক সুফল সাধারণ উপজাতিদের করে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলী কাগজের কলে মোট ৬,০০০ কর্মরত শ্রমিকের মাত্র ৪০ জন হিন্দি উপজাতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থাপিত রেগন, ম্যাচ ও সিগারেট কারখানাসমূহেও উপজাতি শ্রমিকের সংখ্যা একই ধরনের। ১৯৭৮ সালের ১২শে এপ্রিলের The Economic and Political Weekly-র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'The industries and factories in the Chittagong Hill Tracts do not benefit the tribal people as all employment goes to the non-tribals. More factories and industries mean more jobs for the non-tribals (plains men), and more hardship to the hill people'.

কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে তৈরি হয়েছে বিরাট একটি কৃত্রিম হ্রদ। হ্রদ সরকারি উদ্যোগে বাছচাষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা বাতে বাছ ধরে ও বিক্রী করে নিজেদের খাবারী করে তুলতে পারে সেইজন্য সরকার জাল ও বাছ ধরার 'অস্ত্রান্ত সরঞ্জাম' যেমন মোকা, স্পীডবোট কেনার জন্য বিশেষ কল প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিন্তু বাজার তৈরি করা হয়নি বর্থাৎ বর্থাভাবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে,

মাছ-লিকারীরা এক সের মাছ বিক্রি করছেন ৩০ পয়সায়, তা পাইকারী বিক্রেতার বিক্রি করছেন ২ টাকা সের এবং শহরাকলে তা বিক্রি হচ্ছে সের প্রতি ১৫ টাকা। কাঁচামালের বাজারের অবস্থাও তথৈবচ উপজাতি কৃষকরা অন্ততঃ নিচু বটে। তাঁদের কৃষি উৎপাদন বিক্রী করতে বাধ্য হন। সরকারি উদ্যোগে এই ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা না থাকার ফলে উপজাতি কৃষকরা দারুণভাবে মার খাচ্ছেন।

কখনও আবার উপজাতি সমস্যাকে অভিহিত করা হয়েছে সামাজিক সমস্যা হিসাবে। উপজাতিদের প্রচলিত প্রথা ও কাঠামো মতে তিন রাজা সমাজের তিন প্রধান পুরুষ। তিন রাজার অধিষ্ঠান দিবস বা পুণ্যাহ অথবা রাজসভা ভাতা যাতে ঠিক ভাবে হয়, তার দিকে নজর দেওয়া। রাজার প্রতি উপজাতিদের শ্রদ্ধাভক্তি থাকলেও তা ক্রমশঃ ক্ষয়ে আসছে। তিন রাজাকে বংশানুগত লোক দেখানো রাজসভা ভাতা কিংবা অধিষ্ঠান দিবস পালনের জন্য সরকারি অর্থায়ন করে বহু আয়ের দৃষ্টিতে আর সাধারণ উপজাতিরা দেখছে না। সামাজিক সমস্যা বলতে তারা এখন ব্যাপক অর্থে বোঝে। সামাজিক কাঠামো আগের মত নেই। ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে। উপজাতি সমস্যা বর্তমানে চরম সংকটের মুখোমুখি। সেই ক্ষেত্রে তিন রাজার সুযোগ সুবিধা যদি কিছুটা বাড়ে, তাহলে উপজাতিদের মনে তা কোন আবেদন সৃষ্টি না করারই কথা।

উপজাতি সমস্যাকে কোন সময় বলা হয়েছে সাংস্কৃতিক সমস্যা। সাংস্কৃতিক সমস্যা মেরানোর জন্তু গঠন করা হয়েছে উপজাতি সংস্কৃতি উন্নয়ন বোর্ড। এই বোর্ড প্রায় হারিয়ে যাওয়া উপজাতি গল্প, গান, উপাখ্যান উদ্ধার করে বই আকারে প্রকাশের চেষ্টা করছে। বাংলা হরফে মারমা, চাকমা, জিপুরা ভাষার সাময়িকী, কখনও বা বই প্রকাশিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, সরকারি অঙ্গুষ্ঠানে এই সব কিছু সম্ভব হচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ওঠা বাতাবিক—তিন প্রধান উপজাতি সম্প্রদায়ের—চাকমা, মারমা, জিপুরা—নিজস্ব কর্মশালা রয়েছে। কেন সেই হরফে সাময়িকী বের করছে না সংস্কৃতি উন্নয়ন বোর্ড? কেন সংস্কৃতি উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব পরিচালনাধীনে উপজাতি হরফের ছাপাখানা খুলছে না? কত কয়েকটি উপজাতি সম্প্রদায়েরও নিজস্ব অক্ষর আছে। সেইগুলো সংরক্ষণের চেষ্টা কেন করা হচ্ছে না? শুধু তাই নয়, উপজাতিদের মনে নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য রচনার আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মিক উন্নয়নে সরকার কতটুকু করল, সেই বিষয়টুকু আমাদের অধ্যাপক চট্টগ্রামের ফুলজলোতে একটা

পর্বত পর্বত উপজাতি হাজারের জন্ত কোন বাধ্যতামূলক উপজাতি ভাষা ও সাহিত্য কোর্স এখনও চালু করা হয় নি ?

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অসন্তোষকে কখনও আবার বলা হয়েছে আইন শৃংখলার অস্তাব্জানিত অবস্থা। আইন শৃংখলার অবনতি রূপে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে হাজার হাজার মিলিটারি, পুলিশ, বি. ডি. আর.। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে গত প্রায় একদশকে সরকারি ও শান্তি বাহিনীর সমস্ত, সাধারণ উপজাতি ও পরণারী সব মিলিয়ে কয়েক হাজার লোক নিহত, হাজারের অধিক উপজাতি জেলবন্দী ও কয়েক হাজার পরিবার গৃহহারা হয়েছে।^১ আইন শৃংখলা অবনতির অঙ্গুহাতে সরকার এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপক্রম জেলা হিসেবে চিহ্নিত করে মিলিটারি অপারেশন অব্যাহত রেখেছে। এত কিছু পরও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্তার কোন সুরাহা না হওয়ায় এটা প্রমাণিত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্তা শুধু আইন শৃংখলার সমস্তা নয়। অসন্তোষের কারণ আরও গভীরে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সঙ্কট রাধার নামে শুধু তিন রাজাকে সঙ্কট করার চেষ্টা করা হয়েছে। বৃটিশ থেকে আজকের বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সরকার এই ট্রাডিশন সমানভাবে অঙ্গুরণ করে গেছে এবং করছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্তা সমাধানের উদ্দেশ্যে রাজা জিহিব রায়কে সম্মানে দেশে কিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। রাজা জিহিব রায়ের মা রাজমাতা বিনীতা রায় ও কাকা কুমার কোকনালক রায়কে এই উদ্দেশ্যে যাকিন হুজুরাট্টের নিউইয়র্ক শহরে পাঠানো হয়েছিল। রাজা জিহিব রায় তখন জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে জাতিসংঘে থাকার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজা জিহিব রায় বাংলাদেশ সরকারের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তখন ইন্ডোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন আব্দুল মালিক। রাজা জিহিব রায় ও আব্দুল মালিক ছিলেন ব্যক্তিগত বন্ধু। আব্দুল মালিক রাজা জিহিব রায়কে বোকানোর চেষ্টা করেছিলেন যে রাজনীতিতে শেখ কথা বলতে কিছু নেই। স্বামী বন্ধু বা স্বামী পক্ষও কেউ নেই। তিনি নিজেও পাকিস্তানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বত্বস্বত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু

১। সাইমন উইনস্টোন, ব্রডভিউ টাইম স্টারভ ইন অংগল জেনোসাইড, বি পল্লভ টাইমস, মার্চ ১৩ অক্টোবর, ১৯৮৩।

পাকিস্তানের বন্ধুরা পাকিস্তানের পতন রোধ করতে পারেন নি। বাংলাদেশটি একটি বাস্তব সত্য। রাজনৈতিক কারণে ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিয়েছে। আহমদ মালিক নিজেকে বাংলাদেশ ঘুরে এসেছিলেন। তাই আহমদ মালিক রাজা জিদিব রায়কে বার বার অহরোধ করেছিলেন, যেন তিনি বাংলাদেশে ফিরে যান এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাজা জিদিব রায় তাঁর বন্ধুর অহরোধ রাখেন নি।^১

বাংলাদেশের প্রথম সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন মং রাজা মং প্র চৌধুরী। পঁচাত্তরে বাকশাল গঠন করার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই জেলাতে দুই রাজাকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। যদিও গভর্নর হওয়ার মত যোগ্যতা সাধারণ উপজাতিদের মধ্যে অনেকের ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে রাজমাতা বিনীতা রায়কে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে জিয়া অংগ টাউশন ভাঙ্গার চেষ্টা করেন। রাজপরিবারের কিছুটা বাইরেব সুবিমল দেওয়ানকে একবার উপদেষ্টা এবং অংশে প্র চৌধুরীকে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া মুখে স্বীকার না করলেও তাঁর কার্যকলাপে এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা তিনি রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে চান। তাই তিনি আশির সোড়ার দিকে গঠন করিগেছিলেন টাইবাল কনভেনশন। তিন সার্কুলের তিন রাজা এবং চাক বিকাশ চাকমা, শান্তিময় দেওয়ানের মত শ্রদ্ধের ব্যক্তিরও এই টাইবাল কনভেনশনে যোগ দিয়েছিলেন। তৎকালীন মন্ত্রী অংশে প্র চৌধুরীও ছিলেন কনভেনশনের অল্পতর সদস্য। শান্তি বাহিনীর বিকল্প হিসেবে সরকার টাইবাল কনভেনশনকে পেতে চেয়েছিল। কনভেনশনের কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না। চট্টগ্রাম ডিভিশনের জি. ও. সি. মেজর জেনারেল মজুমদার নির্দেশ মতই কনভেনশন চলত। সামরিক সরকারের সুবিধামাফিক চলতে গিয়ে কনভেনশন সামগ্রিকভাবে উপজাতি জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও, কনভেনশন গঠিত হবার তিন মাস পর কনভেনশনের সাধারণ সম্পাদক চাক বিকাশ চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাভাবিক অবস্থা কল্পিয়ে আনতে ও উপজাতি বর্ষ বন্ধ র জয় হ্রদ হিসেবে চারটি দ্বাি পেশ করেন।

এক, একজন চাক কমিশনারকে প্রশাসনিক প্রধান করে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা

প্রবর্তন। পদাধিকার বলে চট্টগ্রাম ডিভিশনের জি. ও. সি.-ই হবেন চীফ কমিশনার। দুই, চীফ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি উপজাতি মন্ত্রণালয় গঠন। তিন, উপজাতি সম্পর্কিত রিপোর্ট সরাসরি প্রেসিডেন্টের নিকট দাখিল ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ে দায়িত্বভার পালন করার জন্য পৃথক একটি সচিবালয় স্থাপন। চার, নির্বাচিত ষাট জন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক পরিষদের কাজে দায়বদ্ধ এমন একটি প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

দাবিগুলো নিয়ে কনভেনশনের নেতাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছিলেন। টাইবাল কনভেনশনের নেতাদের অগ্ররোধে প্রেসিডেন্ট জিয়া শান্তি বাহিনীর নেতাদের সঙ্গেও আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর সব উদ্যোগ ভেঙে যায়।

উপজাতি জনগণের একটা অংশ এবং কিছু নেতার জাতীয় পর্যায়ে নেওয়া কোন পদক্ষেপের প্রতি চরম অবিশ্বাস কোন ক্ষেত্রে চরম বৈরিতা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। জাতীয় বলে থেকে জাতীয় পর্যায়ে যে অনেক কিছু করা যায়, তার প্রমাণ জাঙ্গদের প্রাক্তন সংসদ সদস্য উপেন্দ্রলাল চাকমার প্রশংসনীয় ভূমিকা। জাতীয় সংসদে, সংসদের বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মিলিটারি অভ্যুত্থানের কথা বেড়াতে তিনি তুলে ধরেছেন, মিলিটারি অভ্যুত্থারে হুঃ উপজাতিদের পাশে যে সাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং উপজাতিদের দ্বারা অধিকারের কথা যে বলিষ্ঠ ভাষায় তিনি বলেছেন, তার মূল্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লায়মার ঐতিহাসিক ভূমিকার চাইতে বেশী না হলেও নিশ্চিতভাবে কম নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিবলনে উপজাতিদের বর্তমান চারটি মূল দাবি হল— এক, শরণার্থী পুনর্বাসন বন্ধ করা। দুই, পুনর্বাসিত শরণার্থীদের কিরিয়ে নেওয়া। তিন, উপজাতিদের জমি কিরিয়ে দেওয়া। চার, ডিট্রাক্ট অটোনমি বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। পৃথিবীর সব দেশেই, এমন কি প্রতিবেশী দেশ ভারতেও উপজাতিরা নিজেদের স্বাভাব্য, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করে। সেদিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার থাকা উচিত।

যে কোন দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের মনে বিশ্বাস ও সংহতির বীজ বুনতে প্রয়োজন সূঁহ জাতীয় নীতি। সূঁহ জাতীয় নীতির অভাবে আমেরিকার বেত ইন্ডিয়ানরা নিজে খুঁদি থেকে বিজড়িত এক বিলুপ্ত প্রাণ। অভাবকে সোচ্চারিত

ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কার্ঠামো ও জাতীয় নীতি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জাতি ও জাতিসত্তা স্বতন্ত্র অথচ বহু রাষ্ট্রের একা ও সংহতির ধারা নিয়ে বিকশিত হতে পারে। বর্তমানে সেক্ষেত্রে ইউনিয়নে পনেরটি ইউনিয়ন রিপাবলিক, কুড়িটি স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক, আটটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং দশটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা রয়েছে। এই ব্যবস্থার প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে আলাদা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর স্তম্ভ দেওয়া হয়েছে আলাদা স্বায়ত্তশাসিত এলাকা। এতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনের বিকাশ ঘটছে নিজস্ব ধারায়। বাংলায় বোকার প্রতিশব্দ হিসেবে 'উজবুক' কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 'উজবুক' শব্দটি এসেছে উজবেগ থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান উজবেকিস্তান আর জারের আমলের উজবেকিস্তানের কার্যকর আকাশ পাতাল। তখনকার উজবেকিস্তানের লোকেরা এত অল্পবয়স্ক ও ছুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল যে, বাইরের লোকেরা তাদের বোকা বলত। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্নুই জাতীয় নীতির ফলে উজবেকরা বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রসঙ্গটি সেই আলোকে বিবেচিত হতে পারে।

দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজসেবী ও বিরোধী হলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সমাধানে আগ্রহভরে এগিয়ে আসবে, এটা নিশ্চয়ই উপজাতি জনগণ কামনা করে। কারণ এই সমস্যা শুধু সরকারের কিংবা উপজাতিদের নয়। এই সমস্যা জাতীয় সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলার উত্তরে প্রতিবেশী দেশ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তর-পূর্বে মিজোরাম এবং পূর্বে বার্মার আরাকান অঞ্চল। এই সব অঞ্চল ধরে দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র ভৎসনতা দানা বেঁধে উঠেছে। খোলা জলে বাছ শিকারের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক চক্র ওং পেতে রয়েছে এই সব অঞ্চলে। বার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সংস্থার উন্নয়নের এক্ষেত্রে জনের এক ঘোষণার জানা যায়, সেই দেশের খরাষ্ট্র যুক্তকর (স্টেট ডিপার্টমেন্ট) যুক্ত 'প্রজেক্ট ব্রহ্মপুত্র' নামে একটি প্রকল্প নিয়ে ভারতে কাজ চালিয়েছিল এই সংস্থা। উদ্দেশ্য, ভারতের বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা যায় কিনা, তার জন্য জনমত বাচাই করা। তারও আগে, ছেবটির সাতই ডিসেম্বরের প্রজেক্ট ইন্টারভিউতে ডে গ্রেনসা (ইন্টারভিউয়াল প্রেস সার্ভিস)-র এক রিপোর্টে জানা যায়, বার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উত্তর

পূর্বাঞ্চল ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার বড়বস্ত্র করেছিল। এখনও বেশা যায়, বিদেশের কোন পত্রিকা বা বইয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাহ্য দ্বিধে বাংলাদেশের মানচিত্র দেখানো হয়েছে। মানচিত্র অঙ্কনে বৈধাৎ জনিত ভ্রুট বলে বাংলাদেশকে দ্বিধে পাশ্চাত্য কিছু দেশের দুরভিসন্ধি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই দুরভিসন্ধির উদ্দেশ্য একটাই, উপমহাদেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দ্বিধে উন্নয়ন ব্যাহত করা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার মাধ্যমেই সাধারণত এই ধরনের বড়বস্ত্র পেতে ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে অনেকগুলো সাহায্য সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। মিলিটারি সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়েই এই সব সংস্থার পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন ঘটেছে। এই সব সংস্থার কাজ প্রধানত বিবিধ। এক, রাস্তাঘাট নির্মাণ, আদর্শ গ্রাম, কৃষি ও পশুপালন খারার গড়ে তুলতে সরকারকে সাহায্য করা। দুই, সরকারের অগোচরে পোপনে সরকারের বিরুদ্ধে উপজাতিদের উদ্বিগ্নে দেওয়া। প্রকল্পের পঁচানব্বই শতাংশ কাজ হয়ে যাওয়ার পর অনেক সংস্থা, সরকারের নেওয়া প্রকল্প উপজাতিদের ভাগ্যোন্নয়নে সাহায্য করছে না, এই অভিযোগ তোলে এবং উপজাতিদের নিদারুণ দুর্দশায় কুমিরের কাণ্ডা কেঁদে, প্রকল্প অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে যাচ্ছে। এতে সাপও মরছে, লাঠিও ভাঙছে না। সংস্থাগুলো যে দেশগুলোর, সেই সব দেশে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের হুমুসু অবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্ত নানা ধরনের মানবাধিকার সংক্রান্ত সংগঠন গড়ে উঠছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক বড়বস্ত্র দানা বেঁধে ওঠার প্রধান কারণ তেল। তেলের জন্ম বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন কয়েকটি বিদেশি সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক জরীপ চালিয়েছে। এই জেলার তেল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল বলে জরীপের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারকে অগ্রিম টাকা দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি সিসমো-গ্রাফিক সারভে লিং, করাসী কোম্পানি জেনারেল জিওপিজিকস বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমাজকে আর্থিক ও সামাজিকগত ব্যবস্থাবির দ্বারা সমাধানের যে পর্দায় ছিল, সেটা অনেকদিন আগেই শেয়িয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের উদ্বাসীনতা ও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারের মূল্যায়ন ও তুল পদ্ধতিতে আজ এই সমাজ শুধু রাজনৈতিক নয়, এমন একটি মানসিক পর্দায়ও গিয়ে

পৌছেছে, যার সমাধান কোন রাজনৈতিক চক্র সৃষ্টির দ্বারা সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে, সরকার যদি আজ কোন ইতিবাচক ব্যবস্থাও গ্রহণ করে তাহলেও এই পর্বায়ে তার কোন সুফলই পাওয়া যাবে না। কারণ সরকারি কোন ব্যবস্থাকেই উপজাতিরা আর আমল দিতে চায় না। ক্ষতের আসল উপশম ব্যক্তি এখনও গৃহীত হয়নি। তাই উপজাতিদের জন্য সুষ্ঠু জাতীয় নীতি প্রণয়নে সরকার বিরোধী দলগুলোর প্রতিনিধি ও উপজাতি নেতৃবৃন্দের সমান কৃমিকা থাকা উচিত। ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নীতি অগ্রসারেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্তার বাস্তব সমাধান সম্ভব। নিরাপদ আচরণ বিধির প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্তি বাহিনীর উভয় গোষ্ঠির সঙ্গে সমস্তা ও সমাধান নিয়ে অবিলম্বে সরকারের খোলায়েনা ও সরাসরি আলোচনার সূত্রপাত করা সরকার।

আশার কথা, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশের কোন সরকার বা বলেননি, তা বলিষ্ঠভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জেনারেল এরশাদ। সরকারের দায়িত্বভার হাতে নেবার পর তির্যশির তেগুরা অক্টোবর খাগড়াছড়ি, বান্দরবন ও রাঙামাটিতে অস্থিষ্ঠিত পৃথক পৃথক এলাকায় তিনি ঘোষণা করেছেন যে, উপজাতিদের স্বার্থরক্ষা ও বিকাশ সাধনে উপযোগী হবে এমন একট 'হিল ট্রাক্টন' মাস্টারয়েল প্রণয়ন ও তার যথাযত প্রয়োগ করা হবে। উপজাতি নেতৃবৃন্দ ও শান্তি বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা সমস্যা কিভাবে নিরসন করা যায়, তা নিয়ে আলোচনার বলার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন।

দেশ গণতান্ত্রিক সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তবে সুষ্ঠু জাতীয় নীতি প্রণয়ন সম্ভব। সাময়িক শাসনের অবসান করতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে রাজনৈতিক নেমেছে দেশের সব কটি বিরোধী দল। জেনারেল এরশাদও বলেছেন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। উপজাতি নেতারাও এই আন্দোলনে শরিক হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে পারেন। সচেতন উপজাতির একটা অংশ মনে করেন শুধুমাত্র সরকারের কাছে স্বাক্ষরলিপি পেশের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপজাতি সমস্যার প্রতি দেশের সর্বশ্রেণীর নাগরিকের আগ্রহ সৃষ্টি ও বাস্তবায়ন সমাধানে তাঁদের উদ্যোগ ও সমর্থন আহ্বান করা সম্ভব হলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট নিরসনের দ্রুত তৈরি হতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সত্যিকারভাবে কি ঘটছে, কেনই বা উপজাতি অসন্তোষ, উপজাতিদেরই বা

স্বাধীনতা কি, তা দেশের অধিকাংশ মানুষ জানেন না। সরকারি একপেশে ভাষা থেকে তাঁরা বা জানতে পারেন, তা থেকে উপজাতি সমস্যা সঠিকভাবে বোঝা শক্ত। সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, সরকারি অপপ্রচারের ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষের মনে এই ধারণা জন্মাতে শুরু করেছে যে, অধিকাংশ উপজাতি বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিধেয়ী। এই ভুল ধারণার অবসান করতে সরকার উপজাতিদের ব্যাপক প্রচেষ্টা এবং সমর্থক জাতীয় জীবনে নিজেকে সার্থক ভূমিকা খুঁজে নেওয়া। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ থাকা ও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল উপজাতিদের সমস্যার সমাধান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সম্প্রদায়সমূহ সঠিক নেতৃত্বের শূন্যতার ভুগছে। তবে ভাঙ্গা, কোন সম্প্রদায় বা জাতি দীর্ঘদিন নেতৃত্ববিহীন থাকে নি। ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদেই নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। উপজাতিদের অনেকে আশা পোষণ করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার বেশ কিছু ছাত্র ও তরুণ উপজাতি নেতা ধীরে ধীরে উঠে আসছেন। এই ধরনের কিছু ছাত্রনেতা সংঘটিত হয়ে গঠন করেছেন ‘ঢাকা টাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন’। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার সঠিক চিত্র দেশের জনগণের সামনে তুলে ধরতে নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করছে এই সংগঠন, সংগঠনের প্রচার পত্র, সাময়িকী ও জাতীয় পত্র-পত্রিকায় লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে। ঢাকা টাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন গড়ার পেছনে অবদান রেখেছেন সন্তানবান্ধব অনেক ছাত্রনেতা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন হীপেন দেওয়ান, উৎপল দেওয়ান, কন্যাণ মিত্র চাকমা, রূপক ধীমা, রং তিং ফো, অরুণ চাকমা, কণিকা চাকমা, বুদ্ধি বাহাদুর ও কুলোস্তম চাকমা। উপজাতিদের একটা অংশ ঢাকা টাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়নের কার্যকলাপ আশা ও আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়ার আগে পনের দলীয় প্রেক্ষাপটের নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজ্জেদ রাজনৈতিক সত্রে বাগড়াছড়ি বেতে চেয়েছিলেন। সরকারি বিধিনিষেধের ফলে জনসত্তার বক্তব্য রাখা পুরের কথা, তিনি জেলায়ও কোন রাজনৈতিক সংগঠন চালাতে পারেন নি। এখন প্রশ্ন, দেশে রাজনৈতিক সত্যসমিতি নিষেধ নয়। তাহলে, পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন এই কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ? পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্ত কেন আলাদা আইন? সারা দেশের

সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিল কোথায় ? তাহলে, শান্তি বাহিনীর উগ্রপন্থী অংশের দাবি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড নয়—এ্যানেক্স, কী সত্যি ? পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসভা ও রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর সরকারের নিকট কড়া প্রতিবাদ জানানো উচিত। জানা উচিত কেন এই বৈষম্য ? দেশের রাজনৈতিক হাওয়া এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্ম ও জাতিগত ক্ষুদ্র জনসৌষ্ট্রী সমূহকে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার প্যারামিটি দিয়ে জাতীয় মূলস্রোতের ভাবধারার সঙ্গে মেলানোর পক্ষে অগ্রসর। পনের ও সাত দলীয় ঐক্যজোট উপজাতি ইহুয়ার ওপর পরিচালিত বক্তব্য ও সঠিক পরবেশ মিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন প্রায়শী সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি ইতিহাসের দায়। সেই দায়-দায়িত্ব পালনের ভার রাজনৈতিক পরম্পরাগতভাবে বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হাতে এসেছে। ইতিহাসের এই দায় স্মৃতিভাবে মিটিয়ে ফেলতে বা পালনে এলোমেলো বা গোঁজামিল নীতি অমূল্যরূপে অবকাশ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করেন যে, উপজাতি সম্পর্কিত সব দায়-দায়িত্ব সরকার ছেড়ে দিয়েছে কয়েকজন আমলার হাতে। বাংলাদেশের প্রথম সরকার থেকে আজ অধি কোন সরকারেরই উপজাতি সমস্যা দেখানো করার জন্য রাজনৈতিক কমিটি নেই। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক কমিটি যদি গঠিত হত, তাহলে আমলাতন্ত্রের খেচ্ছাচারিতার কারণে জটিল থেকে জটিলতর হতে হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা বর্তমানের সঙ্কটরূপে ধারণ করত না।

রাজনৈতিক লড়াইয়ের মোকাবেলা রাজনৈতিক চমক নয়, রাজনৈতিক ভাবেই হওয়া প্রয়োজন। মূল সমস্যা এড়িয়ে ও জিইয়ে রাখলে কোন সমস্যার বক্তব্য সমাধান সম্ভব নয়। বৃহত্তর জাতীয় দ্বাৰ্শে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার স্থায়ী সমাধানে অনতিবিলম্বে রাজনৈতিক পরবেশ নেওয়া দরকার। কারণ অন্য সব সময় সব প্রব্লেম উত্তর দিতে পারে না।

বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট পার্বত্য-চট্টগ্রামের জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবীর আবেদন পত্র

—:—

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভাবী শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক অধিকার স্বাক্ষরে গৃহীত হয়, তৎক্ষণাত পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি প্রতিনিধিত্বপূর্ণ গণ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ ইংরেজী তারিখে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এই স্মারকলিপিবাদী মনে প্রাণে সমর্থন করি এবং গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভাবী শাসনতন্ত্রে “নবজীবনের প্রতীক্ষায়” রয়েছে।

স্মারকলিপিতে নিম্নলিখিত “চারিটি বিষয়” উত্থাপন করা হয়েছে :

“১। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্ত্ব শাসিত অঞ্চল হবে এবং ইহার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২। উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য “১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির” ক্ষাদ্য় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩। উপজাতীয় রাজ্যদের স্বতন্ত্র সংরক্ষণ করা হবে।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন হেন না হয়, এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।”

স্মারকলিপিতে বর্ণিত “চারিটি বিষয়” যে আমাদের ক্ষারসম্পত্ত দাবী, তৎক্ষণাত আমরা আমাদের সাধারণ অস্থায়ী আমাদের বক্তব্য ভুলে ধরছি। এক কথায় বলতে গেলে “চারিটি বিষয়” হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের চাবিকাঠি। নিজস্ব আইন পরিষদ সহ একটি স্বায়ত্ত্ব শাসিত অঞ্চলে

পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিণত করার জন্য আমরা আমাদের দাবী উত্থাপন করেছি ; বছরকে বছর ধরে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ আমলের দিন থেকে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ধ্বংসের দিন পর্যন্ত আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীরা খুবই দুর্বিষহ জীবন বাশন করেছি ; যার ফলে আমাদের বৈধত্বও ভেঙে গেছে এবং আমাদের জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হয়েছে । পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল (Excluded Area) । কিন্তু ভাগ্যের এমন নির্বম পরিহাস যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ “উপজাতীয় জনগণের আবাসভূমি” হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল তথাপি বাস্তবে ইহা মিথ্যা এবং প্রহসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না ।

বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে রাখার জন্য শাসনের সুবিধার্থে আইন প্রয়োগের জন্তে ১৯০০ সালে ব্রিটিশ সরকার “১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি” ঘোষণা করেন । এই শাসনবিধি পুরোপুরি ফ্রটিপূর্ণ । এই শাসনবিধি একটি অগণতান্ত্রিক শাসনবিধি । এই শাসনবিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোন বিধি ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি । বাংলাদেশের গভর্নরের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্র করা হয়েছে এই শাসনবিধি দ্বারা । গভর্নর খুবই ক্ষমতামালী । তিনি যে কোন সময়ে যখন মনে করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশাসন ও শান্তির পক্ষে ইহা প্রয়োজন, উপযোগী এবং উপযুক্ত, তখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন প্রয়োগ করেন, নতুন রুলস ও রেগুলেশন বাতিল করেন । তিনি এতেই সন্তোষ প্রকাশ করেন যে স্বেচ্ছামূলকভাবে তিনি অনেক কিছু করতে পারেন । তিনি কোনও আইন পরিষদের নিকট জবাবদিহি হতে বাধ্য নন । গভর্নর হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন পরিষদ । গভর্নর আইন প্রণয়ন করেন এবং তার জেলা প্রশাসন ইহা কার্যকরী করেন । কলে পৃথক শাসিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়ে । সর্বশেষে আগের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ গিচ্ছিয়ে পড়ে থাকলো ।

ব্রিটিশ সরকার আমাদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে । পার্বত্য চট্টগ্রামের হতভাগ্য জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে । জনগণের কণ্ঠ তুলে দেবার জন্য ব্রিটিশ সরকার একটি অকৃত অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তন করে । জনগণ গভর্নর ও তার প্রশাসনের দ্বারা উপর নিৰ্ভর করে বাস করতে থাকে । পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বঞ্চিত করে ব্রিটিশ সরকার বাইরের মানুষকে প্রশাসন বিতরণে নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন কার্য চালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে এবং এইভাবে কালক্রমে বহিরাগতদের প্রভাব

জেলা প্রশাসনে প্রাধান্য লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ বাজার, নদী কন্দর প্রভৃতি সমস্ত ব্যবসায়ী কেন্দ্র সমূহ বহিরাগতদের হাতে চলে যায়। এইরূপে রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ জেলা প্রশাসন থেকে চ্যুত হয় এবং দূরে সরে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়, অর্থনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বহিরাগত ব্যবসায়ীদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা পাকিস্তান সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রামের হতভাগ্য জনসংগকে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসেননি। বরঞ্চ পক্ষান্তরে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাকে চিরতরে লুপ্ত করে দিবার পথ প্রশস্ত করে দেয়। অন্ত্যায় অবিচার সমগ্র জেলায় চরম নৈরাস্ত ও ভীতির রাজত্ব স্থাপন করে। কাশ্টাই বাঁধের ফলে ২০ হাজার ২ শত ৭৭ জন মানুষ ১৯৬০ সালে গৃহহারা, জমি হারা হয়ে যায়। সরকার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও উপযুক্ত পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করেনি। স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত ঘাচাই না করে ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাকে চিরতরে ঘুচিয়ে দিবার জন্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক এবং নিপীড়নমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ প্রতিবাদ করতে পারেনি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত অনন্তোপায় হয়ে জম্মুজমি চিরতরে ত্যাগ করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী ১৯৬৪ সালে ভারতে আশ্রয় পাবার আশায় সীমান্ত পাড়ি দেয়।

বেআইনী অহুপ্রবেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে জয়াবহ ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনসংখ্যা ছিল ২৪.৪৭% অমুসলমান ২.৫২% এবং মুসলমান ২.৯৪%। মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার কিছু অংশ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিব বাসিন্দা আর বাহ্যবাকী অংশ ছিল বাইরে থেকে আগত ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। কিন্তু গত চল্লিশ বছরে বহিরাগতের সংখ্যা অসম্ভবরকম ভাবে বেড়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বারবার পাকিস্তান সরকারকে এই বেআইনী অহুপ্রবেশ বন্ধ করে দিবার জন্য আন্দোলন জাগান করে। বহিরাগতদের দ্বারা বেআইনী জমি কন্সোলিডেশন ও বেআইনী জমি বেচখল ভীতভাবে বৃদ্ধি পায়। “১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি” অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনও রকমের কন্সোলিডেশন বহিরাগতদের জন্য

নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গভর্নর এবং তার জেলা প্রশাসন এই শাসনবিধিকে কার্যকরী করেনি। পক্ষান্তরে গভর্নর এবং তার জেলা প্রশাসন বহিরাগতদেরকে বেআইনী জমি বন্দোবস্তী ও বেআইনী জমি বেদখলের পথ নীরবে খুলে দেয়। “১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি” বেআইনী অগ্রপ্রবেশ বন্ধ করতে পারেনি, পারেনি বেআইনী জমি বন্দোবস্তী ও বেআইনী জমি বেদখল বন্ধ করে দিতে। এই শাসনবিধি অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা জনগণের হুগ হুগ ধরে পিছিয়ে পড়ে থাকার অবস্থার কোনও পরিবর্তন এনে দিতে পারেনি। কালক্রমে এই পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের নিকট অস্তিত্ব হারাতে থাকে।

জনগণের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা ঘেঁটে নয়। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তাবোধ এনে দিতে পারেনি। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা যাবে না। এই জন্তই আমরা “চারিটি বিষয়” উত্থাপন করে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত একটি আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবী তুলে ধরেছি। সুতরাং—

ক) আমরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সমেত পৃথক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পেতে চাই।

খ) আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার থাকবে, এরকম শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।

গ) আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষিত হবে এমন শাসন ব্যবস্থা আমরা পেতে চাই।

ঘ) আমাদের জমি বন্ধ—জুম চাষের জমি ও কর্ণযোগ্য সবজি জমির স্বত্ব সংরক্ষিত হয় এমন শাসন ব্যবস্থা আমরা পেতে চাই।

ঙ) বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেন কেহ বসতি স্থাপন করতে না পারে তৎক্ষণাৎ শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।

আমাদের দাবী তার সত্ত্ব দাবী। বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্ব শাসিত অঞ্চলে দাঁড়বে পেতে চাই।

ভারত তার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতা সন্ধান করেছে। ভারতের

জাতিসমূহ—বড় বা ছোট সকলে শাসনতান্ত্রিক অধিকার পাচ্ছে। ভারতের জাতিসমূহ ক্রমান্বয়ে ইউনিয়ন টেরিটরি এবং রাজ্য পর্যায়ের স্বাধীন অধিকারী হতে চলেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নও তার জাতিসমূহের সমস্যার সমাধান করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সকল জাতিসমূহকে শাসনতান্ত্রিক স্বাধীন দিয়েছে এবং গোটা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ইউনিয়ন রিপাবলিক, স্বায়ত্বশাসিত রিপাবলিক, স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় অঞ্চলে বিভক্ত করে জাতিসমূহের সমস্যার সমাধান করেছে।

পাকিস্তান সরকার আমাদেরকে নির্মমভাবে নিপীড়ন করে। গত চল্লিশ বছর আমরা সকল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলাম। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিকার অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয়ে আমরা আগের মতো পিছিয়ে পড়ে রয়েছি। এখনও আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার মানুষ অস্বাভাবিক পরিবেশে বাস করছে, এখনও হাজার হাজার মানুষ অগ্নি বৃগের পরিবেশে বাস করছে।

এখন নিপীড়নকারী, স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের দিন আর নেই। আমরা স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের সর্বরক্ষের নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়েছি। আমাদের বাংলাদেশ এখন মুক্ত। উপনিবেদিক শাসনের জোয়ার ভেঙে গেছে। এখন আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ চারিটি মূলনীতি—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্বাধীনপেছতা ও জাতীয়তাবাদকে উর্ধ্বে তুলে ধরে উচ্চস্বাভাবিকতায় নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্তর্গত অংশের ভাই বোনের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতার জনগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবেন।

জয় বাংলা!

সামবেল মাসারাম মাসারাম

গণ পরিষদ সভা

তারিখ—রাঙামাটি,

পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলা দেশ

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭২ সন।

এক

আম্বারক,

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

**THE CHITTAGONG HILL TRACTS
REGULATION, 1900
CONTENTS**

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

Section

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

**CHAPTER II
LAWS**

3. Chittagong Hill Tracts how to be administered.
4. Enactments applicable in Chittagong Hill Tracts.

CHAPTER III

APPOINTMENT AND POWERS OF CERTAIN OFFICERS

5. Appointment of Superintendent and Subordinate officers.
6. Investment of Assistant Superintendents with powers of Superintendent.
7. Chittagong Hill Tracts to be a district under the Superintendent.
8. Chittagong Hill Tracts to be a sessions division under the Commissioner.
9. High Court.
10. Power to withdraw cases.

CHAPTER IV

ARMS, AMMUNITION, DRUGS AND LIQUOR

11. Possession of firearms and ammunition, and manufacture of gunpowder.

12. Daos, spears and bows and arrows.
13. Intoxicating drugs.
14. Foreign spirit and fermented liquor.
15. Locally made spirit and fermented liquor.

CHAPTER V MISCELLANEOUS

16. Police
17. Control and revision
18. Power to make rules
19. Bar to jurisdiction of Civil and Criminal Courts.
20. Repeal of certain enductments.

THE SCHEDULE ENACTMENT DECLARED IN FORCE IN THE CHITTAGONG HILL TRACTS

APPENDIX A

A

REGULATION

TO

Declare the law applicable in and provide for the administration of the Chittagong Hill Tracts in Bengal.

Whereas it is expedient to declare the law applicable in, and provide for the administration of, the Chittagong Hill Tracts in Bengal, It is hereby enacted as follows :—

CHAPTER I PRELIMINARY

1. This regulation may be called the Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900

Short title, extent and commencement (2) It extends to the Chittagong Hill Tracts, and

(3) It shall come into force on such date as the Local Government may, by notification in the Calcutta Gazette, appoint.

Definition :

2. (1) In this Regulation—

(a) The expression “Chittagong Hill Tracts” means the territories for the time being defined as such by notification under sub-section (2) and

(b) “Commissioner” means the Commissioner of the Chittagong Division.

(2) The Local Government may with the previous sanction of the Governor-General in Council, by notification in the Calcutta Gazettee, define the boundaries of the Chittagong Hill Tracts, and may, in the like manner, vary those boundaries.

CHAPTER II

LAWS

3. Subject to the provisions of this Regulation, the Administration of the Chittagong Hill Tracts shall be carried on in accordance with the rules for the time being in force under section 18.

4. (1) The enactments specified in the schedule, to the extent and with the modification therein set forth and so far as they are not inconsistent with this Regulation or the rules for the time being in force thereunder, are hereby declared to be in force in the Chittagong Hill Tracts.

(a) No other enactment heretofore or hereafter passed shall be deemed to apply in the Chittagong Hill Tracts.

Provided that the Local Government, may with the previous sanction of the Governor-General in Council, by notification in the Calcutta Gazettee,—

(a) declare that any other enactment shall apply in the said Tracts, either wholly or to the extent or with the modifications which may be set forth in the notification ; or

- (b) declare that any enactment which is specified in the schedule, or which has been declared to apply by a notification under clause (a) of this subsection, shall cease to apply in the said Tracts.

CHAPTER III

APPOINTMENT AND POWERS OF CERTAIN OFFICERS

5. The Local Government may, by notification in the Calcutta Gazettee,—
- Appointment of Superintendent and subordinate officers.
- (a) appoint any person to be the Superintendent of the Chittagong Hill Tracts ; and
- (b) appoint so many Assistant Superintendents and other officers as it thinks fit to assist in the administration of the said Tracts.

6. The Local Government may by, notification in the Calcutta Gazettee, invest any Assistant Superintendent with all or any of the powers of the Superintendent under this regulation or the rule, for the time being in force thereunder, and define the local limits of his jurisdiction.
- Investment of Assistant Superintendents with powers of Superintendent.

7. The Chittagong Hill Tracts shall constitute a district for the purposes of criminal and civil jurisdiction and for revenue and general purposes, the Superintendent shall be the District Magistrate, and subject to any orders passed by the Local Government under section 6, the General Administration of the said Tracts in criminal, civil, revenue and all other matters, shall be vested in the Superintendent.
- Chittagong Hill Tracts to be a district under the Superintendent.

8. (1) The Chittagong Hill Tracts shall constitute a sessions division, and the Commissioner shall be the Sessions Judge.
- Chittagong Hill Tracts to be sessions division under the Commissioner.

- (2) As Sessions Judge the Commissioner may take cognizance of any offence as a Court of original jurisdiction, without the accused being committed to him by a Magistrate for trial, and when so taking cognizance shall follow

the procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure, 1898, for the trial of warrant-cases by Magistrates.

9. The Local Government shall exercise the powers of a High Court for the purpose of the submission of sentences of death for confirmation under the code of Criminal Procedure, 1898, and the Commissioner shall exercise the powers of a High Court for all other purposes of the said Code.

10. The Superintendent may withdraw any criminal or civil case pending before any officer or Court in the Chittagong Hill Tracts, and may either try it himself or refer it for trial to some other officer or court.

CHAPTER IV

ARMS, AMMUNITION, DRUGS AND LIQUOR

11. (1) The superintendent may fix the number of firearms and the quantity and description of ammunition which may be possessed by the inhabitants of any village, and may grant permission either to such inhabitants collectively or to any of them individually, to possess such firear and ammunition as he may think fit.

(2) All firearms for the possession of which permission is given under sub-section (1) shall be marked and entered in a register.

(3) Any permission granted under sub-section (1) to possess firearms and ammunition may be withdraw by the Superintendent, and thereupon a firearms and ammunition referred to in such permission shall be delivered to the Superintendent or one of his subordinates.

(4) The Superintendent may grant permission to any person to manufacture gunpowder, and may withdraw such permission.

(5) Whoever, without the permission of the Superintendent, possesses or exports from the Chittagong Hill Tracts any firearms or ammunition, or manufactures any gunpowder, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

(6) The Superintendent may, with the previous sanction of the Local Government, by order in writing, direct that sub-sections (1) (2), (4) and (5), or any of them, shall not apply in any village specified in the order.

12. (1) The Superintendent may, with the previous sanction of the Commissioner, by order in writing prohibit all or any of the inhabitants of any village from carrying daos, spears and bows and arrows, or any of those weapons, in any tract to be denfied in the order, if he is of opinion that such prohibition is necessary to the peace of such tract.

(2) Every order made under sub-section (1) shall specify the length of time during which it shall remain in force.

(3) Whoever disobeys an order made sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

13. (1) Whoever, except under and in accordance with licence granted by the Superintendent imports, exports, manufactures, possesses or sells opium, ganja Intoxicating drugs or charas, or any preparation thereof or cultivates any plant from which opium, ganja or charas can be produced, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) any person may possess, for domestic use, five tolas of opium, ganja, or charas, or of any preparation, thereof, without having a licence granted by the Superintendent.

14. (1) Whoever, except under and in accordance with a licence granted by the Superintendent, imports or sells foreign spirit or fermented liquor shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine, or with both,

Foreign spirit
and fermented
liquor

(2) Nothing in this section applies—

- a) to the import by any person, for his private use and consumption, and not for sale, of any foreign spirit or fermented liquor on which duty has been paid ; or
- b) to the sale of any such spirit or liquor legally procured by any person for his private use and consumption and sold by him, or by auction on his behalf, or on behalf of his representatives in interest, upon his quitting a station or after his decease.

Explanation—For the purposes of this section, the expression “foreign spirit or fermented liquor” means any spirit or fermented liquor not manufactured or produced in the Chittagong Hill Tracts.

15. Whoever, except under and in accordance with a license granted by the Superintendent, exports or sells spirit or fermented liquor manufactured or produced in the Chittagong Hill Tracts shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

Locally made
spirit and fermen-
ted liquor

CHAPTER V MISCELLANEOUS

16. The Chittagong Hill Tracts shall be deemed to be a general police-district within the meaning of the Police Act, 1861, and Bengal Act VII, v of 1851, of 1869 (an Act to amend the constitution of the Police-force in Bengal and the Coas-

Police

ssioner shall exercise therein all the powers and authority conferred on an Inspector-General of Police.

17. (1) All officers in the Chittagong Hill Tracts shall be subordinate to the Superintendent, who may
Control and revision revise any order made by any such officer, including an Assistant Superintendent invested with any of the powers of the Superintendent under section 6.

(2) The Commissioner may revise any order made under this Regulation by the Superintendent or by any other officer in the Chittagong Hill Tracts.

(3) The Local Government may revise any order made under this Regulation.

18. (1) The Local Government may make rules for
Power to make carrying into effect the objects and purpose rules. of this Regulation.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may—

- a) provide for the administration of civil justice in the Chittagong Hill Tracts ;
- b) prohibit, restrict or regulate the appearance of legal practitioners in cases arising in the said Tracts ;
- c) provide for the registration of documents in the said Tracts ;
- d) regulate or restrict the transfer of land in the said Tracts ;
- e) provide for the subdivision of the said Tracts into circles, those circles into taluks, and those taluks into mauzas ;
- f) provide for the collection of the rents and the administration of the revenue generally in the said circles, taluks and mauzas through the chiefs, diwans and headmen ;
- g) define the powers and jurisdiction of the chiefs, diwans and headmen, and regulate the exercise by them of such powers and jurisdiction ;

- h) regulate the appointment and dismissal of diwans and headmen ;
- i) provide for the remuneration of chiefs, diwans, headmen and village officers generally by the assignment of lands for the purpose or otherwise as may be thought desirable ;
- j) prohibit, restrict or regulate the migration of cultivating raiyats from one circle to another ;
- k) regulate the acquisition by Government of land required for public purposes ;
- l) provide for the levy of taxes in the said Tracts ; and
- m) regulate the procedure to be observed by officers acting under this Regulation or the rules for the time being in force thereunder.

(3) All rules made by the Local Government under this section shall be published in the Calcutta Gazette and on such publication, shall have effect as it enacted by this Regulation.

19. Except as provided in this Regulation or in any other enactment for the time being in force, Bar to jurisdiction of Civil and Criminal Courts a decision passed, act done or order made under this Regulation or the rules thereunder, shall not be called in question in any Civil or Criminal Court.

20. Act XXII of 1860 (an Act to remove certain tracts on the eastern border of the Chittagong District from the Jurisdiction of the tribunals established under the general Regulations and Acts) ; Bengal Act IV of 1863 (an Act to amend Act XXII of 1860) and so much of the second schedule to the Scheduled Districts Act, 1874 and of the Repealing and Amending Act, 1891, as relates to either of the enactments aforesaid, are hereby repealed.

xiv of 1874

xii of 1891

POLITICAL DEPARTMENT.

NOTIFICATION NO. 123 P.D.

The 1st May 1900.—In exercise of the Power conferred on him by section 18 of the Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900, the Lieutenant-Governor is pleased to lay down the following rules for the administration of those Tracts :—

RULES FOR THE ADMINISTRATION OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS.

ADMINISTRATION OF CIVIL JUSTICE

The administration of civil justice shall be conducted in the most simple and expeditious manner compatible with the equitable disposal of the matters or suits.

2. The officer dealing with the matter or suit will, in the first instance, endeavour, upon the viva voce examination of the parties, to make a just award between them. Witnesses should not be sent for, except when the officer is unable without them to come to a decision upon the facts of the case.

3. The record shall contain the following particulars, namely, the name of the plaintiff, the name of the defendant, the nature of the claim or other matter in litigation, an abstract of the plaintiff's case, an abstract of the defendant's case an abstract of the deposition of the witnesses (where witnesses are examined), the ground of decision, and the order signed and dated.

4. Court fees shall not be levied in any matter or suit.

5. For the service of process fees shall be payable at the rate of six annas per diem, according to the number of days the journey takes from the nearest police station.

6. In the issue and enforcing of processes and the execution of decrees, the officers shall be guided, as far as may be, by the provisions of the Code of Civil procedure.

XIV of 1882
In the case of processes and decrees received from Courts of other districts, the following rules shall be observed :—

1. The Superintendent shall serve all processes and execute all decrees which are sent to him for service or execution by Civil Courts outside the Chittagong Hill Tracts, Courts, and which are accompanied—

a) by an English letter explaining, in the cases of a process, the nature of the suit and forwarding, in the case of a decree, a copy of the judgment ; and

b) by the fees prescribed by the High Court.

2. In any case in which, owing to beat-hire or the carriage of ratinos or similar causes, the cost of service or execution will exceed the fees received, the Superintendent will stay service and will state cost of the Civil Court concerned, and request that the requisite amount be forwarded.

3. In any case in which the Superintendent finds that the process should not be served, or that the decrees should not be executed, he will record his reasons for so finding, and will at the process or decree and fees till final orders are passed.

4. In either of the cases provided for by rules (2) and (3), the Civil Court concerned may refer the Superintendent's orders directly to the Commissioner of Chittagong, and the Commissioner shall pass orders on such reference and communicate them directly to the Civil Court concerned. If any Civil Court desires to make a reference from the Commissioner's orders, such reference shall be addressed to the District Judge for the orders of Government.

5. The Superintendent will serve the processes and execute the decrees referred to in these rules by the agency of his nazir or of the circle chiefs, or of the registered headmen,

according to the rank and status of the person on whom the process is to be employed in such service or execution except to convey the sealed orders to the agent selected for service or execution.

6. The Superintendent will in every case report on the service of the process to the Civill Court concerned, and, as regards the execution of decrees, will keep up communication with such Court till the case is disposed of.

7. The rate of interest decreed by the Courts shall in no case exceed 12 per cent. per annum.

8. Deeds which must be registered under the rules following for the registration of deeds shall not be allowed to be filed in any suit unless they have been duly registered.

9. Suite shall be admitted only on registered bonds in all cases in which registration would be compulsory if the transactions out of which the claims arise were completed by the execution of bonds.

10. All orders passed in civil suits shall be appealable to the Commissioner, who may decide by whom the costs in any such appeal shall be paid.

LEGAL PRACTITIONERS AND AGENTS.

11. No legal practitioners shall be permitted to appear in any matter ; and, in all cases where the Chiefs are personally concerned, they are, as far as possible, to be personally dealt with. Agents are only to be allowed when the personal presence of the Chife is inconvenient and impracticable, and they must not be legal practitioners.

REGISTRATION OF DEEDS.

12. Deeds of the following kinds shall be registered, provided that the porperty to which they relate is situated, or the work or act to which they relate is to be performed within the Chittagong Hill Tracts—

A—Deeds of sale, gift, partition, or mortgage of immoveable property.

B—Leases of immoveable property for any term exceeding one year.

C—Bonds, Promissory notes, and engagements for the payment of money.

D—Engagements or contracts for the delivery of produce or goods of any kind or for work to be done.

E—Wills and authorities to adopt.

F—Certificates of discharge of mortgage.

G—Deeds of appointing a manager of any estate or property.

13. Deeds not included in the above list may or may not be registered and they will not be inadmissible in Court by reason of non-registry.

14. No engagement to do anything illegal, immoral, contrary to public policy or manifestly impossible, will be registered.

15. If any document duly presented for registration is in a language which the Registering Officer does not understand, and which is not commonly used in the district, he shall refuse to register the document, unless it is accompanied by a true translation into a language commonly used in the district, and also by a true copy.

16. It shall be in the discretion of the Registering Officer to refuse, to accept for registering any document in which any blot, interlineation, blank, erasure, or alteration appears, unless the person executing the document attest, with their signatures or initials such blot, interlineation, blank, erasure or alteration; and it shall be his duty, at the time of registration the document, to make a note in the register of such interlineation, blank, erasure or alteration.

17. No instrument relating to immoveable property shall be accepted for registration unless it contains a description of such property sufficient to identify the same.

18. No deed, other than a will or authority to adopt, shall be accepted for registration if not presented to the proper officer within three months of its execution, unless good cause for the omission be shown to the satisfaction of such officer,

in which case if the delay in presentation does not exceed four months, the deed may be registered on payment of four times the ordinary fee.

19. Any will or authority to adopt may be registered at any time.

20. The functions of the Registering Officer shall be performed by the Superintendent or by such other officer as the Local Government may appoint for the purpose.

21. Every document to be registered shall be presented by some persons claiming under or executing the same ; but no document shall be registered unless the persons executing it or their representatives or assigns or agents (where agents are recognised under rule 22) appear before the Registering Officer and admit the execution. Any person refusing to attend when

XIV of 1800 sent for by the Registering Officer, or refusing to take oath, or answer questions put, or sign statements made by him, or making any false statement to the Registering Officer ; shall be punishable under the Indian Penal Code.

22. Agent will, as a general rule, be allowed to conduct registration only in behalf of (1) Hill Chiefs and persons of high rank, (2) European gentlemen, and (3) parda-nashin women. Only agents who are of known responsibility, and are personally acquainted with the facts of the case, will be permitted to conduct registration.

23. A fee, as follows, must be paid before registry :—

	Annas
For lease to a cultivating raiyat.....	2
For any deed under heading A in rule 12....	8
For any deed under heading C in rule 12 when the liability incurred is less than Rs. 50	2
For the same when liability is not less than Rs. 50 or more than Rs. 300	4

For the same when the liability is indefinite or is more than Rs. 300	8
For engagements under heading D in rule 12 when the period embraced is not more than three months	4
For the same when the period is indefinite or is more than three months	8
For any deed under heading E in rule 12	8
For any deed under heading F in rule 12	4
For any deed under heading G in rule 12	8
For all other deeds, including those registered under rule 13 of these rules	8

24. Persons may be allowed to inspect the books in which deeds are copied, or to take a copy of a deed on payment, in advance of a fee of eight annas, besides any necessary charge for copying.

25. The registering officer will, before he registers a deed, satisfy himself that the parties appearing before him are really those whom they profess to be, and that they clearly understand the nature and purport of the deed.

26. He shall then record on the deed endorsement in the following form :—

At (the hour) on this
(the date, month and year)
AB, son of , resident of
and E F., son of
resident of
recognised by me (or) duly
identified by H., resident of
appeared before me and acknowledged their execution of
this deed and satisfied me that they fully understood its
purport.

27. The deed, with the endorsement, shall then be copied without delay into a book previously paged and signed by the Registering Officer. The copy shall be attested by the register-

ing officer, and the original shall then be returned to the party entitled to receive it.

28. The Registering Officer shall keep in a separate book a memorandum, in order of date of all deeds registered and refused registry, as follows :—

Date of registry or refusal of registry	In what book and in what page registered or for what reasons registry was refused	Names and residence of parties	Nature and date of deed
1	2	3	4

29. When a register into which deeds have been copied is filled up, an alphabetical index of the parties to the deeds it contains shall be appended to it.

30. All actual and necessary expenses connected with registration shall be defrayed from the fees realised, and any surplus is not required for that purpose shall be disposed of as the Government shall from time to time direct. A regular account of receipts and expenditure shall be kept by the Registering Officer and submitted to the Commissioner for approval and countersignature once a quarter.

31. The definitions of the words "lease" "moveable property" and "immoveable property" which 1. III of 1877. are contained in the Indian Registration Act, 1877, shall be held applicable to these rules and to deeds registered under them.

32. The registry book shall be inspected and countersigned by the Commissioner as often as may be found convenient.

33. In any case where registration is refused on the ground that the party who is said to have executed the deed denies his having done so, any party claiming under the deed may sue in the Court of the Superintendent within three months of the order of refusal for a declaration of his right to have the deed registered. The Registering Officer shall be no party to such suit, and a copy of his orders of refusal, properly attested shall be *prima facie* proof that the reasons of refusal to register was as therein described. The document in dispute shall be admissible as evidenced in this suit, anything in those rules contained notwithstanding.

THE LAND.

TRANSFERS, PARTITIONS, AND SUB-LETTING.

34. All lands held for plough cultivation on lease from Govt. under whatever rules they have been or may be granted, are subject to the conditions that they cannot be sub-let or transferred except on hereditary succession or with the consent of the Commissioner. No partition can be made without the consent of the Commissioner. For a tenant to temporarily make over his holding in another person in the case of illness, incapacity, minority, absence as a journey or in the like exigency, is not to sub-let; but in no such case can the tenant recover from his substitute or trustee a higher rent he has himself to pay.

CIRCLE DIVISIONS.

35. The Chittagong Hill Tracts comprise the following circles the boundaries of which are well known and are not in dispute—

- (1) the several Government forest reserves ;
- (2) the Bohmong's circle, including the tract hitherto known as "Sungoo Subdivisional khas Mahal".
- (3) the Chakma Chief's circle, including the tract hitherto known as "Sodar Subdivisional khas Mahal";
- (4) the Mong Chief's circle.

TALUK DIVISIONS.

36. The 33 blocks which were formed in 1890 the census of 1891 have been constituted permanent divisions and are called taluks. They lie as follows in the three circles :—

Bohmong's circle...18 blocks,

Chakma Chief's circle...9 "

Mong Chief's circle...6 "

MAUZAS.

37. The taluks are subdivided into mauzas. A mauza will ordinary contain not less than one and a half and not more than 20 square miles, including hill, wood and waste. Wherever there is plough cultivation, a mauza will be formed, and its external boundaries laid down on the map. Wherever there is a permanent village, even without plough cultivation, a mauza will be similarly formed. The remaining mauzas will be formed as circumstances allow, and, till defined will be known as the undefined mauzas.

ADMINISTRATION OF THE CIRCLES AND MAUZAS.

38. The three Chiefs—the Chakma Chief, the Bohmong, and the Mong Chief—are charged with the administration of the respective circles, and every persons residing or cultivating within a circle is subject to the jurisdiction of its chief, with the exception of Government Officers and their families, traders and shopkeepers in bazar and leases of fisheries and *garjan kholas*.

The existing headmen are in charge of the administration of the mauzas. Where they are wanted headmen will be

appointed by the Superintendent in consultation with the Chiefs and the inhabitants of the mauzas. Every person, with the exceptions aforesaid, residing or cultivating within a mauzas will be subject to the authority of its headman.

COLLECTION OF THE RENTS.

39. The rents in each mauza will be paid to the headman. Every householder residing or cultivating within a mauza is liable to pay rent to the headman, and there may be no remission of that liability, unless sanctioned by the superintendent. The headman will collect rents under the control and authority, of the Circle Chiefs. The Chief and the headman will receive commission on the collections at such rates, respectively, as may from time to time be sanctioned by the Government.

ADMINISTRATIVE POWER OF THE CHIEFS AND HEADMAN.

40. Except in the cases mentioned at the end of this rule, the Chiefs will regulate the affairs of their circles and the action of the headman within them, with powers of fine of enforcing restitution, and of imprisonment. Similarly, the headman will regulate the internal affairs of their mauzas, with powers of fine up to Rs. 25, of enforcing restitution, and detention till the Superintendent's orders are received. The Superintendent will have general revisional jurisdiction over the exercise of all these powers, and will continue to receive from the police information of the occurrence of cases.

EXCEPTED CASES REFERRED TO ABOVE.

- (1) Offences against the State, against Government Servants, against public justice.
- (2) Riots in which grievous hurt has been caused or deadly weapons have been used.
- (3) The following serious offences against the person, namely, murder, culpable homicide, voluntarily causing

grievous hurt, wrongful confinement, rape, abduction, kidnapping, and unnatural offences.

(4) Extention, robbery, dakaity, lacking house-trespass, or house-breaking when the property taken exceeds Rs. 500 in value.

(5) Forgery.

(6) Offences under Chapter IV of the Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900.

(7) Any case or class of cases which the Commissioner may specify in this behalf.

THE RENT.

41. The rent is of four kinds, viz—

- (i) the existing *joom rent and begar* ;
- (ii) the plough cultivation rent ;
- (iii) ground-rent for premises used for other than agricultural purposes (shops etc.)
- (vi) the grass and *garjan khola* rent.

JOOM RENT AND BEGAR.

42. (a) Every joomia, who has by custom to pay joom rent, must pay the joom rent for the Government to the Chief in whose circle he resides, to be collected by the headman without in whose mauza he resides. If any such joomia jooms in a different circle or mauza from that in which he resides, he must, in the case of a different circle, pay the full joom-tax, for that joom in addition to what he has to pay to his Circle Chief ; and in the case of a different mauza in the same circle, he must pay half the full joom rent to the headman of that mauza in addition to the full rent which he has to pay to his own headman. Plough cultivation gives no exemption from joom-tax to a man who jooms.

(b) The joom book must show separately the jooms and joom-tax for each mauza.

THE PLOUGH RENT.

43. The gazetted officers of Government, the Circle, and the

headman may grant to any suitable person wishing to open plough cultivation the requisite authority to do so, specifying the Terms.

The plough rent will be collected by the headman under the control, and Superintendence of the Chief, and it may be paid direct to the Government Officers or through the Chief, as is found most convenient in different cases. The headman may assign to any suitable raiyat as much land as it is within the raiyat's power to cultivate himself. For the first three years it will be rent-free. Thereafter it will be assessed by the Superintendent and the rate once fixed will not be assessed altered for 10 years. The headman will frame a rent-roll (*jamabandi*) for all plough cultivation in his mouza, which, when revised by the Superintendent will form the basis of the demand. These rent-rolls will be examined, where possible on the spot every year. Plough cultivation held under leases will, when not forfeited, be included in the rent-roll on the terms of the lease. When the lease conditions have been violated, the lease will be cancelled and the land settled with the actual cultivator as if no lease had been given.

NON-AGRICULTURAL RENTS AND BAZARS.

44. The rents for non-agricultural sites will be fixed by the Superintendent, and when so fixed, will be entered on the rent-roll and distributed in the same way as the plough cultivation rent. But this rule does not apply to the cases of bazars, which may be separated by the Superintendent from the mauza and settled by him, and managed either through the headman or direct, as he sees fit.

GRASS AND GARJAN KHOLA RENTS.

45. The grass kholas, excepting how grass kholas which may come into existence within the boundaries of mauzas (Bengal Government No. 2544P. dated 9th December 1902), will be settled by the Superintendent as hitherto, either yearly or for periods of not more than 10 years in any case, and when settled, their rents will be realised separately and will not be

added to the rent-roll or distributed like the rents for plough cultivation and non-agricultural sites.

SERVICE LANDS.

46. In every mauza 50 acres of the best arable land, in one block or in area or areas as nearly approaching 50 acres as may be practicable, will be demarcated, recorded and set apart as the khas land of Government for the remunerations of the village officials, the headman, the patwari or karbari if there is one, and the watchmen, if such are appointed, and will be assigned to such officers by the Superintendent to hold rent-free during their continuance in office. No headman may hold, as his remuneration more than 5 acres of the land, but the rent of it while unoccupied, may be placed in his charge under such temporary arrangements as the Superintendent seem fit to make. No officer shall have an indefeasible right to transfer such land, or to receive from the Government or from his successor any compensation for improvements made on the land; but the Commissioner may require a newly appointed officer to pay to his predecessor reasonable compensation for unexhausted improvements.

KHAS MAUZAS OF CHIEFS.

47. With the sanction of the Commissioner, a circle chief may hold one or more mauzas in his circle as his khas mauza or mauzas, and in that case will be entitled to all the remuneration provided for the headman in addition to his remuneration as chief, so long as he arrange properly for the performance of the duties of the headman and the mauza officers.

INVESTITURE OF THE CHIEFS AND APPOINTMENT AND DISMISSAL OF HEADMAN.

48. The investiture of the chiefs is regulated by the Bengal Government. The headman will be appointed by the Superintendent, in consultation with the chiefs and the inhabitants of the mauzas; they may be dismissed by the Superintendent for misconduct or incompetence after a reference to the chief concerned. The Superintendent will not be bound in either case

by the wishes of the Chief, the full consideration should be given to them. This appointment is not hereditary ; but a son, when competent, may be appointed to succeed his father.

MIGRATION AND MIGRATING DEFAULTERS ABSCONDERS.

49. Migration by cultivating raiyats from one circle to another, though not absolutely prohibited is to be discouraged.

No cultivating raiyat may so migrate till he has discharged all dues owed by him within the circle and mauza from which he wishes to migrate; and the Chief and the headman are empowered to detain the persons and property of such intending defaulters till the order of the Superintendent are received. An absconder will never be permitted to resettle within the circle from which he has absconded till he discharges all the dues for which he was liable when he absconded.

LANDS REQUIRED FOR PUBLIC PURPOSES.

50. Arable land may not be settled by the headmen so as to interfere with roads or paths, or the public convenience or the requirements of Government. and any settlements made in contravention shall be summarily cancelled. When land, for which a settlement has been sanctioned, is required by Government, it will be resumed on payment of compensation.

J. A. Bourdillon,

Offg. Chief Secy. to the Govt. of Bengal.

যুক্ত

- ১। অগ্নিবংশ মহাথের—স্টপ জেনসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্রাকটস, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮১।
- ২। অগ্নিবংশ মহাথের, মাই আপীল টু দি ইউনাইটেড নেশনস্, ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইন্ডিজেনাস পপুলেশনস্, জেনিভা, ১লা আগষ্ট, ১৯৮৪।
- ৩। অমিতাভ গুপ্ত, গতিবেগ চকল বাংলাদেশ মুক্তি মৈনিক শেখ মুজিব, পঞ্চ প্রকাশন, ১৯৭৩।
- ৪। অমৃত বাজার পত্রিকা, ট্রাইবেল ম্যাসাকর ইন চিটাগাং, ১১ই জুলাই, ১৯৮১, কলকাতা।
- ৫। অস্ট্রেলিয়া সরকারের চিঠি, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৮০।
- ৬। আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নজরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।
- ৭। আতিকুল আলম, বাংলাদেশ স্টাট অন সাইট বিল, দি গার্ডিয়ান, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৮১, লণ্ডন।
- ৮। আনন্দ বাজার পত্রিকা, চট্টগ্রামে উপজাতি হত্যা, ১১ই জুলাই, ১৯৮১, কলকাতা।
- ৯। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৫ হাজার চাকরা মিজোরামে ঢুকেছে, ঠঠা কেকরারী, ১৯৭২, কলকাতা।
- ১০। আলমুট মে, দি ইকনমি অব শিকটিং কালটিভেশন ইন বাংলাদেশ, মাইনেও পেপার, বার্লিন, এক. আর. জি., ১৯৭৮।
- ১১। এ্যালান ক্যামেল জনসন, মিশন উইথ রাউন্টব্যাটেন, লণ্ডন।
- ১২। এ.এল. খাতিব, হ কিলড মুজিব, বিকাশ পাবলিশিং, নয়া দিল্লী, ১৯৮০।
- ১৩। এ্যান্টনি ম্যাসকারেল, রেশ অফ বাংলাদেশ, বিকাশ পাবলিশিং, দিল্লী, ১৯৭১।

১৪। গ্রামনেটি ইন্টারকানাল রিপোর্ট, বাংলাদেশ, রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস এণ্ড গ্রামনেটি ইন্টারকানাল কমসার্শ, ৪৩ নভেম্বর, ১৯৮০।

১৫। এ. কে. দেওয়ান, ক্লাশ এণ্ড এথ্নিসিটি ইন দি হিল্‌স অফ বাংলাদেশ, নৃতত্ত্ব বিভাগ, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা, ১৯৭২।

১৬। এ্যাস্ট্রিয়েভারি সোসাইটির ইউনাইটেড নেশনস্ ওয়াকিং গ্রুপ অন ইণ্ডিজেনাস পপুলেশনস্-এর উপর রিপোর্ট, ১লা আগস্ট, ১৯৮৪, লণ্ডন।

১৭। বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, প্রকাশক কালিশংকর দেওয়ান, নিউ রাঙামাটি, ১৯৬৯।

১৮। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন নং ১২৩ পি. পি., ১লা মে, ১৯০০।

১৯। বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশন, ১৮৮১, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮১।

২০। বিমল কে. পাল, দি কাপ্তাই হাইড্রো ইলেকট্রিক ডাম্‌, ইউস ইমপ্যাকট অন দি টাইবেল শিপল অফ দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস্, জুগোল বিভাগ, মানিটাবা বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা, ১৯৮০।

২১। ব্রায়ান এ্যাডস, থাউজ্যান্ডস ট্র্যাপড ইন বাংলাদেশ টেরর, দি অবজারভার, লণ্ডন ২০শে অগস্ট, ১৯৭৮।

২২। ব্রায়ান এ্যাডস, ম্যালাকর ফিয়ারড ইন বাংলাদেশ, দি অবজারভার, লণ্ডন, ১৫ই মার্চ, ১৯৮১।

২৩। বাংলাদেশ পিসনস্ ডেমক্যাটিক মুভমেন্ট, লণ্ডন, একটি রিপোর্ট, ১৯৮১।

২৪। বাংলাদেশ পিসনস্ ডেমক্যাটিক মুভমেন্ট, গ্রানড এথনোসাইড অফ মাইনরিটিস ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, লণ্ডন, ১৯৮১।

২৫। বৃডিজর্ট মাইনরিটি প্রটেকশন কমিটি, স্মারকপত্র, বনমালিপুর, আগরডা, ১৮ই জুলাই ১৯৭৯।

২৬। বি. কে. জোসী, টেরর কম্পেন ইন চিটাগাং, দি টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দিল্লী, ১লা এপ্রিল, ১৯৮০।

২৭। ব্যাকক পোষ্ট, টেনসন হাই এন্ড রিস্কিউজিস ফ্রি ফ্রম বাংলাদেশ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

২৮। বি. আহমেদ, চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, ইমপোর্ট হাণ্ডলিং, দি নিউ নেশন, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৮১।

২০। চিরম্ম যুৎসুদী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে '৮৪, ঢাকা।

৩০। সি. জনসন, হি হ লেস ডাউন হিস গান লেস ডাউন হিস ব্রিডম, আই. ভরিত্তি. জি. আই. এ. নিউজ লেটার, জুন, অক্টোবর, ১৯৮১।

৩১। সি জনসন, নো ল্যাণ্ড রাইটস ইন বাংলাদেশ, ১১ই জুলাই, ১৯৮১, লণ্ডন অর্গানাইজড ৭ম ইউরোপিয়ান কনফারেন্স অন মডার্ণ এশিয়ান স্টাডিস উপলক্ষে পঠিত প্রবন্ধ।

৩২। সি. মুরহাড, বাংলাদেশ ট্রাইবসম্যান হেড ক্যাপটন ইন পিট, দি টাইমস, ৩১শে মার্চ, লণ্ডন, ১৯৮০।

৩৩। সি. মুরহাড, হিল ট্রাইবস ফাইট ঢাকা গভর্নমেন্ট, দি টাইমস, ১৬ই ডিসেম্বর, লণ্ডন, ১৯৮০।

৩৪। সি. মুরহাড, বাংলাদেশ সেস চিটাগাং হিল ট্রাইবস ল লেসনেস প্রবন্ধ ২৮ই টেরিস্ট, দি টাইমস, লণ্ডন, ২৭শে জুলাই ১৯৮১।

৩৫। চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনার সাইদুলীন আহ মেদের ইন্সাক্রুত সরকারি গোপন চিঠি, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

৩৬। ডেভিড সোফার, পপুলেশন ডিজলোকেশন ইন দি চিটাগাং হিল, দি জিওগ্র ফিকাল রিভিউ, জলুয়াম এল নং ৩ (১৯৬৩)।

৩৭। ডেভিস, ডি, সি. (সম্পাদিত), হোয়েন মেন রেভল্ট এ্যাণ্ড হোয়াইট লণ্ডন, ফ্রি প্রেস, ১৯৭১।

৩৮। ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, দি রেভল্ট ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, ২৯শে এপ্রিল, বোম্বে, ১৯৭৮।

৩৯। ইত্তেফাক, দৈনিক, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে, ঢাকা, ১৯শে জুন, ১৯৮০।

৪০। গণকণ্ঠ, দৈনিক, উপজাতিদের প্রতিবাদ সম্বন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি পুনর্বাসন, ১৬ই অক্টোবর, ঢাকা, ১৯৮০।

৪১। গণকণ্ঠ, দৈনিক, কলমপতিতে বহিরাগত শরণার্থী। পাহাড়ী জনসাধারণ নিরাপত্তার অভাবে অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছে, ঢাকা, ৬ই আগষ্ট, ১৯৮০।

৪২। গণকণ্ঠ, দৈনিক, উপজাতি সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবি, ঢাকা, ৬ই অক্টোবর, ১৯৮০।

৪৩। গার্ডিয়ান, দি ম্যালেরিয়া ডেব্‌স, ৩রা অক্টোবর, লণ্ডন, ১৯৮৩।

- ৪৪। গুর, টি. আর.; হোয়াই বেন রেবেল; প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৭০।
- ৪৫। এইচ. এন. পণ্ডিত, র‍্যাডক্লিফ সোড চাকমাস রিপ., অমৃত বাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১১ই মে, ১৯৮০।
- ৪৬। এইচ. ডি. হাডসন. দি গ্রেট ডিভাইড, লণ্ডন।
- ৪৭। আই. এফ-ও-আর-এর ইউরোপিয়ান সমস্তের রিপোর্ট, ১৯শে মার্চ, নেদারল্যান্ড, ১৯৮০।
- ৪৮। আই. এফ. ও. আর-এর রিপোর্ট, দি নিউওয়েস্ট সিচুয়েশন ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, ডিসেম্বর, নেদারল্যান্ড, ১৯৮১।
- ৪৯। আই. এফ. ও. আর-এর রিপোর্ট, নিউ থ্রেট টু চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, নেদারল্যান্ড, ১৯৮১।
- ৫০। আই. ডব্লিউ. জি. আই-এর নিউজলেটার, বাংলাদেশ ট্রাইবেল ফাইট কর ল্যাণ্ড ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, নং ২৭, জুন, লণ্ডন, ১৯৭৯।
- ৫১। জগলুল আলম, ইস্টাইলিটি ইন দি হিলস্, সাপ্তাহিক হলিডে, ১১ই মে, ঢাকা, ১৯৮০।
- ৫২। জনসংহতি সমিতি, গ্রান এ্যাকাউন্ট অফ চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, ১৪ই জুলাই, ১৯৮২।
- ৫৩। জনসংহতি সমিতির আবেদন, ১৬ই জাহ্নারী, ১৯৮০।
- ৫৪। জন বডলে, ডিক্টিমস অফ প্রোগ্রেস, কামিংস পাবলিশিং কোং, কালিকোর্নিয়া, ১৯৭৫।
- ৫৫। এ্যানট্রপলজি এ্যাণ্ড দি কনটেম্পরারি হিউম্যান প্রবলেম, ওয়াশিংটন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮।
- ৫৬। জন আলেকজান্ডার, এ্যাটকস এ ডেভলপমেন্ট চেঞ্জ, দি গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮১।
- ৫৭। জ্যোতি সেনগুপ্ত, বাংলাদেশ ইন ব্লাড এ্যাণ্ড টিয়ারস, নয়া প্রকাশ, কলকাতা।
- ৫৮। জে. এন. কাউল, প্রবলেম অফ স্টাশনাল ইনটিগ্রেশন. পিপল পাবলিশিং হাউস, দিল্লী ১৯৬০।
- ৫৯। জেকস এইচ. কয়েস্ট, প্রেসিডেন্ট জিয়ার্ডের রহমানের কাছে আই. এফ. ও. আর-এর চিঠি।

৩০। জাঙ্গলের বিভিন্ন কাউন্সিল অধিবেশনে কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজের রাজনৈতিক রিপোর্ট, ২১শে মার্চ, ১৯৮০।

৩১। যুগান্তর, দৈনিক, বাংলাদেশের হাজার হাজার চাকমার ত্রিপুরায় প্রবেশ, ১লা আগস্ট, ১৯৮১।

৩২। কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবনকাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোং, রাঙামাটি ১৯৭০।

৩৩। কাজী মঈনুদ্দিন সিচুয়েশন ইন দি হিল ট্র্যাকটস, সাপ্তাহিক হলিডে, ঢাকা, মার্চ, ১৯৮০।

৩৪। কাজী মঈনুদ্দিন হিল ট্র্যাকস সিচুয়েশন আন অলটারড, সাপ্তাহিক হলিডে, ঢাকা, ১৯শে এপ্রিল, ১৯৮১।

৩৫। কাজী মঈনুদ্দিন ট্রাইবেল ইনমারজেনসী ইন দি হিল ট্র্যাকটস, ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, বোম্বে, ৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০।

৩৬। কাজী মঈনুদ্দিন লাইফ ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, সাপ্তাহিক হলিডে, ৬ই জুলাই, ঢাকা, ১৯৮০।

৩৭। লুইস, টমাস এইচ. লেঃ কর্ণেল, এ ফ্রাই অন দি হাইল, কনটেবল এ্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ, লণ্ডন, ১৯১২।

৩৮। এল. এস. এস. ও. মেলেরি, ইন্টার্ন বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, চিটাগাং, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, কলকাতা, ১৯০৮।

৩৯। ল্যাণ্ড রিকোর্ড কমিটি সাবমিট্টেড রিপোর্ট, বাংলাদেশ হাই কমিশন, লণ্ডন, নিউজ বুলেটিন, ১-১৫ এপ্রিল, ১৯৮০।

৭০। ল্যারি কলিন্স এ্যাণ্ড ডমিনিক লাপ্যারারে, রাউন্টবেটন এ্যাণ্ড দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া, ১৯৮২।

৭১। এম. কিউ. জামান, ট্রাইবেল ইনস্যাস এ্যাণ্ড স্যাপনাল ইনটেগ্রেশন, দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস্, কেস, এম. এস. কোরাইসি সম্পাদিত, ট্রাইবেল ক'লচারস ইন বাংলাদেশ, ১৯৮৪তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পুস্তকের একটি প্রবন্ধ।

৭২। এম. কিউ. জামান, ফাইসিস ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস্, এন্ড নিসিটি এ্যাণ্ড ইনটেগ্রেশন, ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ওল্ড-নং ৩ (১৯৮২), বোম্বে।

৭৩। এম. কিউ. জামান, টাইবাল সারভাইভ্যাল ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস অফ বাংলাদেশ, ম্যান ইন দি ইণ্ডিয়া, ভল্যুম ৬৪ (৪), ১৯৮৪।

৭৪। এম. রাম. প্রেগ অন অল পার্টিস, ফার ইন্টার্প ইকনমিক রিভিউ, ১০ই এপ্রিল, ১৯৮১।

৭৫। এম. এম. হক, গভর্ণমেন্ট ইনস্টিটিউশন এ্যাণ্ড আওয়ার ডেভেলপমেন্ট, এ স্টাডি অফ টাইবাল পিপলস অফ চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অফ লোকেল গভর্ণমেন্ট, ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহাম, ডিসেম্বর, ১৯৮২।

৭৬। মাইকেল রোচ, জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ, নিউজ লেটার অফ বুডিস্ট পীস ফেলসিপ অফ আমেরিকা।

৭৭। মণিং নিউজ, চাকমা টাইব ক্রসিং ইনটু ত্রিপুরা, করাচী, ৬ই জুলাই, ১৯৮১।

৭৮। মিলন দত্ত, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু মুজিবর ও ভারত রত্ন ইন্দিরা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৭৩।

৭৯। মুসলিম, দি, এ হেইনাস ইন্ডেন্ট, ইসলামাবাদ, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮০।

৮০। ন্যাশনাল কমিশন ফর জাস্টিস এ্যাণ্ড পীস, দি ল্যাণ্ড প্রবলেমস্ অফ হিল টাইবেলস, ঢাকা, ১৯৭৩।

৮১। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, ১৯৬২।

৮২। পরেশ সাহা, মুজিব হত্যার তদন্ত, কলকাতা।

৮৩। পিটার নিস ওয়াগ, আপ্ ছিল প্রবলেম ফর চিটাগাং টাইবলম্যান, দি গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ২৯শে জুলাই, ১৯৮১।

৮৪। পিটার নিস ওয়াগ, ঢাকা সীন্, ইণ্ডিয়ান বিহাইণ্ড রেইডস, দি গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ১১ই নভেম্বর, ১৯৮১।

৮৫। প্যাট্রিক কীটলী, জেনোসাইড পলিসি এ্যালেজন্ড ইন বাংলাদেশ, দি গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮০।

৮৬। পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার আলি হায়দার খানের ইচ্ছাকৃত সরকারি গোপন চিঠি, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

৮৭। রায়মোহন চক্রবর্তী বাহাদুর, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, কলকাতা, ১৯১৮।

৮৮। আর. এইচ. স্টিভ. হাসিনগন, এ্যান এ্যাকাউন্ট অফ চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ১৯০৬।

৮২। রেগুলেসন IV, ১২২০, পার্বত্য চট্টগ্রাম (সংশোধনী) রেগুলেসন, বিজ্ঞপ্তি নং ১৩০৬৫ পি., ওরা ডিসেম্বর, ১২২০, ক্যালকাটা গেজেট, ১২২০, পি. টি ১।

২০। রেগুলেসন IV, ১২২৫, পার্বত্য চট্টগ্রাম (সংশোধনী) রেগুলেসন, বিজ্ঞপ্তি নং—৬২১৪, এল, আর, ২২শে জুন, ১২২৫, কলিকাতা গেজেট, ১২২৫, পি. টি.—১।

২১। রাসেল ষ্টেলার, ভূমিকা, দি মিলিটারি আর্ট অফ পিপলস ওয়ার, জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপের নির্বাচিত প্রবন্ধ, মাসুলী রিভিউ প্রেস, ১২৭০, লণ্ডন ও নিউইয়র্ক।

২২। রাজমাতা বিনীতা রায়, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, রাডামাটি, ১২৭৩।

২৩। রবিন লাসটিগ, ট্রাইবস ফেস জেনোসাইড, দি অবজার্ভার, ১৪ই ডিসেম্বর, লণ্ডন, ১২৮০।

২৪। আর. আই. চৌধুরী, ট্রাইবেল লীডারশীপ এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল ইনটি-গ্রেসন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১২৭২।

২৫। আর. মম এ্যাণ্ড এম. গৌতম, আসপেকটস অফ ট্রাইবেল লাইফ ইন সাউথ এশিয়া. স্টাটেজি এ্যাণ্ড সারভাইভ্যাল, বার্ষিক বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক, ১২৭৮।

২৬। রবিন হানবারি টেমিসনের, সারভাইভালের পক্ষে, জেনারেল এরশাদের নিকট চিঠি, ১২ই জুলাই, ১২৮৪, লণ্ডন।

২৭। সুর কৃষ্ণ চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, কলকাতা, ১২৮৩।

২৮। মেহ কুমার চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, আগরতলা, ১২৮২।

২৯। সুগত চাকমা, চাকমা পরিচিতি, বরগাও পাবলিকেশন্স, রাডামাটি, অক্টোবর, ১২৮৩।

১০০। সুব্রহ্মণ্য দাশগুপ্ত, মিন্ডনাইট হাসাকর ইন ঢাকা, কলকাতা।

১০১। সিরাজুল আলম খান, আন্দোলন ও সংগঠন প্রসঙ্গে।

১০২। সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন—১, শাখীম সিকদার সম্পাদিত, ঢাকা।

১০৩। সারভাইভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ, উই ওয়ান্ট ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড নট দি পিপলস, জেনোসাইড ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, লণ্ডন, ১২৮৪।

১০৪। সারভাইভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ, চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, মোর হাসাকর, লণ্ডন, সেপ্টেম্বর, ১২৮৪।

১০৫। এস. কামাল উদ্দিন, এ পীস অকেনসিড ইন দি হিল্‌স, ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ২রা মে, ১৯৮০।

১০৬। এস. কামাল উদ্দিন, এ ট্র্যাংগলড গুরেন্ড অফ্‌ ইনসারজেনসি, ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ২৩শে মে, ১৯৮০।

১০৭। এস. কামাল উদ্দিন, এ ডিসটার্বড নোট সাং ইনটু হারমনি, ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ১২শে ডিসেম্বর, ১৯৮০।

১০৮। এস. কামাল উদ্দিন, রং সাইড অফ্‌ দি ট্র্যাকটস্‌, ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৮১।

১০৯। এস. কামাল উদ্দিন, বেইন এ্যাণ্ড আদার ইলিক্টেস, ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ২৬শে মে, ১৯৮১।

১১০। এস. ব্যানার্জী, বাংলাদেশ পারসেকিউটেড ট্রাইবেল্‌স, সানডে, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৮১।

১১১। সারাভাইভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল এ্যানুয়েল রিভিউ, (১৯৮৩) নং ৪৩, লণ্ডন।

১১২। এস. আর. চক্রবর্তী, টারমোওয়েল ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকট্‌স্‌, ইথনিক কনফ্লিক্ট ইন বাংলাদেশ, পঠিত প্রবন্ধ, সেমিনার অন ডেমেক্টিক কনফ্লিকটস ইন সাউথ এশিয়ান স্টেট্‌স ইমারজিং ট্রেণ্ড, অপ্রহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি, ১৮-২০ অক্টোবর, ১৯৮৪।

১১৩। সুনন্দ কে. দত্ত, রায়, চিটাগাং বুদ্ধিস্ট কিয়ার ডেথ্‌ ইন দি অংগল. দি অবজার্ভার, ২৭শে এপ্রিল, লণ্ডন, ১৯৮০।

১১৪। সুনন্দ কে. দত্ত, রায়, ট্রাবল ইন রাডায়াটি, বুদ্ধিস্ট স্ট্রাগল ফর সারাভাইভ্যাল, দি স্টেটসম্যান উইকলি, ১৭ই মে, ১৯৮০।

১১৫। সাইমন উইনচেস্টার, সানডে টাইম্‌স্‌, ২৭শে মার্চ, লণ্ডন ১৯৮৩।

১১৬। সাইমন উইনচেস্টার, বুদ্ধিস্ট ট্রাইব স্ট্রাগল ইন অংগল মেনোপাইড, দি সানডে টাইম্‌স্‌, লণ্ডন, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৮৪।

১১৭। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস্‌ ইন বাংলাদেশ, ইনটিগ্রেশনাল ক্রাইসিস বিটুইন দি সেন্টার এ্যাণ্ড পেরিফেরি, এশিয়ান সারভে ৩১ (১২)।

১১৭। সেনিয়ার সামান্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে চরম অবস্থা, রাজনৈতিক সমাধান কত দূরে, সাপ্তাহিক যোববার, ২০শে জুলাই, ১৯৮০, ঢাকা।

১১৮। সেশিয়াল, দি চাকমা ইনসারজেনসি ইন বাংলাদেশ, গোহাটি, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪।

১১৯। সুইডেন সরকারের চিঠি, ২৭শে কেকরারী, ১৯৮১।

১২০। গাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্র লাল চাকমা, তিন সংসদ সদস্যের সাংবাদিক সম্মেলন, ঢাকা প্রেস ক্লাব, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৮০।

১২১। স্টেটসম্যান উইক্লি, দি রিপ্যাট্রিয়েশন অফ টাইবেলস স্টমড, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৮১।

১২২। স্টেটসম্যান উইক্লি, দি চিটাগাং বেবেলস মুক্ত কব বাফাব স্টেট পিপোটেড, ১০ই মে, ১৯৮০।

১২৩। স্টেটসম্যান উইক্লি, দি, বি, খাউজ ও হেড ইন চিটাগাং, ১০ই অক্টোবর, ১৯৮১।

১২৪। স্টেটসম্যান উইক্লি, দি কল আউট ইন বাংলাদেশ, ৩রা অক্টোবর, ১৯৮১।

১২৫। স্টেটসম্যান উইক্লি, দি টাইবেল ইনসারজেনসি, বাংলাদেশ চার্জস এগেনেস্ট ইণ্ডিয়া, ২২শে অক্টোবর, ১৯৮১।

১২৬। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, দি কিফ্টি বাংলা টাইবেলস কট টাইং টু এনটার ত্রিপুরা, ২৯শে জুন, ১৯৮১।

১২৭। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, দি দ্বিগ এগেনেস্ট বাংলা একসেলিউশনস, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, দিল্লি।

১২৮। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, দি ম্যালেরিয়া ভেবস, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৩।

১২৯। টাইমস, দি ম্যালেরিয়া ভিক্টিমস, ৩রা অক্টোবর, ৮৩ লন্ডন।

১৩০। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, দি এণ্ড টাইবেল ইনসারজেনসি বাংলা টোলড, ৩রা জুলাই, ১৯৮১, দিল্লি।

১৩১। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, দি বাস্ কিলিংস অফ টাইবেলস ইন চিটাগাং, ১২ই জুলাই, ১৯৮১।

১৩২। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি ডি. পি. শোর ইনটু জিপুরা, দিল্লি, ২৬-শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

১৩৩। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি বাংলাদেশ ছিল এরিয়া ডেথ রোল কাইন্ড হাণ্ডেড, দিল্লি, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

১৩৪। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি মোর ইনক্লাকস্ অফ ট্রাইবেল, দিল্লি, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

১৩৫। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি স্টপ ট্রাইবেল ইনক্লাকস্ বাংলা টোলড. দিল্লি, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।

১৩৬। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া দি ট্রাইবেলস্ ইনক্লাকস্, পয়েন্টাব টু ঢাকা. ঢাকাস চেন্ড পলিসি, ১লা অক্টোবর, ১৯৮১ দিল্লি।

১৩৭। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি ঢাকা ওকে এণ্ডয়েটেড অন ডি পি. ইন্ডা, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৮১, দিল্লি।

১৩৮। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি বাংলা ট্রাইবেলস ফোবলড্ টু ফি, ৫ই অক্টোবর, ১৯৮১, দিল্লি।

১৩৯। টাইমস্ দি ছিল ট্রাইবেল ডিলেমা কর জিয়াস সাকসেসর, লণ্ডন ২৯-শে ডুলাই, ১৯৮০।

১৪০। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি এসকেপ্ ফ্রম টেরর, দিল্লি, ১লা অক্টোবর, ১৯৮১।

১৪১। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি বাংলা ইগনোরস বি. এস. এক. প্রোজেক্ট, দিল্লি ১লা অক্টোবর, ১৯৮১।

১৪২। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি বাংলাদেশ রাইফেলস্ গ্র্যাডমিটস টু একেসোডাস, দিল্লি, ১০ই অক্টোবর, ১৯৮১।

১৪৩। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি ইনক্লাকস্ অফ বাংলা অন, দিল্লি, ১৩ই অক্টোবর, ৮১।

১৪৪। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি রিপোর্টস্ অফ ট্রাইবেলস্ টু বাংলা সুন, দিল্লি, ২০শে নভেম্বর, ১৯৮১।

১৪৫। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি রিফিউজি চিলড্রেন ডাইং লাইক ক্লাইগ্, দিল্লি, ২২শে নভেম্বর, ১৯৮১।

১৪৬। তাপস মজুমদার এবং সেলিম সামাদ, পার্বত্য চট্টগ্রামে কি আছে, সাপ্তাহিক রোববার, ডল্যু-৩৪, জুন, ১৯৮০।

১৪৭। উলফ গেং মে, ভেন্ডেলপমেন্ট স্ট্রাটেজি এণ্ড সোসাল রেজিস্ট্রাল ইন দি থার্ড ওয়ার্ল্ড, দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস কেস, জেনোসাইড ইন কনটেক্সট, কোপেন হেগেন বিশ্ববিদ্যালয় 'আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ, এপ্রিল, ১৯৮৩।

১৪৮। উলফ গেং মে জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ, দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস কেস, ৭-১১ জুলাই, ১৯৮১ লগুনে অর্জিত ৭ম ইউরোপীয় কনফারেন্স অন মডার্ন এশিয়ান স্টাডিস, উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধ।

১৪৯। উলফ গেং মে, পলিটিক্যাল সিস্টেম ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, বাংলাদেশ, মাইমেন্ড পেপার, বার্নিন, ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী, ১৯৭৮।

১৫০। উলফ গেং মে, এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট অফ সোসিও ইকনমিক রেক্স এমড দি এথনিক গ্রুপস এণ্ড কমিউনিটি অফ দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, বাংলাদেশ।

১৫১। উলফ গেং মে, দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস কেস, এ বাংলাদেশী আওয়ার্সেসিং অফ হিউম্যান রাইটস, আই. সি. এস. এর উদ্যোগে আয়োজিত এনট্রপলজি অফ হিউম্যান রাইটস সিম্পজিয়ামে পঠিত প্রবন্ধ, কানাডা, ১৯৮৩।

১৫২। উপেন্দ্রলাল চাকমা, এম. পি., কাউখালি ম্যাসাকার, বাংলাদেশ আর্মি স্টারস সিম্বলিয়ানস্ ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, প্রেস কনফারেন্স, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৮০।

১৫৩। উলরীচ্ হেনস্, দি সিক্রেট ওয়ার ইন বাংলাদেশ, আই-এফ.ও.আর এর রিপোর্ট, অক্টোবর, ১৯৮০, নেদারল্যান্ড।

১৫৪। ডব্লিউ. ই. জে. বব, ল্যাণ্ড ক্যাপাসিটি ক্লাসিফিকেশন এণ্ড ল্যাণ্ড ইউজ প্রানিং ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস অফ ইষ্ট পাকিস্তান, বাট বিশ্ববন কংগ্রেস, ভলুম III, মাদ্রিদ, ১৯৬৬।

১৫৫। জুলিকার আলি কুট্টো, ইফ আই ওয়ার এ্যাসাসিনেটেড, বিকাশ পাবলিশিং, দিল্লি, ১৯৭২।

ভ্রম সংশোধন

<u>পৃষ্ঠা</u>	<u>আছে</u>	<u>হবে</u>
২	বৃত্তাত্য	পার্বত্য
৭	চরপন্থী	চরমপন্থী
১০	ভাঙ্কশক্তি	তঙ্কি শক্তি
১১ ও ১৪	ভুবন মোহন রায়	নলিনাক্ষ রায়
১১	পৰ্যবসিত	পর্যবসিত
১২	কংগ্রেসী এক কমিটি	কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিঃ সাবকমিটি
১২	কামিনী মোহন দেওয়ান	কামিনী মোহন দেওয়ান
১৩	বেলবেড়িয়া	বেলবেড়িয়া
১৫	অন্তত্ব	অন্তত্ব
১৬	পাবতা	পার্বত্য
১৭	বুটিশ ইণ্ডিয়া	বুটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া
১৮	মর্বাদা	মর্বাদা
২৩	Let	Led
২৮	পাইনি	পায়নি
২৮	Corp	Crop
৩২	চাকর	চাকরা
৩৫	নেতৃত্বে	নেতৃত্বে
৪০	চকিব	চকিব
৪৪	জাতীয়তাবাদ	জাতীয়তাবাদ
৫৩	রমহান	রহমান
৬২	খোন্দাকার	খোন্দাকার
৭৩	সুবিধার্থে	সুবিধার্থে
৭৫	করার	করার
৭৫	অর্থনৈতিক	অর্থনৈতিক
৭৬	দীক্ষিণালা	দীক্ষিণালা
৭৮	anance	anange
৯১	antonomy	autonomy

<u>পৃষ্ঠা</u>	<u>আছে</u>	<u>হবে</u>
৯১	Self-rula	Self-rule
৯৪	ছুটতে	ছুটিতে
১০১	ভ	মত
১০১	পড়ন	পড়ান
১০১	পাবিস্তান	পাকিস্তান
১০৬	বিজয়	বিজয়ে
১১২	offend	offered
১১২	ধরণরে	ধরণের
১১৫	গেষ্ঠী	গোষ্ঠীর
১১৯	জত্যাভিমান	জাত্যাভিমান
১২০	সশস্ত্র	সশস্ত্র
১২৩	Eritea	Eritrea
১২৭	ত্রিবিদ	ত্রিবিধ
১৩৯	রাজকৈতিক	রাজনৈতিক
১৪০	sessiofs	sessions
১৪১	enductments	enactments
১৪২	section	sanction
১৪২	inconsident	inconsistent
১৪৪	firear	firearms
১৪৪	possessio	possession
১৪৪	withdraw	withdrawn
১৪৭	Motns	Months
১৪৯	Liquor manufactred	Liquor manufactured
১৪৯	geseral	general
১৪৭	justic	justice
১৫০	fowarded	forwarded
১৫০	Gort	Court
১৫০	Ordes	Orders
১৫০	usit	suits
১৫১	chife	chief

<u>পৃষ্ঠা</u>	<u>আছে</u>	<u>হবে</u>
১৫২	be shall	be he shall
১৫৩	Agenst	Agents
১৫৫	copid	copied
১৫৬	sun sul	sul
১৫৬	attented	attested
১৫৬	pluogh	plough
১৫৬	sabestitute	substitute